॥ ৮ম সংখ্যা ॥ মার্চ ২০১৭-জুলাই ২০১৭

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

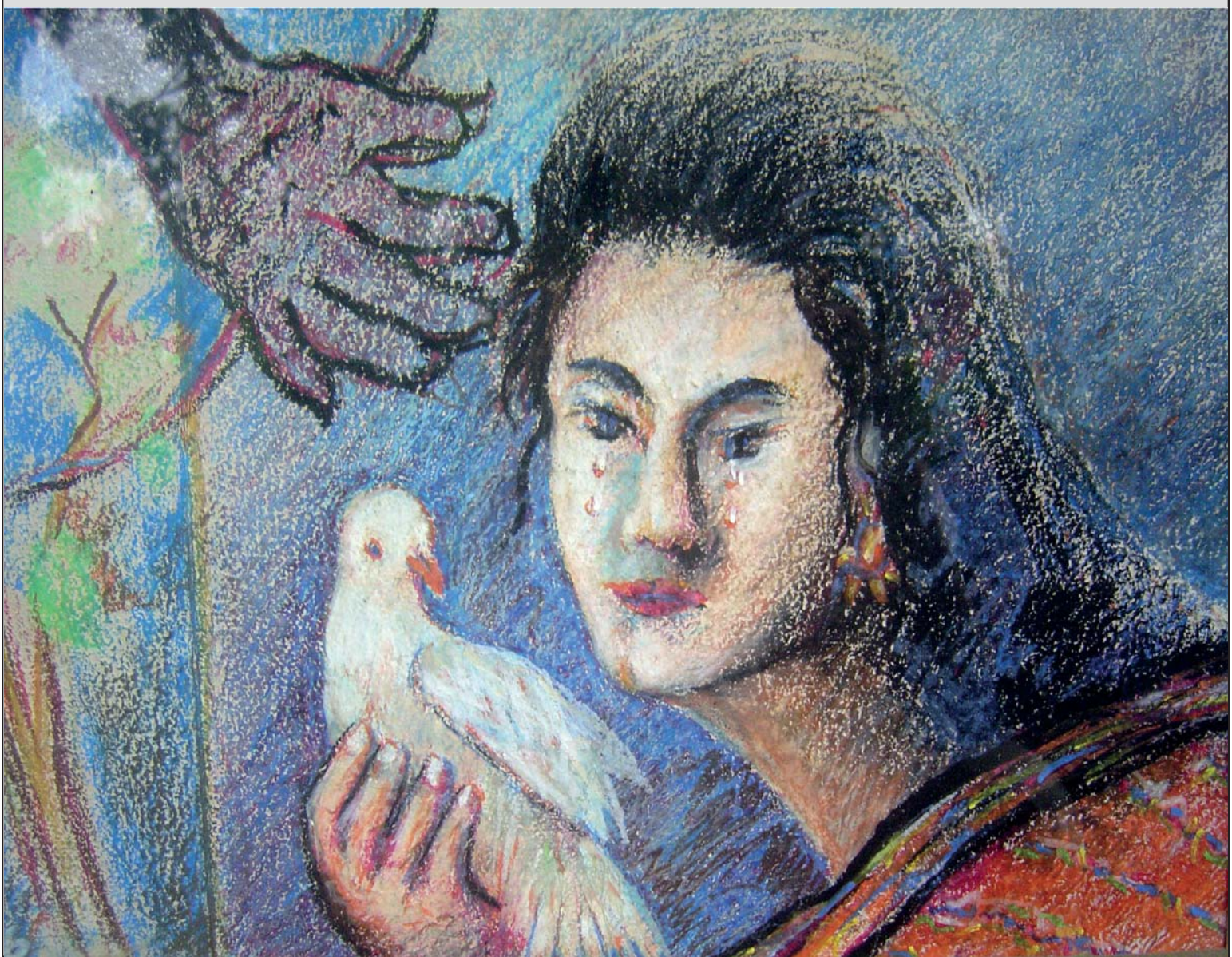

প্রচ্ছদ ছবি : নিম্নী দেওয়ান, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী

সূচিপত্র

- জুম্ম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারে অবরুদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম - মঙ্গল কুমার চাকমা/০৩
- বান্দরবানে ভূমি বেদখলের অন্যতম শিকার ম্রো জনগোষ্ঠী - চিংলামং চাক/০৭
- দ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হোক তরুণ প্রজন্ম- বাচ্চু চাকমা/১২
- লংগদুর মতো আর কতবার সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হবে জুম্মরা? - ধীর কুমার চাকমা/১৫
- সাম্প্রতিক লংগদু হামলা প্রসঙ্গে - সজীব চাকমা/১৭
- পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিকল্প নেই - নীলোৎপল খীসা/২০

বিশেষ প্রতিবেদন:/২২-৬৫

- পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ গ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত নির্যাতন ও হত্যা
- পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ধর্মীয় পরিহানি ও সেনা কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে
- লংগদুতে জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সাম্প্রদায়িক হামলা
- রাঙ্গামাটিতে সেনা পৃষ্ঠপোষকতায় জুম্ম বিরোধী সেটেলার বাঙালিদের সমাবেশ
- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেই সরকারের
- ভূষণছড়া ইউপির নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণে অপরাগতা
- পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পাহাড়ধস
- সাজেকে খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের ত্রাণ বিতরণ
- জাতীয় সংসদে উষাতন তালুকদার এমপির ভাষণ
- কারেন্টের শক দিয়ে, রশি বেঁধে টাঙিয়ে, মুখে পানি ঢেলে অনিল তঞ্চঙ্গ্যাকে নির্যাতন
- রাঙ্গামাটিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত
- পিসিপির ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ২২তম কাউন্সিলে সন্তু লারমা
- পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী কার্বারী-হেডম্যান সম্মেলনে সন্তু লারমা

সংবাদ প্রবাহ:

- যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা/৬৬
- সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল/৬৭
- প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন/৭০
- সংগঠন সংবাদ/৭৬
- আন্তর্জাতিক সংবাদ/৮৮

সম্পাদকীয়

পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন সেনাশাসন, জুম্ম-বিধ্বংসী বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও ব্যাপক অপপ্রচারে অবরুদ্ধ। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে অচলাবস্থায় রেখে দিয়েছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। অপরদিকে সেনাশাসন, জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ভূমি বেদখল ও স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ, ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়ন, চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত জুম্মদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও ধরপাকড়, জুম্ম স্বার্থ বিরোধী ও চুক্তি পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জুম্মদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চলছে। সেনানির্যাতনে গত ১৯ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষার্থী রমেল চাকমাকে হত্যা, বহিরাগত প্রভাবশালী কর্তৃক লামায় ম্রো জনগোষ্ঠীর ভূমি বেদখল সরেজমিন পরিদর্শনে ঢাকা আসা নাগরিক প্রতিনিধিদলকে সেনাবাহিনী কর্তৃক লামায় ঢুকতে না দেয়া, সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ১৪ মে রাঙ্গামাটিতে সেটেলার বাঙালিদের জনসভা আয়োজন, ১৭ মে সেনাবাহিনী কর্তৃক লংগদু ও নানিয়ারচর সীমান্তে অবস্থিত থলচাপ তপোবন অরণ্য ভাবনা কুটির ভাংচুর ও ধর্মীয় পরিহানি, ২ জুন লংগদুতে সেনা-পুলিশের সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের আড়াই শতাধিক ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, বান্দরবান জেলায় জনসংহতি সমিতির শতাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও দেড় শতাধিক কর্মীকে এলাকাছাড়া করা ইত্যাদি সাম্প্রতিক ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির নাজুক অবস্থার জাজ্বল্য উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

অধিকন্তু সম্প্রতি বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতীত জামিনে থাকা জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে গোয়েন্দা ও সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক অবৈধভাবে আটক করে বান্দরবান সেনা জোনে নিয়ে মারধর ও মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণের ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে, যা বান্দরবানকে এক বিভিষিকাময় জনপদে রূপান্তরিত করেছে।

অন্যদিকে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ায় এলাকাবাসীর করুণ আর্তনাদ ও হাহাকার চলছে। ৫০টি গ্রামের ২,৫০০ পরিবারের প্রায় ১৫,০০০ আদিবাসী জুম্ম গ্রামবাসী এই খাদ্য সংকটের শিকার রয়েছে। সাজেকের দুর্ভিক্ষ মোতাবেলা করতে না করতেই তীব্র বজ্রপাত ও মেঘের গর্জনসহ অবিরাম বৃষ্টির ফলে গত ১৩ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় ঘটে ব্যাপক পাহাড় ধস। এর ফলে কেবল রাঙ্গামাটি জেলায় ১২১ জনসহ বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় কমপক্ষে ১৭০ লোকের প্রাণহানি ঘটে। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় পাহাড় ধসের ফলে হাজার হাজার একরের বাগান-বাগিচা, ধান্য জমি ও ফসল, বসতভিটার ক্ষতি হয়। কিন্তু সরকার সেসব কারণে প্রলঙ্করী পাহাড়ধস ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে সেই বনাঞ্চল ধ্বংস, অবৈধ পাহাড় কাটা, অপরিকল্পিত বসতি ও ঘরবাড়ি নির্মাণ, অবৈধ অনুপ্রবেশ ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অপরদিকে পাহাড়ধসের ঘটনার সুযোগে সরকার সাজেকে ত্রাণ সহায়তা, লংগদু অগ্নিসংযোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও অগ্নিসংযোগে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, অব্যাহত সেনা নির্যাতন ও ফ্যাসীবাদী কায়দায় জুম্মদের দমনপীড়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো ধামাচাপা দেয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জুম্ম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারে অবরুদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম

মঙ্গল কুমার চাকমা

বস্তুত পার্বত্য জনপদে আইনের শাসন নেই বললেই চলে। নিরাপত্তা বাহিনীর অঙ্গুলি হেলনেই চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করার হীনলক্ষ্যে সার্বিকভাবে জুম্ম জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী হিসেবে তুলে ধরতে এবং বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ আন্দোলনরত সংগঠন ও অধিকার কর্মীদের চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী, জঙ্গীবাদী হিসেবে লেবেল দেয়ার লক্ষ্যে চলছে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও ব্যাপক অপপ্রচার। এমন কোন ক্ষেত্র বা ঘটনা নেই যেগুলোতে জুম্মদেরকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও জঙ্গীবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে না।

বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন দমন-পীড়ন, জুম্ম-বিধ্বংসী বহুমুখী ষড়যন্ত্র ও ব্যাপক অপপ্রচারে অবরুদ্ধ। তার সাম্প্রতিক নমুনা হচ্ছে গত ৬ মে ২০১৭ বান্দরবান জেলার লামায় বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি বেদখল ও আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদের অভিযোগ বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত এবং তথ্য সংগ্রহ করতে ঢাকা থেকে আগত একটি নাগরিক প্রতিনিধিদলকে সেনাবাহিনী কর্তৃক লামা ও বান্দরবান সদরে ঢুকতে না দেয়া। তারও আগে ৫ জুলাই ২০১৪ রাঙ্গামাটিতে সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্যদেরকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করতে দেয়া হয়নি। সেসময় তাদের উপর বিশেষ বাহিনীর ইন্ধনে কিছু সাম্প্রদায়িক সেটেলার বাঙালি হামলাও চালায়। ২০০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আহুত সমাবেশে যোগ দিতে আসার পথে রাঙ্গামাটিতে ড. কামাল হোসেন ও তার সফরসঙ্গীদের উপর হামলার ঘটনা দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তা সবারই জানা এবং সেদিন তাঁকে রাঙ্গামাটি জেলার সীমানা রাবার বাগান এলাকা থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। অতি সম্প্রতি সেনা নির্যাতনে খুন হওয়া রমেল চাকমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের সাথে গত ২৫ এপ্রিলে সাক্ষাৎ করতে আসা একটি নাগরিক প্রতিনিধিদলকেও রাঙ্গামাটির নান্যাচরে ঢুকতে দেয়নি সেনাবাহিনী। এমনকি নিহত রমেল চাকমার লাশ তার মা-বাবার কাছে ফেরত না দিয়ে পেট্রোল ও কেরোসিন ঢেলে দাহ করার মতো অমানবিক ঘটনাও সংঘটিত করেছে স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষ।

এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করা যায় যেখানে সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরা ও সংগঠনের স্বাধীনতাকে রুদ্ধ করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২০১৫ সালের ৭ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুম্মদের সাথে দেশীয় ও বিদেশী সংস্থার লোকজনের কথাবার্তা বলার উপর বিধি-নিষেধ আরোপসহ মৌলিক অধিকার পরিপন্থী ১১টি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে, যা দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড়

উঠলেও বর্তমান অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক (?) সরকার বোবার ন্যায় ভূমিকা প্রদর্শন করে চলেছে। দেশবাসী ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন রেখে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নির্বিঘ্নে জুম্মদের ভূমি বেদখল, তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ, অবাধে পার্বত্যাঞ্চলের সম্পদ লুণ্ঠন ও জুম্মদেরকে জাতিগতভাবে নিপীড়ন-নির্যাতনের নীলনক্সা বাস্তবায়নের জন্যই এভাবে দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ এবং বিদেশী সংস্থার লোকজনকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকতে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে বলে নি:সন্দেহে বলা যেতে পারে।

জুম্ম জনগণকে কেবল অবরুদ্ধ করে রাখা নয়, সেই সাথে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ আন্দোলনরত অধিকার কর্মীদেরকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দায়ের ও জেলে প্রেরণ, অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন, হত্যা, রাজনৈতিক হয়রানি ইত্যাদিও সমান তালে অব্যাহতভাবে চলছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো ৩১ মার্চ ২০১৭ জনসংহতি সমিতির কাপ্তাইয়ের রাইখালীর সভাপতি ও রাইখালী ইউপি মেম্বার থোয়াই শৈনু মারমা এবং তাঁর ছেলে পিসিপির সদস্য ক্যহিংহ্লা মারমাকে বিজিবি কর্তৃক বিস্ফোরক দ্রব্য গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার, অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন ও জেলে প্রেরণ। নান্যাচরে এইচএসসি পরীক্ষার্থী উঠতি বয়সী রমেল চাকমার হত্যার ঘটনা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একই কায়দায় মাটিরাঙ্গা সেনা জোন কর্তৃক গত ১০ আগস্ট ২০১৪ সালে হত্যা করা হয় জনসংহতি সমিতির সদস্য তিমির বরণ চাকমা ডুরানকে। রমেল চাকমার মতো ১৮ বছরের উঠতি বয়সী উচ্চ মাধ্যমিকের নিরীহ ছাত্র জিম্পু চাকমাকে হত্যা করা হয় মাটিরাঙ্গা সেনা জোনে ২০০৪ সালের ২৩ আগস্ট এবং তাকেও সেনা-পুলিশের উপস্থিতিতে দাহ করতে তার মা-বাবাকে বাধ্য করা হয়। তারও অনেক আগে ৫ মার্চ ২০০০ সালে পার্বত্য চুক্তি অনুসারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির সদস্য মংসাথোয়াই মারমা বিশ্বকে গুইমারা সেনা জোনে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৯৬ সালে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমাকে অপহরণ এবং চিরদিনের জন্য গুম করার মতো আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত ঘটনা এখানে উচ্চারণ করা বাহুল্য বৈ কিছু নয়।

বস্তুত পার্বত্য জনপদে আইনের শাসন নেই বললেই চলে। নিরাপত্তা বাহিনীর অঙ্গুলি হেলনেই চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করার হীনলক্ষ্যে সার্বিকভাবে জুম্ম জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী হিসেবে তুলে ধরতে এবং বিশেষভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ আন্দোলনরত সংগঠন ও অধিকার কর্মীদের চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী, অস্ত্রধারী, জঙ্গীবাদী হিসেবে লেবেল দেয়ার লক্ষ্যে চলছে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও ব্যাপক অপপ্রচার। এমন কোন ক্ষেত্র বা ঘটনা নেই যেগুলোতে জুম্মদেরকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও জঙ্গীবাদের সাথে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে না। বৌদ্ধদের ভাবনা কেন্দ্র থেকে শুরু করে মন্দির ও বুদ্ধমূর্তি স্থাপন, সাম্প্রতিক সাজেকে দুর্ভিক্ষ, বিদেশী সশস্ত্র গ্রুপের উপস্থিতি ও তৎপরতা, অস্ত্র ও মাদক পাচার, জঙ্গীবাদী জেএমবি ও জামায়াতের কার্যক্রম, ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদারের আওয়ামীলীগের যোগদানের মিথ্যা সংবাদ, কতিপয় দালালদের দিয়ে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে স্রোদের সংবাদ সম্মেলন, রাঙ্গামাটির ডেপ্লোছড়িতে ১৬টি গাড়ি কথিত গণডাকাতি, সম্প্রতি শুভলং-এ বেড়াতে আসা পর্যটকদের মধ্যে নিজেরাই তাদের একজনকে হত্যার ঘটনা ইত্যাদি- এমন কোন ঘটনা নেই যেখানে কল্পকাহিনী তৈরী করে জুম্ম অধিবাসী ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে জড়িত করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে না।

নিরাপত্তা বাহিনীর মদদপুষ্ঠ কথিত সংবাদ কর্মীরা কতটা নিকৃষ্ট অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে তার প্রকৃষ্ট হলো সাজেকে প্রতিবছরের মতো এবছরের খাদ্যাভাব বা দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর চাঁদাবাজিকে দায়ী করা। মূলত জুম চাষের উপর নির্ভরশীল সাজেকের জুম্ম অধিবাসীরা জুম চাষ করে বড়জোর ৬ থেকে ৯ মাসের খাদ্য যোগাড় করতে পারে। বাকি ৩ থেকে ৬ মাস প্রতিবছর তাদের মধ্যে খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে এই খাদ্য সংকট জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত চলতে থাকে। অথচ দৈনিক জনকণ্ঠে মোয়াজ্জেমুল হক ও জীতেন বড়ুয়ার সংবাদে 'সন্ত্রাসীদের চাঁদাবাজি ও জুম ফলন কম হওয়ায় সাজেকে খাদ্য সঙ্কট' দেখা দিয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে।

শাসকগোষ্ঠীর এধরনের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গত ২৪ এপ্রিল ২০১৭ জনকণ্ঠে ফিরোজ মান্নাকে দিয়ে 'পার্বত্য এলাকায় নতুন অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টায় ভাবনা কেন্দ্র' শীর্ষক হলুদ সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে বান্দরবানের স্বর্ণমন্দির ও রাঙ্গামাটির বনবিহারে ও রাজবন বিহারকে জুডো ক্যারাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বনে ঢুকে পড়া, বনে গিয়ে আবার তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেয়া, জুম্ম ল্যান্ড গড়ার আন্দোলন-সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিপ্লব গড়ে তোলার মতো কল্পকাহিনীর অবতাড়না করা হয়েছে। এছাড়া মিয়ারমারের ধর্মীয় সংগঠন '৯৬৯'-এর তৎপরতা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিস্তার করছে বলে জনকণ্ঠের উক্ত সংবাদসহ ২৫ এপ্রিল 'পার্বত্য অঞ্চলে নতুন আতঙ্ক ৯৬৯' শিরোনামে দৈনিক মানবজমিনে ও ২৯ এপ্রিল 'পাহাড়ে নতুন আতঙ্ক ৯৬৯' শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাকে সংবাদ প্রচার করা হয় মুখ্যত নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সরবরাহকৃত একতরফা কল্পিত তথ্য দিয়ে। দেশের মাদ্রাসাগুলোতে যেভাবে ইসলামী জঙ্গী তৈরি কারখানা হিসেবে অভিযোগ তোলা হয় সেই আদলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ বিহার বা কিয়াংগুলোকে সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা হিসেবে দেশে-বিদেশে তুলে ধরার হীনউদ্দেশ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এই অপপ্রচারের ষড়যন্ত্র জোরদার করেছে। এই সংবাদ প্রকাশের পর পরই গত ১ মে ২০১৭ তারিখ বরকলে ভালুভিটায় একটি বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে বিজিবি বাধা দিয়েছে, যে ভালুভিটায় ১৯৪০ সাল থেকে বৌদ্ধরা পূজা-অর্চনা করে আসছিল। ইতিমধ্যে সেখানে ঘ্যাং-ও স্থাপন করেছে স্থানীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে সেখানে আজ বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করতে বাধা দেয়া হচ্ছে। সেই সাথে বরকল থানা থেকে বরকল উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান শকুন্তলা চাকমাকে ফোন করে বরকলের সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ফোন নাম্বার খোঁজা হচ্ছে যার পেছনে রয়েছে জুম্মদের

মধ্যে এক ধরনের ভীতি ও আতঙ্ক সঞ্চার করা। জিম্পু চাকমা বা রমেল চাকমার মতো কোমলমতি জুম্ম ছাত্রদের হত্যার ঘটনাকে জায়েস করতে গত ৩০ এপ্রিল ২০১৭ দৈনিক ইত্তেফাকে 'পাহাড়ে শিক্ষার্থীরা তিন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মানবঢাল' শীর্ষক সংবাদ প্রচার করা হয়েছে যেখানে পরিবারের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে ছেলেমেয়েদের সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে বলে বানোয়াট কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। গত ১লা মে দৈনিক মানবজমিনে 'পার্বত্য এলাকায় নিখোঁজ তরুণরা গভীর জঙ্গলে' শীর্ষক অনুরূপ আরেক সংবাদে মানুষের কল্পনা শক্তিকে হার মানাই এমন কাহিনী তৈরি করে প্রচার করা হয় যে, "একটি ছোট্ট ঘটনা পাল্টে দেয় এক চাকমা যুবকের জীবন। ২০১৩ সালে কর্ণফুলী কলেজে ভর্তি হয়। ক'দিন পরই বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে। তারপর রাজনৈতিক প্যাঁচে পড়ে মামলা হয় তার বিরুদ্ধে। পুলিশ খোঁজা শুরু করে। কলেজ থেকে পালায় সে। ভয়ে বাড়ির কাউকে ঘটনাটি জানায়নি। আশ্রয় পায় একই গোত্রের এক বড় ভাইয়ের কাছে। তার পরামর্শে কলেজ ও এলাকা ছেড়ে পাড়ি জমায় পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলে। অস্ত্র তুলে নেয় হাতে। বিনিময়ে মাসে ১০ হাজার টাকা আয় শুরু হয় তার।" সাদা চোখে পাঠকরা এ ধরনের সাজানো কৌতুহল- উদ্দীপক সংবাদ গোগ্রাসে গিলে খাবে। সহজে কেউ উড়িয়ে দিতে চাইবে না। কিন্তু এর পেছনে কত গভীর ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পিত অপপ্রচার কাজ করছে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যারা সম্যক অবহিত নন তাদের পক্ষে বুঝা মুসকিল হবে বৈ কি।

বস্তুত বর্তমান ছাত্র-যুব সমাজের একটি বিরাট অংশ জুম্মদের উপর দেশের শাসকশ্রেণির অন্যায়-অবিচারের উপর যারপরনায়ায় ক্ষুব্ধ ও অসন্তোষ্ট। প্রশাসনযন্ত্রের ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালি ও বহিরাগত প্রভাবশালীরা তাদের চোখের সামনে বংশ পরম্পরায় ভোগদখলীয় জায়গা-জমি কেড়ে নেয়া ও একের পর এক জুম্ম গ্রাম উচ্ছেদ হয়ে পড়ার ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করছে। স্বচোখে প্রত্যক্ষ করছে তাদের মা-বোনদের নির্বিচারে ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা, অপহরণের মতো লোমহর্ষক ঘটনা। বিশেষ করে ছাত্র-যুবকদের টার্গেট করে নির্বিচারে অবৈধ গ্রেফতার, জেল-জুলুম, খুন করা হচ্ছে। কোন ঘটনায় তারা সুবিচার লাভ করতে দেখেনি। বরঞ্চ এসব মানবতা বিরোধী ঘটনায় জড়িতদেরকে নিলজ্জভাবে দায়মুক্তি প্রদানের উদাহরণ অসহায়ের মতো প্রত্যক্ষ করছে। নিজ ভূমিতে জুম্ম জনগোষ্ঠী দ্রুত সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে তা দেখে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। উন্নয়নের দোহাই দিয়ে সরকার একের পর এক জুম্ম বিধ্বংসী ও আগ্রাসী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসব কিছু দেখে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ ক্ষোভে দু:খে হতাশায় ফুঁসে উঠছে। স্বভাবতই আজ জুম্ম জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার যে কোন ন্যায্য আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে সম্মুখ ভাগে নেতৃত্ব প্রদানে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেজন্যই আজ রাষ্ট্রীয় বাহিনী জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে টার্গেট করে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার জোরদার করেছে। জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিতে প্রশাসনের নাগের ডগায় ইয়াবা, হেরোইনসহ মাদকদ্রব্য ব্যবসায়ীরা সক্রিয় হলেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। রমেশ ত্রিপুরার মতো উচ্ছৃঙ্খল জুম্ম যুবকদের লেলিয়ে দিয়ে ডাকাতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটানোর মতো উদাহরণ লক্ষ করা যায়।

গত ৩রা মে রাঙ্গামাটির ডেপ্লোছড়িতে কথিত গাড়ি ডাকাতির ঘটনা কিভাবে রাজনৈতিক রং দিয়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে তা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। অনলাইন নিউজ পোর্টাল সিএইচটিটাইমস২৪.কম-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সেদিন দিবাগত রাত ১২টা থেকে সাড়ে ১২টার সময় 'ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পাহাড়ি সন্ত্রাসীরা ১৫টি গাড়িতে গণহারে ডাকাতি করে'। লক্ষ্য করার বিষয় যে, সেই সংবাদে ঢালাওভাবে 'ভারী অস্ত্র-শস্ত্র' নিয়ে 'পাহাড়ি সন্ত্রাসী' দ্বারা সেই ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। সিএইচটিটাইমস২৪.কম-এর ৬ মে আরেকটি রিপোর্টে আরো একধাপ এগিয়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে দায়ী করে সংবাদ প্রচার করা হয়। উক্ত ডাকাতির সাথে জড়িত করে গ্রেফতারকৃত রমেশ ত্রিপুরাকে বরাত দিয়ে বলা হয় যে, 'প্রভাবশালী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের এক নেতার প্রত্যক্ষ মদদে এবং সেই নেতা কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্র দিয়েই সংঘটিত করেছে গণডাকাতি।' প্রথম রিপোর্টে 'ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে' এবং দ্বিতীয় রিপোর্টে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জনৈক 'নেতা কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্র দিয়েই' কথিত গণডাকাতির কথা বলা হলেও ৬ মে তারিখের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, অস্ত্র দু'টি ছিল 'খেলনা পিস্তল ও দুটি কার্তুজভর্তি এলজি'। এ থেকে বুঝা যায়, এ সংবাদের মূল ভিত্তি হচ্ছে হলুদ সাংবাদিকতা। সংবাদের মূল উদ্দেশ্য ঘটনাকে তুলে ধরা নয়, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে সন্ত্রাসী ও ডাকাতচক্র হিসেবে পাঠকদের কাছে তুলে ধরা।

দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ১৫টি গাড়ি একসাথে থামিয়ে সংঘটিত গণডাকাতির স্থান (ডেপ্লোছড়ি) মানিকছড়ি সেনা-পুলিশ ক্যাম্প এবং অপরদিকে শালবাগান ক্যাম্প- উভয় ক্যাম্প থেকে মাত্র আধা কিলোমিটার দূরত্বে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এছাড়া সন্ধ্যার পর থেকে রাঙ্গামাটি-ঘাগড়া-রানীর হাট সড়কে প্রায় সময় পুলিশের ভ্রাম্যমান টহল দল থাকে। আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ভাষ্য অনুসারে আরো রয়েছে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা, টহল ও নজরদারি ব্যবস্থা। এমনি নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর নাগের ডগায় ডেপ্লোছড়ির মতো জায়গায় কীভাবে একসাথে ১৫টি গাড়ি থামিয়ে গণডাকাতি করা হলো তা আশ্চর্যের বিষয়। এর পেছনে আইন-শৃঙ্খলার সাথে যুক্ত কোন গোষ্ঠী জড়িত না থাকলে একসঙ্গে এতগুলো গাড়িতে গণডাকাতি কখনোই সম্ভব হতে পারে না। তাই এই কথিত গণডাকাতি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশেষ কায়েমী গোষ্ঠীর যোগসাজশে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে বলে অনেকে দৃঢ়তার সাথে বলতে চাচ্ছেন। এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলকে দায়ী করা এবং এ ধরনের ঘটনাকে দোহাই দিয়ে ৭ই মে তারিখের মতো পরিবহন ধর্মঘট পালন করাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

তৃতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে ধৃত রমেশ ত্রিপুরার কার্যকলাপ সম্পর্কে সিএইচটিটাইমস২৪.কম কোন উচ্চবাহ্য করেনি। রমেশ ত্রিপুরা হচ্ছে একজন উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি ও আওয়ামীলীগেরই এক নেতার পোষ্য সন্ত্রাসী বলে জানা যায়। তার বিরুদ্ধে থানায় অনেক

মামলা রয়েছে এবং বিভিন্ন মামলায় কয়েক বছর জেলও খেটেছে বলে বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে। আন্দোলনরত জুম্মদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর হীনউদ্দেশ্যে এই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিকে অর্থের বিনিময়ে ক্ষমতাসীন মহলের বিশেষ গোষ্ঠী কর্তৃক গণডাকাতির নাটক মঞ্চস্থ করা হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

আন্দোলনরত আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে উপস্থাপন করতে গত ২৭ এপ্রিলের দৈনিক মানবজমিন-এর "বিদেশি সশস্ত্র গ্রুপের সঙ্গে জেএসএস ও ইউপিডিএফ-এর সমঝোতা" শীর্ষক ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করে আরাকান রোহিঙ্গা সলিডিারিটি অর্গানাইজশেন, ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকান, আরাকান লিবারশেন পার্টি, পিপলস পার্টি অব আরাকান, আরাকান আর্মী, আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট, ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আরাকান ইত্যাদি সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের সাথেও সম্পৃক্ততার কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ তুলে ধরা হয়েছে। একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্য মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মী থেকে অস্ত্র আনতে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার জনৈক অমুসলিম যুবক মিয়ানমারে গিয়েছিল এবং কয়েক চালান অস্ত্র এনেছিল বলে মুখরোচক গল্প অবতাড়না করে গত ১ মে ২০১৭ দৈনিক কালের কণ্ঠে 'ক্রেতা পাহাড়ি সশস্ত্র দল জেএমবি ও জামায়াত' শিরোনামে কল্পিত সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

বস্তুত এটা সবারই জানা যে, এসব বিদেশী সশস্ত্র সংগঠনের সাথে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় কায়েমী গোষ্ঠী ও মৌলবাদী শক্তিই জড়িত রয়েছে। সেই সাথে মদদ রয়েছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর স্থানীয় নেতৃত্বের। স্থানীয় নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় এধরনের একটি সংগঠনের লোকজনকে ২০১৬ সালের ২৪ আগস্ট বান্দরবান থেকে মিয়ানমার সীমানা পাড় করার সময় অবৈধ মালামালসহ নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে ধরা পড়েছিল যা সংশ্লিষ্ট মহলে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণ হয়েছিল বলে জানা যায়। আরো উদ্বেগের বিষয় যে, প্রভাবশালী স্থানীয় মহল এসব বিদেশী সশস্ত্র গ্রুপকে কাজে লাগিয়ে বিশেষ করে বান্দরবানের গ্রামাঞ্চলে জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে এবং জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর পরস্পরের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক উস্কানী প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি ২০১৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারিতে রোয়াংছড়ির নোয়াপতং ইউনিয়নের বাঘমারা ভিতর পাড়ার কার্বারীকে অপহরণের মতো ঘটনা ঘটিয়ে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে সক্রিয় জুম্ম গ্রামবাসীদের উপর দায়ভার চাপিয়ে জেল-জুলুমের উদাহরণও রয়েছে। এসব অপকর্ম ধামাচাপা দিতেই এধরনের বিদেশী সশস্ত্র গ্রুপগুলোর সাথে উল্টো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা ও নিরাপত্তা বাহিনীর বরাত দিয়ে অপপ্রচার চালাতে ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত সংবাদ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

কল্পকাহিনী তৈরি করে সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাস কত গভীরে তা দৈনিক জনকণ্ঠের সাবেক সাংবাদিক ফজলুল বারীর তাঁর ফেসবুকে পোস্ট করা স্টাটাস থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত ফিরোজ মান্নার 'পার্বত্য এলাকায় নতুন অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টায় ভাবনা কেন্দ্র' শীর্ষক সংবাদ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "এই রিপোর্টে গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে গালগল্প বেশি। দীর্ঘদিন পাহাড়ে রিপোর্ট করাতে সেখানকার নানা কাঠামো আমি জানি। ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পরহনী আর শরণার্থীদের ভারত থেকে দেশের সীমান্তের ভিতরে নিয়ে আসা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের দীর্ঘদিনের বড় দুটি সমস্যা শান্তিবাহিনী আর শরণার্থীদের ভারত থেকে দেশের সীমান্তের ভিতরে নিয়ে আসা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনা নিয়ন্ত্রিত গোয়েন্দা সংস্থা তখনও এর বিরুদ্ধে, পাহাড়িদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করাতে ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে বিশেষ ঘরানার সাংবাদিকদের পাহাড়ে নিয়ে যেত। শান্তিচুক্তি হয়ে গেছে, তখনও মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে এক শ্রেণীর সেনা কর্মকর্তারা আমাদের বোঝাতেন, এই শান্তিচুক্তি করা ঠিক হয়নি। ...ওদের দেখিয়ে বেশি বেশি বাজেট বরাদ্দ করাতেন! তখন তারা চুপ মেরে যেতেন। এক সময় পাহাড়ে সাংবাদিকতা-প্রেস ক্লাব এসব তদারকি-প্রতিষ্ঠার নেপথ্যেও সেনাবাহিনী-গোয়েন্দা সংস্থাগুলো জড়িত ছিল। আজ পর্যন্ত যে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। এর নেপথ্যেও তারা। এরা নানান সময়ে নানান জুজুর ভয় ছড়ায়। কাজেই পাহাড়ে যে কারও রিপোর্ট করতে এসব মাথায় রাখলে ভালো। আর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টেতো সব পক্ষের বক্তব্য থাকতে হবে।"

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বরাত দিয়ে জনকণ্ঠ, মানবজমিন, ইত্তেফাক ইত্যাদি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে কেবলমাত্র গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বক্তব্য প্রদান করা হয়। যাদের সম্পর্কে সংবাদ তাদের কোন বক্তব্য নেয়া হয় না। ১৩ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের সাথে উষাতন তালুকদারও আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছি মর্মে উষাতন তালুকদারের কোন বক্তব্য না নিয়ে এভাবে কালের কণ্ঠ, বিডিনিউজ২৪.কম, সিএইচটিটাইমস২৪.কম সহ বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব সম্পর্কে জনমতকে বিভ্রান্ত করতেই এভাবে একতরফা সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

ফজলুল বারীর উক্ত বক্তব্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা, নিরাপত্তা বাহিনী, প্রশাসনযন্ত্রের গভীর ষড়যন্ত্র ও গোয়েবলসীয় অপপ্রচার সম্পর্কে সহজেই ধারণা লাভ করা যায়। এভাবে জুম্ম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে বরাবরই দূরে ঠেলে দেয়া হচ্ছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি আন্দোলন-সংগ্রামের পরিস্থিতি ও ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। এটা ঠিক যে, অন্যায়-অবিচার থাকলে সেখানে কোন না কোনভাবে কোন না কোন প্রজন্ম দ্বারা বৈপ্লবিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠবেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার বা প্রশাসনযন্ত্র কি পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার স্থায়ীত্বশীল রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে? নাকি দশকের পর দশক ধরে চলা সেনাশাসনে এবং জুম্ম বিরোধী ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারে অবরুদ্ধতার দিকে ঠেলে দেয়া পার্বত্যাঞ্চলের অর্গল ভেঙ্গে ফেলার জন্য জুম্ম ছাত্র-জনতাকে কঠোর আন্দোলন-সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেবে? সেই প্রশ্নের সমাধান দেয়ার দায়িত্ব যতটা না জুম্ম জনগণের, ততধিক হচ্ছে দেশের শাসকশ্রেণির।

বান্দরবানে ভূমি বেদখলের অন্যতম শিকার ম্রো জনগোষ্ঠী :

সংকটের মুখে তাদের জীবনজীবিকা ও আবাসভূমি

চিংলামং চাক

বিশেষ মহল ও প্রভাবশালী ভূমিদুস্যুদের ষড়যন্ত্রের কারণে ম্রো আদিবাসীরা নিজস্ব আবাসভূমি হতে উচ্ছেদ হয়ে আজ তাদের অস্তিত্ব বিপন্নের পথে। চিম্বুক পাহাড় ও পার্শ্ববর্তী সুয়ালক ইউনিয়নে ম্রো আদিবাসীদের শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসা আবাসভূমি ও জুম ভূমির উপর নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র, আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ওয়াই জংশন সেনা ছাউনি, বন বিভাগ ও বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যত্রতত্র ভূমি বেদখলের কারণে অনেক ম্রো আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ হয়ে পড়ে এবং বর্তমানেও উচ্ছেদের হুমকির মুখে তারা অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন জীবন অতিবাহিত করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রশাসনযন্ত্রের ছত্রছায়ায় বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী কর্তৃক জুম্ম জাতিগোষ্ঠীর ভূমি জবরদখল ও তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদের অন্যতম শিকার হচ্ছে সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী ম্রো জাতি। বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষায় জানা যায়, এযাবৎ ম্রো জনগোষ্ঠীর কমপক্ষে ২২,৩০০ একর জায়গা-জমি তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে বেদখল করা হয়েছে এবং কমপক্ষে ৩০টি গ্রামের ১,১০০ পরিবার ম্রো জনগোষ্ঠী স্ব স্ব জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ১১,৬৬০ একরের অধিক জমি জবরদখলের প্রক্রিয়ায় রয়েছে যেখানে কমপক্ষে ৪০টি গ্রামের ৯৬০ পরিবার ম্রো গ্রামবাসী উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে।

বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার চিম্বুক, সুয়ালক ও টংকাবতি ইউনিয়ন, লামা উপজেলার সরই, ফাঁসিয়াখালী ও রূপসী ইউনিয়ন এবং আলিদকম-থানচি সড়কের ক্রাউডং পাহাড়ে চিরায়ত জায়গা-জমি রাবার প্লান্টেশনের নামে বহিরাগতদের কাছে ইজারা প্রদান, সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রভাবশালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানী কর্তৃক ম্রো জনগোষ্ঠীর হাজার হাজার ভূমি জবরদখল করা হয়েছে। চট্টগ্রামের চকরিয়া উপজেলা থেকে লামা উপজেলায় ঢুকার পর ফাস্যাখালী ইউনিয়ন অন্তর্গত লামার মেইন রাস্তার দুই পার্শ্বে দিগন্ত বিস্তৃত এলাকায় যে রাবার বাগান চোখে পড়ে তার অধিকাংশই ছিল ম্রো জনগোষ্ঠীর জুমভূমি ও আবাসস্থল। পাইকারীভাবে ভূমি জবরদখল ও উচ্ছেদের ফলে তাদের বাস্তুভিটা ও আবাদী জমি সংকুচিত হয়ে পড়ছে। জীবন-জীবিকার উপর পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব। সীমিত হয়ে পড়েছে তাদের জীবন-জীবিকার জন্য একমাত্র অবলম্বন জুম চাষের জন্য পাহাড়ভূমি।

উল্লেখ্য যে, তিন পার্বত্য জেলার মধ্যে ম্রো আদিবাসীদের একমাত্র জনপদ বান্দরবান পার্বত্য জেলা। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের পূর্বে রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার ভার্য্যাতলী মৌজায় কিছু ম্রো পরিবারের বসতি ছিল। কাপ্তাই বাঁধের কারণে উচ্ছেদ হয়ে বান্দরবান পার্বত্য জেলায় স্থানান্তরিত হয়। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুসারে বান্দরবান জেলায় ম্রো জনসংখ্যা ৩৮,০২১ জন। কিন্তু ম্রো সোসিয়েল কাউন্সিলের ভাষ্যমতে ম্রো জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা তার থেকে অনেক বেশি। ১৯৯৫ সালে ম্রো সোস্যাল কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে ম্রো জাতির জনসংখ্যা ৫৯,৭৪৮ জন বলে জানা যায়।

বান্দরবান পার্বত্য জেলায় জনসংখ্যা দিক দিয়ে ম্রো জনগোষ্ঠী দ্বিতীয় হলেও শিক্ষা-দীক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন জুমচাষ। লাঙ্গলের চাষাবাদের জমি তাদের নেই বললেই চলে। বান্দরবান সদর উপজেলা চিম্বুক পাহাড়কে কেন্দ্র করে তাদের আবাসভূমি। টংকাবতী ইউনিয়ন হচ্ছে ম্রোদের প্রধানতম আবাসভূমি। টংকাবতী ইউনিয়নে ম্রো জনগোষ্ঠী ব্যতীত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর গ্রাম মাত্র দুটি। বিশেষ মহল ও প্রভাবশালী ভূমিদুস্যুদের ষড়যন্ত্রের কারণে ম্রো আদিবাসীরা নিজস্ব আবাসভূমি হতে উচ্ছেদ হয়ে আজ তাদের অস্তিত্ব বিপন্নের পথে। চিম্বুক পাহাড় ও পার্শ্ববর্তী সুয়ালক ইউনিয়নে ম্রো আদিবাসীদের শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসা আবাসভূমি ও জুম ভূমির উপর নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র, আর্টিলারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ওয়াই জংশন সেনা ছাউনি, বন বিভাগ ও বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যত্রতত্র ভূমি বেদখলের কারণে অনেক ম্রো আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ হয়ে পড়ে এবং বর্তমানেও উচ্ছেদের হুমকির মুখে তারা অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন জীবন অতিবাহিত করছে।

যে সমস্ত এলাকা থেকে ম্রোরা উচ্ছেদের শিকার

এক. ম্রো অধিবাসীরা সবচেয়ে বড় উচ্ছেদের শিকার হয়েছে বান্দরবান সদর উপজেলাধীন সুয়ালক ইউনিয়নে। ২০০০ সালে সেনাবাহিনীর আর্টিলারী (গোলন্দাজ ও পদাতিক) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১৯,০০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের ফলে পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের যে ২২টি গ্রাম উচ্ছেদ হয়েছিল

তার মধ্যে দেওয়াই হেডম্যান পাড়াসহ ২০টি গ্রাম ছিল ম্রো জনগোষ্ঠীর। এই ২০টি গ্রামের পাঁচ শতাধিক পরিবার ম্রো উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়েছে। জমির পরিবর্তে জমিতে পুনর্বাসন না করে ম্রো গ্রামবাসীদেরকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়। সেসময় জনসংহতি সমিতিসহ নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ গ্রহণ না করার জন্য বলা হলেও সেনাবাহিনী জোর করে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে বাধ্য করে। সেই সাথে তৎকালীন এমপি, তৎকালীন সুয়ালক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সুয়ালক মৌজার হেডম্যানসহ সরকারের বিশেষ গোষ্ঠীর চাপে পড়ে ম্রো গ্রামবাসীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ নিতে বাধ্য হয়। শত শত ম্রো পরিবার বাপ-দাদার বসতভিটা ও আবাদী জমি ফেলে অধিকতর দুর্গম টংকাবতী এলাকায় পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়। ম্রোদের জায়গা কেড়ে নিয়ে বর্তমানে সেনাবাহিনী উক্ত জায়গা-জমি স্থানীয় বাঙালিদেরকে বাগান চাষ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালনের জন্য লীজ প্রদান করে থাকে। অপরদিকে সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণ চলাকালে এলোপাতাড়ি গোলা বর্ষণের আঘাতে এক ম্রো শিশুসহ অনেক ম্রো আহত হয়েছে যা জনসাধারণের স্বাভাবিক চলাচলেও এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

দুই. সেনাবাহিনী কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত বান্দরবানের 'নীলগিরি পর্যটন কেন্দ্র' এর দখলে রাখা ৭৬ একর ভূমি ছিল ম্রো জনগোষ্ঠীর বাস্তুভিটা ও জুম ভূমি। এই বিলাসবহুল পর্যটন কেন্দ্রের ফলে মারমাসহ ম্রোদের ৬টি গ্রামের কমপক্ষে ২০০ পরিবারের ১৫০০ গ্রামবাসী তাদের স্ব স্ব আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়। ম্রোদের সাথে কোনরূপ আলোচনা না করে এবং তাদের সম্মতি ব্যতীত জোর করে এসব জমি কেড়ে নেয়া হয়। কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়া ম্রো জনগোষ্ঠীকে এলাকা ছেড়ে চলে বাধ্য করা হয়েছে। তাদের পুনর্বাসনের কথা তো অনেক দূরে। আরও অভিযোগ রয়েছে, সেনাবাহিনী কর্তৃক রিসোর্ট, রেস্টুরেন্ট, শপিং সেন্টার ইত্যাদি স্থাপনের জন্য চিম্বুক পাহাড়ের ডলা ম্রো পাড়া (জীবন নগর), কাপ্রু ম্রো পাড়া (নীলগিরি), চন্দ্র পাহাড় (নাইক তং), চিম্বুক ষোল মাইল, ওয়াই জংশন (১২ মাইল), রুমার কেওক্রাডং পাহাড়ের কেওক্রাডং চূড়া ইত্যাদি এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র ও সার্বিকভাবে অনগ্রসর ম্রোদের বিপুল পরিমাণ জুমভূমি বেদখল করা হয়েছে। সেনাবাহিনী খুঁটি গেড়ে কথিত জীবননগর ও চন্দ্র পাহাড় এলাকায় কমপক্ষে ১,১০০ একর বিস্তৃত জুমভূমি দখল করে রেখেছে। ম্রো গ্রামবাসীদেরকে সেসমস্ত জায়গায় জুম চাষ করতে বাধা দিচ্ছে। বিশেষ করে জীবননগর নামে নামকরণ করা সেপ্রু পাড়ায় ৩ গ্রামের ১২৯টি ম্রো পরিবার উচ্ছেদ হয়ে পড়েছে।

তিন. লামা উপজেলার সাঙ্গু মৌজায় লাদেন বাহিনী কর্তৃক ২০১৫ সালে ৫০০ একরের অধিক ভূমি জবরদখলের ফলে উচ্ছেদের শিকার তিনটি আদিবাসী গ্রামের মধ্যে আমতলি ম্রো পাড়া নামে একটি ম্রো গ্রাম ছিল। উক্ত আমতলী পাড়ার ২২টি ম্রো পরিবার উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়েছে। ম্রো গ্রামবাসীরা তাদের গ্রামটি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়।

একনজরে যে সমস্ত এলাকা থেকে ম্রোরা উচ্ছেদের শিকার

এলাকা	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	যার কর্তৃক উচ্ছেদর শিকার	উচ্ছেদের সাল
সুয়ালক, বান্দরবান	২০	৫০০	১৯,০০০	গোলন্দাজ ও পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	২০০০
ফাস্যাখালী, লামা	১	২২	১৫০	লীজ, লাদেন গ্রুপ	২০১৫
চিম্বুক, বান্দরবান	৬	২০০*	৭৬	নীলগিরি পর্যটন, আর্মী	
চিম্বুক, বান্দরবান	-	-	৫**	টিএন্ডটি টাওয়ার, সড়ক ও জনপথ বিশ্রামাগার	২০০০
সেপ্রু পাড়া, বান্দরবান	৩	১২৯	৬০০**	জীবননগর, আর্মী	২০০০
চন্দ্রপাহাড়, বান্দরবান	-	-	৫০০**	চন্দ্রপাহাড়, আর্মী	২০০০
ডলুছড়ি, লুলেইন ও বমু মৌজা, লামা	-	২৫০	২,০০০	কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন	২০০১ থেকে
মোট	**৩০**	**১১০১**	**২২,৩৩১**		

* মারমা গ্রামসহ; ** মূলত ম্রোদের জুম ভূমি।

চার. লামা উপজেলাধীন সরই ইউনিয়নের এলাকায় ডলুছড়ি, লুলেইন ও বমু মৌজায় 'কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন' নামে জাতীয় পর্যায়ের একটি এনজিও কর্তৃক ২০০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আনুমানিক ২০০০ একরের মতো যে বিস্তর এলাকা জবরদখল করা হয়েছে সেসব জায়গা-জমি ছিল মূলত ম্রো গ্রামবাসীর জুম ভূমি। লামায় কোয়ান্টাম সংস্থা কর্তৃক ভূমি বেদখলের কারণে এলাকার ২৫০ পরিবার ম্রো গ্রামবাসীরা জুম চাষ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে তাদের জীবন-জীবিকা হুমকির মধ্যে পড়েছে।

কতিপয় স্থানীয় ব্যক্তির সহায়তায় অর্থের বিনিময়ে কোয়ান্টাম কর্তৃক পাহাড়িদের জমি দখল করে চলেছে। ব্যক্তি নামে জমি ক্রয় করে কোয়ান্টামের জন্য দানকবলা করে হস্তান্তর করা হয় বলে জানা যায়। তবে অবৈধভাবে ক্রয়কৃত জমির পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি জমি প্রভাব খাটিয়ে ও জোর জবরদস্তি করে দখল করা হয়েছে বলে জানা যায়। যেমন জনৈক ম্রো পরিবারের ৩.০ একর জমিসহ আরো অনেকের ভূমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এসব জায়গাজমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে বা মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে আইন মোতাবেক বান্দরবান জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন নেয়ার বিধান মানা হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। শুধু তাই নয়, ঢাকা থেকে দেখতে আসা অনেক প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরকে কোয়ান্টাম স্কুল ও কলেজের আশেপাশে এলাকায় জায়গা ক্রয় করতে উৎসাহিত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবে অতি সুক্ষ্মভাবে বহিরাগত কর্তৃক জমি দখল এবং ম্রোদেরকে তাদের স্বভূমি থেকে উৎখাত করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

উচ্ছেদের হুমকির মুখে ম্রো গ্রামসমূহ

এক. রুমা উপজেলাধীন রুমা সেনা গ্যারিসনের ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াধীন থাকায় পলি মৌজা, গালেঙ্গা মৌজা, সেঙ্গুম মৌজা ও পানতলা মৌজার তিন শতাধিক ম্রো আদিবাসী পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে এবং হুমকির মুখে দিনাতিপাত করছে। ১৯৭৭ সালে রুমা গ্যারিসনের জন্য পলি মৌজার ১৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এতে অনেক জুম্ম পরিবার উচ্ছেদ হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে গালেঙ্গা মৌজা, সেঙ্গুম মৌজা ও পানতলা মৌজায় আরো ৯,৫৬০ একর ভূমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যা এখনো প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে। ৯,৫৬০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হলে ৬৫৫টি আদিবাসী পরিবারের ৪,৩১৫ জন জুম্ম গ্রামবাসী স্ব স্ব জায়গা-জমি চিরতরে উচ্ছেদ হয়ে পড়বে যার মধ্যে তিন শতাধিক পরিবার হচ্ছে ম্রো গ্রামবাসী। (সূত্র: বান্দরবারে ভূমি বেদখল : দু' হাজারের অধিক অবৈধ, চিংলামং চাক, জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, বুলেটিন নং ৩৫, ১০ নভেম্বর ২০১৫)।

দুই. লামা উপজেলাধীন সরই ইউনিয়নের ডলুছড়ি মৌজার নতুন পাড়া, ঢেঁকিছড়া পাড়া ও নোয়া পাড়ায় লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্তৃক ইজারার নামে ১,৬০০ একর জায়গা দখলের ফলে এলাকার তিনটি গ্রামের শত শত পরিবার ম্রো গ্রামবাসী উচ্ছেদের হুমকির মধ্যে রয়েছে। ম্রো পরিবারগুলো তাদের দীর্ঘ বৎসরের ভোগদখলীয় জুম ভূমিতে জুম কাটতে গেলে লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লি:-এর ম্যানাজার মো: আরিফ-এর নেতৃত্বে ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা জুম চাষে বাধাদান করে থাকে। ম্রো গ্রামবাসীদেরকে হত্যা ও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে বলেও তারা হুমকি প্রদান করে আসছে। নতুন পাড়ার কার্বারী লাজপং ম্রো'কে লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা মারধর করে এবং ক্যজ পাড়ার পুলিশ ফাঁড়িতে তার বিরুদ্ধে আপত্তি প্রদান করে। এই ব্যাপারে জুম চাষী কাইংপ্রে ম্রো ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লি: এর বিরুদ্ধে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ প্রশাসনের নিকট আবেদন নিবেদন করেও কোন ধরনের সুরাহা বা প্রতিকার পায়নি।

বিগত আশি দশকে রাবার প্লান্টেশন ও হর্টিকালাচারের জন্য লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজের নামে প্রতি প্লটে ২৫ একর করে ৬৪টি প্লটে মোট ১,৬০০ একর জায়গা ইজারা নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। ইজারা নেয়ার পর সেই জমিতে কোন বাগান-বাগিচা গড়ে তোলা হয়নি। গত বছর (২০১৬ সাল) থেকে ম্রো ও ত্রিপুরা অধিবাসী উচ্ছেদ করে সেই জমিতে রাবার বাগান তোলা হয়েছে বলে জানা যায়। উক্ত জমিগুলো হচ্ছে জুম্মদের প্রথাগতভাবে পরিচালিত মৌজা ভূমি ও জুম ভূমি।

একনজরে উচ্ছেদের হুমকির মুখে ম্রো জনগোষ্ঠীর গ্রামসমূহ

এলাকা	গ্রামের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	যার কর্তৃক ভূমি বেদখল
রুমা উপজেলা	৪৫*	৬৫৫	৯,৫৬০	রুমা গ্যারিসন, আর্মী
ক্রাউডং, আদিকদম-থানচি	১২	২০৫	৫০০	আর্মীদের সংরক্ষিত এলাকা
ডলুছড়ি, সরই, লামা	৩	১০০	১,৬০০	লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ
মোট	**৬০**	**৯৬০**	**১১,৬৬০**	

* ম্রো, মারমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মোট গ্রাম।

তিন. আলিকদম উপজেলার আলিকদম হতে থানচি সড়কের মধ্যখানে ঐতিহ্যবাহী ক্রাউডং পাহাড়ে (সেনাবাহিনী কর্তৃক বাঙালি ভাষায় অনুবাদ করে নামকরণ করা হয় 'ডিম পাহাড়') ২০১৫ সালে সেনাবাহিনীর অধীনে পর্যটন কেন্দ্রে স্থাপনের জন্য প্রায় ৫০০ একর ভূমি বেদখলের কারণে ১২টি ম্রো গ্রামের ২০৫ পরিবার উচ্ছেদ আতঙ্কে রয়েছে। আলিকদম উপজেলার সাঙ্গু মৌজা ও তৈনফা মৌজা এবং থানচি উপজেলার নাইক্ষ্যং মৌজার প্রায় ৫০০ একর জায়গা এই পর্যটন পরিকল্পনার আওতায় নেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। গত ১৪ জুলাই ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ সড়কটি উদ্বোধন করার পর বর্তমানে সেনাবাহিনী আলিকদম-থানচি সড়কের ১৯ কিলোমিটার থেকে ২৩ কিলোমিটার পর্যন্ত ক্রাউডং পাহাড়ের প্রায় ৫/৬ কিলোমিটার ব্যাপী এলাকায় 'সংরক্ষিত প্রশিক্ষণ এলাকা' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। জানা গেছে, বান্দরবান জেলার আলিকদম-থানচি মধ্যবর্তী পাহাড়ি এলাকায় ১৫০টি পরিবারের অন্তত ৫০০ জন লোক নিরাপত্তাতার অভাবে মায়ানমারে দেশান্তরিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এক কথায় বান্দরবান পার্বত্য জেলায় বিশেষ মহল ও বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমি বেদখলের কারণে অন্যান্য আদিবাসী মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, বম ও চাক আদিবাসীরাও উচ্ছেদের শিকার হলেও তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদ হয়েছে ম্রো জনগোষ্ঠী। মানবিক কারণে যেখানে ম্রো আদিবাসীদের ভূমি হারানোর বেদনা ও উচ্ছেদের যন্ত্রণা প্রশমনে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানানোর কথা, তার বিপরীতে বিশেষ মহল ও প্রভাবশালী কর্তাব্যক্তিরা ম্রো আদিবাসীদের উপর ষড়যন্ত্র চাপিয়ে দিচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, লামা উপজেলার লুলেইন মৌজার ২৫০টি ম্রো পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি; লামায় জনৈক লাদেন গ্রুপ কর্তৃক ফাস্যাখালি ইউনিয়নের ৭৫টি ম্রো, ত্রিপুরা, মারমা ও স্থায়ী বাঙালি পরিবার উচ্ছেদ করে ১৭৫ একর জায়গা জবরদখল এবং আরো ২২১টি পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি; মুজিবুল হক গং কর্তৃক মারমা গ্রামবাসীর উপর হামলা চালিয়ে লামা উপজেলার রূপসী ইউনিয়নে প্রায় ৫০০ একর জায়গা দখলের অপচেষ্টা; আলিকদম উপজেলায় বদিউল আলম নামে জনৈক প্রভাবশালী কর্তৃক ম্রো, ত্রিপুরা ও মারমা পরিবারের প্রায় ১,০০০ একর রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জমি জবরদখল ইত্যাদি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যা রাষ্ট্রযন্ত্রের মদদে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখলের ক্ষেত্রে মাৎস্যন্যায়ের অবস্থার চিত্র ফুটে উঠে।

উল্লেখ্য যে, রাবার প্লান্টেশন ও হর্টিকালচারের নামে বান্দরবান পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তির নিকট দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে হাজার হাজার একর ভূমি লীজ দেওয়া হয়েছে। লীজ গ্রহণকারীদের মধ্যে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও তাদের আত্মীয়-স্বজন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, নানা প্রভাবশালী গোষ্ঠী রয়েছে। লীজ প্রদত্ত ভূমির মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জুমচাষীদের প্রথাগত জুমভূমি। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে জুম্মদের রেকর্ডীয়

ও ভোগদলীয় ভূমিও রয়েছে। এর ফলে শত শত জুম্ম অধিবাসী তাদের জুম ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে এবং নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়ে পড়ছে। বান্দরবান সদর, লামা, আলিকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সমতল জেলার অধিবাসীদের নিকট সর্বমোট ১৬০৫টি রাবার প্লট ও হর্টিকালচার প্লট-এর বিপরীতে প্লটপ্রতি পঁচিশ একর করে ৪০,০৭৭ একর জমি ইজারা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের নামে বান্দরবান জেলায় প্রায় ৭২,০০০ একর জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু রিজার্ভ ফরেস্ট গঠনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ১৯৯০-১৯৯৮ সালে বিভিন্ন গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২,১৮,০০০ একর জমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে যার মধ্যে কেবলমাত্র বান্দরবান জেলায় ছিল ১,১৮,০০০ একর।

পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী ইজারা বাতিল ও দুর্নীতির মাধ্যমে পুনর্বহাল

১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য অউপজাতীয় ও অস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট প্রদত্ত জমি লীজের মধ্যে যারা বিগত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করেন নাই বা জমি সঠিক ব্যবহার করেন নাই সেসকল জমির ইজারা বাতিল করার বিধান রয়েছে। ২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বান্দরবান জেলায় অস্থানীয়দের নিকট প্রদত্ত ইজারার মধ্যে যে সমস্ত ভূমিতে এখনো চুক্তি মোতাবেক কোন রাবার বাগান ও উদ্যান চাষ করা হয়নি সেসমস্ত ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তৎসময়ে বান্দরবান সদর, লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় যেসব লীজ গ্রহীতাগণ বাগান সৃজন করে নাই তাদের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তক্রমে প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বাগান সৃজিত না করে চুক্তি পত্রের শর্ত লঙ্ঘিত করার কারণে ৫৯৩টি প্লট বাতিল করা হয়।

কিন্তু বান্দরবান পার্বত্য জেলা প্রশাসন দুর্নীতির মাধ্যমে ও নিরাপত্তা বাহিনী যোগসাজশে লীজ বাতিলের দু' মাসের মাথায় বাতিলকৃত প্লটগুলোর মধ্যে অধিকাংশ প্লট পুনরায় বহাল করে। অন্যদিকে অবশিষ্ট প্লট কাগজে কলমে বাতিল করা হলেও উক্ত ভূমি প্লট মালিকদের দখলে রয়েছে। পক্ষান্তরে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া, ভূমি কমিশন আইন সংশোধন না হওয়া, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া এবং পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী লীজ বাতিল না হওয়ার কারণে অস্থানীয় ও বহিরাগত বাঙালিরা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের ছত্রছায়ায় ও যোগসাজসে ইজারা ভূমির নামে হাজার হাজার একর ভূমি জবরদখল করে চলেছে এবং উক্ত জায়গা-জমি থেকে জুম্মদের চলে যেতে হুমকি দিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু এলাকায় ভাড়াটিয়া বহিরাগত বাঙালি শ্রমিকদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্ম গ্রামবাসীর উপর হামলাও চালিয়েছে। ফলত আদিবাসী খ্রো গ্রামবাসীসহ জুম্মরা শংকিত ও উদ্বিগ্নাবস্থায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে খ্রো জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ

বান্দরবান জেলায় পাইকারীভাবে ভূমি জবরদখল এবং একের পর এক জুম্ম গ্রাম উচ্ছেদের প্রেক্ষিতে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বান্দরবান জেলা শহরে রাজার মাঠে এক বিশাল ভূমি অধিকার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে চিম্বুক, সুয়ালক, টংকাবতী ইত্যাদি এলাকা থেকে শত শত খ্রো জনগোষ্ঠীর লোক অংশগ্রহণ করে। সমাবেশে বিশেষ করে খ্রো অধ্যুষিত এলাকায় পাইকারীভাবে ভূমি জবরদখল এবং ভূমি থেকে খ্রোদের উচ্ছেদের কথা উত্থাপিত হয়। ২০০৪ সালে চিম্বুক পাহাড়ে বন বিভাগের ইকো-পার্ক স্থাপন ও সেনাবাহিনী নিরাপত্তা বেষ্টনীর নামে ব্যাপক এলাকা চিহ্ন দিয়ে দখল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই এলাকায় কমপক্ষে ২৫০ খ্রো পরিবারকে জুমচাষে বাধা প্রদান করতে থাকে বন বিভাগ ও সেনাবাহিনী। তারই প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ২০০৬ জনসংহতি সমিতির সহযোগিতায় চিম্বুক এলাকায় খ্রোদের এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশের প্রাক্কালে খ্রো গ্রামবাসী কর্তৃক টাঙানো কমপক্ষে ১০টি ব্যানার সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে যায়। খ্রো অধিবাসীসহ স্থানীয় জুম্ম জনগণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে ইকো-পার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে বন বিভাগ সরে গেলেও নিরাপত্তা বেষ্টনীর নামে শত শত একর খ্রোদের জুমভূমি সেনাবাহিনী এখনো দখল করে রেখেছে।

জরুরী অবস্থার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান তথা জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে টংকাবতী এলাকায় খ্রো জনগোষ্ঠী নিয়ে ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে কয়েক বার সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি (বর্তমানে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রী) রাশেদ খান মেমন, জাসদের সভাপতি (বর্তমানে তথ্য মন্ত্রী) হাসানুল হক ইনু, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও রাজনীতিক পঙ্কজ ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যোগ দিয়েছিলেন। এসব সমাবেশে ভূমিএসব সমাবেশে ভূমি জবরদখলকারীদের প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে খ্রো গ্রামবাসী শপথ নিয়েছিলেন। ২০১৫ সালে বান্দরবান জেলা প্রশাসক, আলিকদম সেনা জোন, আলিকদম উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রমুখ সিভিল ও সামরিক প্রশাসনের ছত্রছায়ায় আলিকদম উপজেলায় বদিউল আলম নামে জনৈক প্রভাবশালী কর্তৃক খ্রো, ত্রিপুরা ও মারমা পরিবারের প্রায় ১,০০০ একর রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেও কোন প্রতিবিধান না পেলে বদিউল আলম গং-এর ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে অন্যান্য জনগোষ্ঠীসহ খ্রো গ্রামবাসীরা সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ করতে থাকে এবং একপর্যায়ে বদিউল আলম গং কর্তৃক ভূমি জবরদখল কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। সেসময় খ্রো জনগোষ্ঠীর ভূমি রক্ষায় ক্ষমতাসীন স্থানীয় নেতৃত্বের কেউ এগিয়ে আসেনি।

অপরদিকে ফাস্যাখালী ইউনিয়নের সাঙ্গু মৌজায় মো: আনিসুর রহমান ওরফে লাদেন-এর নেতৃত্বে কথিত লাদেন গ্রুপ কর্তৃক, সরই ইউনিয়নের ডলুছড়ি মৌজায় লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্তৃক এবং ডলুছড়ি, লুলেইন ও বমু মৌজায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক খ্রো অধ্যুষিত এলাকার হাজার হাজার একর জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেও খ্রোরা কোন সুবিচার পায়নি। সর্বশেষ গত

২১ মে ২০১৪ এই ভূমি আগ্রাসনের প্রতিকার চেয়ে বিভিন্ন মৌজার বিভিন্ন গ্রামের ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা ২৭০ জন স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীসহ স্থানীয় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে অনুলিপি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরণ করে। কিন্তু আজ অবধি সরকার ভূমি বেদখলকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, ক্ষমতাসীন স্থানীয় নেতৃত্ব ভূমি বেদখলকারীদের পক্ষাবলম্বন করে ভূমি বেদখলের শিকার জুম্ম জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে হয়রানি করে থাকে।

যেমন গত ২৯ মে ২০১৫ লামা উপজেলায় পাঁচ জুম্ম গ্রামে ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে আদিবাসী খ্রো ও মারমা গ্রামবাসীরা বাধা দিলে তখন গাজী রাবার প্লান্টেশনের শ্রমিকরা জুম্মদের উপর হামলা করে। ঘটনার পরবর্তীতে কোম্পানী উল্টো জুম্মদের বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং তারই প্রেক্ষিতে ৩০ মে ২০১৫ লামা উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের রূপসী পুরাতন পাড়ার কার্বারী (গ্রাম প্রধান) কই হ্লা চিং মারমাকে আটক করা হয়। রূপসী পুরাতন মারমা পাড়ায় ৩০ পরিবার, চিং কুং খ্রো পাড়ায় ৩০ পরিবার, কোনাউ খ্রো পাড়ায় ২৫ পরিবার, নোয়া মারমা পাড়ায় ১৫ পরিবার এবং সদর উপজেলাধীন সিং কুং মারমা পাড়ায় ১৫ পরিবার তাদের চিরায়ত বসতভিটা ও ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আতঙ্কে বসবাস করছে। একই কারণে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বান্দরবান জেলাধীন আলিকদম উপজেলার আলিকদম ইউনিয়নে পুঁজিখাল মংপাইং খয় কার্বারী পাড়ায় কার্বারীর ছেলে টোটুল খ্রোকে ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে বেদম মারধর করেছে আলিকদম জোনের সেনাসদস্যরা। আরো জানা যায় যে, গত ২১ মার্চ ২০১৭ আলিকদম জোন আওয়াধীন লামা চম্পাতলী সেনা ক্যাম্পের সেনারা লুলাইন মৌজার হেডম্যান শিংপাত খ্রোকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। এভাবেই আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন স্থানীয় নেতৃত্ব গোড়া থেকেই অবৈধ ইজারাদার ও ভূমিদস্যুদের রক্ষায় উঠেপড়ে লেগেছে।

একই কারণে গত ৬ মে ২০১৭ বান্দরবান জেলার লামায় বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাহাড়িদের ভূমি বেদখল ও আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদের অভিযোগ বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত এবং তথ্য সংগ্রহ করতে ঐক্যন্যাপের সভাপতি ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী পঙ্কজ ভট্টাচার্য ও নোমান আহমেদ খানের নেতৃত্বে ঢাকা থেকে আগত একটি নাগরিক প্রতিনিধিদলকে সেনাবাহিনী কর্তৃক লামা ও বান্দরবান সদরে ঢুকতে দেয়নি। খ্রো জনগোষ্ঠীসহ লামায় জুম্মদের তাদের জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ ও ভূমি জবরদখলের ঘটনাগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই নাগরিক প্রতিনিধিদলকে বান্দরবানে ঢুকতে বাধা দেয়া হয়েছিল বলে বলা যায়। এমনকি বহিরাগত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিশেষত খ্রো জনগোষ্ঠীর ভূমি বেদখল ও পাহাড়ি গ্রাম উচ্ছেদকে আড়াল করতে সাম্প্রদায়িক ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলকে দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ও ক্ষমতাসীন স্থানীয় নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালি এবং সুবিধাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল কতিপয় খ্রো কর্তৃক এক অবরোধের নাটক করা হয়েছিল। খ্রোদের বর্তমান অবস্থা পরিদর্শনে আসা ঢাকার নাগরিক প্রতিনিধিদলকে খ্রো গ্রামবাসীরাই তাড়িয়ে দিয়েছে বলে স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষের মদদে এই সুবিধাবাদী কায়েমী গোষ্ঠী অপপ্রচার করেছে। অপরদিকে নাগরিক প্রতিনিধিদলকে বাধাদানের বিরুদ্ধে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিবাদে ঝড় উঠলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সেনাবাহিনী জনসংহতি সমিতির সাথে সম্পৃক্ত খ্রো সদস্যসহ খ্রোদের ভূমি অধিকার নিয়ে সোচ্চার খ্রোদেরকে আলিকদম জোনে ডেকে নিয়ে নানা ধরনের হুমকি ও হয়রানি করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

শুধু তাই নয়, এসব জুম্ম-স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রম ধামাচাপা দিতে এবং ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে গত ৩ মে ২০১৭ বান্দরবান সদরে এবং তার পরে গত ৮ মে ২০১৭ লামায় জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর মদদে আলিকদম মুরুং কল্যাণ সংসদের নামে তথাকথিত মুরুং বাহিনীর কম্যান্ডার মেনদন খ্রো ও কথিত মুরুং কমপ্লেক্সের পরিচালক ইয়াংলক খ্রোর নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। সাধারণ খ্রো জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে খ্রো যুব সমাজ সেনাবাহিনী তথা শাসকশ্রেণির এই চক্রান্তকে ঘৃনাভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। খ্রোদের প্রতি এতই যদি দরদ থাকে তাহলে কেন খ্রোদের বেহাত হওয়া জায়গা-জমি উদ্ধার করেদিচ্ছেন না বা বেদখলের মুখে থাকা জায়গা-জমি রক্ষা করে দিচ্ছেন না- সেনা কর্তৃপক্ষের মুখে এমন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে খ্রো যুবকরা, যা সেনা কর্তৃপক্ষ কোন সদুত্তর দিতে পারেনি।

এভাবেই আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপন্ন খ্রো জাতি একদিকে ব্যাপক ভূমি জবরদখল ও উচ্ছেদের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে শাসক মহলের কায়েমী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে চরম সংকটের মধ্যে পতিত হয়েছে তাদের জীবন-জীবিকার অস্তিত্ব ও আবাসভূমি। তাই শাসকমহলের যারা খ্রো জনগোষ্ঠীর ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদের প্রক্রিয়া মদদ দিচ্ছে এবং শাসকশ্রেণির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে যারা দালালি করে খ্রো জনগোষ্ঠীসহ জুম্মদের ক্ষতিসাধন ও বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছে, তাদের সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়ানোর জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিশেষ করে সচেতন শিক্ষিত খ্রো যুব সমাজকে এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিপন্ন খ্রো জনগোষ্ঠীর ভূমি ও জীবন-জীবিকার অধিকার সুরক্ষায় খ্রো জনগোষ্ঠীসহ ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদের শিকার সকল পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং সেই সাথে দেশের গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল নাগরিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে আরো জোরালো ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

দ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হোক তরুণ প্রজন্ম

বাচ্চু চাকমা

সাম্প্রদায়িক হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ও হত্যার অহরহ অমানবিক ঘটনাবলীর জন্ম দিয়েছে শাসকশ্রেণি। বারে বারে এই রাষ্ট্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, জীবন আমাদের নয়। সেকারণে এই ঘটনাবলী বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমাদের এই প্রজন্মের ছাত্র তরুণ সমাজ আবারও দেখল লংগদু জ্বলছে। চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিহাসের পাতা উল্টাতে গিয়ে মনের ভেতর থেকে এক ধাক্কা অসহ্য যন্ত্রণা, বেদনাকর দূর্বিষহ জীবনের বাস্তব চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

২ জুন ২০১৭ এর লংগদুর ঘটনায় অতীতের লোমহর্ষক সকল ঘটনাবলী হঠাৎ মনে পড়ে গেল। লংগদুর পাহাড়িদের বাড়িঘরে এই আগুন স্বাভাবিক আগুন নয়। এটি মানব সৃষ্ট আগুন। মানুষরূপী একদল নরপিশাচ পাহাড়িদের ঘরে আগুন দিয়েছে। সেদিন সকালে ফেইসবুক খোলার পর টাইম লাইনের শিরোনাম লংগদুতে আগুন জ্বলছে। আমি তখন বাঘাইছড়িতে সাংগঠনিক কাজে অবস্থান করছিলাম। আকাশের কাল মেঘের ঘনঘটা, প্রাকৃতিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। প্রাকৃতিক বৈরিতার মধ্যে দিয়ে কয়েক দিন ধরে ঝিরঝিরে হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। বাঘাইছড়ির ঐ প্রান্তের পাহাড় থেকে শুভাকাঙ্ক্ষীদের ফোন আসতে লাগল। জানতে চাইলো লংগদুর কি অবস্থা? তখনও সংবাদগুলো ঝাপসা ঝাপসা, সঠিক খবরা-খবর সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। সাথে সাথে লংগদুতে আমার প্রিয় সংগঠনের কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ফোন করলাম। খবর আসলো লংগদুর অবস্থা খুবই খারাপ, থমথমে পরিস্থিতি। সেটেলার বাঙালিরা পাহাড়িদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে। বস্তুত সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালিরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার করে দিয়েছে। ফিরে যাই ২৮ বছর আগে ১৯৮৯ সালে ৪ঠা মে লংগদুর বুকে ঘটে যাওয়া পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বর্বরতম গণহত্যাকান্ডে। সেই লংগদুর গণহত্যা আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজকে এখনও ব্যথিত করে-যন্ত্রণা দেয়, অন্তরকে বিদ্ধ করে। সেদিন বেদনাকর নিষ্ঠুর ও অমানুষিক হামলা, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যাকান্ড চালিয়ে শাসকশ্রেণি নিজেকে যেমনি কলংকিত করেছিল, তেমনি জুম্ম জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে আরও রক্তাক্ত ও অগ্নিময় করে তুলেছিল।

২৮ বছর আগে লংগদুর গণহত্যা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে নতুন করে জন্ম দিয়েছে একটি আপোষহীন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের। লংগদুর রক্তই পাহাড়ি ছাত্র সমাজকে প্রতিরোধের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজেদের জীবনকে সমর্পিত করতে অনুপ্রাণিত করেছে। পার্বত্যাঞ্চলের শত শত হাজারো ছাত্র সমাজের তারুণ্যেকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। লংগদুর রক্তই তৎকালীন সময়ের সচেতন তরুণ ছাত্র সমাজকে নাড়া দিয়ে যায়। প্রতিরোধের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তরুণ ছাত্র সমাজ সঠিক দিশা খুঁজে পেয়েছে। লংগদুর রক্ত গোটা জুম্ম ছাত্র সমাজের ধমনীতে কম্পন ধরিয়েছিল। এখনও সেই কম্পন তারুণ্যের ধমনীতে নদীর স্রোতের ন্যায় বহমান। সেই লংগদুর আগুন পার্বত্যাঞ্চলের সমগ্র তরুণ ছাত্র সমাজকে যে বিদ্রোহী করে তুলেছে সেই বিদ্রোহের আগুন এখনও নিভে যায়নি। দীর্ঘ ২৮ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক রক্ত ঝড়েছে। সাম্প্রদায়িক হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ ও হত্যার অহরহ অমানবিক ঘটনাবলীর জন্ম দিয়েছে শাসকশ্রেণি। বারে বারে এই রাষ্ট্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, জীবন আমাদের নয়। সেকারণে এই ঘটনাবলী বার বার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমাদের এই প্রজন্মের ছাত্র তরুণ সমাজ আবারও দেখল লংগদু জ্বলছে। চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিহাসের পাতা উল্টাতে গিয়ে মনের ভেতর থেকে এক ধাক্কা অসহ্য যন্ত্রণা, বেদনাকর দূর্বিষহ জীবনের বাস্তব চিত্র আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে।

পাহাড়ের বুকে সেই সময় জুম্ম জনগণের উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় বর্বরতম নির্যাতন চালিয়েছে শাসকশ্রেণি। গুচ্ছগ্রাম, শান্তি গ্রাম, আদর্শ গ্রাম নাম দিয়ে জুম্ম জনগণকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো করা হতো। চারিদিকে সেনা বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হতো। সেনাবাহিনীর অনুমতি ছাড়া সেনা বেষ্টনী থেকে কেউ কোথাও বের হতে পারতো না। বন্দী নিবাসে পাহাড়ের মানুষের জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। জুম্ম জাতির সেই কালো অধ্যায়গুলোর কথা তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজ কখনো ভুলে থাকতে পারে না। হে তরুণ বিশেষ করে জুম্ম ছাত্র সমাজ আবারো তোমার উদ্দেশ্যে এই লেখাটি। ৬০ দশকে মহান নেতার কণ্ঠে জুম্ম জাতির চেতনাবোধ জাগ্রত করার ডাক এসেছে। সেই সাথে সাথে 'কাপ্তাই বাঁধ জুম্ম জাতির মরণ ফাঁদ' এটি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার পর তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজকে সংগঠিত করে মানব সৃষ্ট কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের এক পর্যায়ে প্রিয়নেতাকে গ্রেফতার করে জেলে অন্তরীণ করা হলো, পাকিস্তান সরকার নির্লজ্জভাবে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করলো। তখন জুম্ম জনগণের উপর নেমে এলো মহাবিপর্যয়, যা ভাষায় প্রকাশ করার নয়! ৭০ দশকে মহান নেতার

নেতৃত্বে সমগ্র জুম্ম সমাজ সংগঠিত হলো, প্রতিষ্ঠা করলো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের প্রাণের অন্যতম রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। আবারো মহান নেতার ডাকে সাড়া দিয়ে বিজাতীয় শাসন-শোষণ থেকে মুক্তিলাভের আশায় সাত পাঁচ না ভেবে দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামে অগণিত জুম্ম ছাত্র ও তরুণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন সামন্তীয় সমাজের চিন্তাধারা থেকে মানুষগুলোকে জুম্ম জাতীয় মুক্তির চেতনায় জাগরণের গান শুনিয়ে পার্বত্যাঞ্চলের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে সেই সময়ের তরুণ সমাজ।

অতীতের ন্যায় এবারেও আগুনের স্ফূলিঙ্গ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে পার্বত্যাঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। সেই স্ফূলিঙ্গ থেকে দাবানল সৃষ্টি করে পার্বত্যাঞ্চলের সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও চুক্তি বিরোধী চক্রকে চিরতরে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র থেকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত করতে হবে। সেই মহান কাজটি সম্পন্ন করার প্রয়াস অব্যাহত রাখুক আমাদের বর্তমান তরুণ ছাত্র ও যুব সমাজ। অতীতের সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, ঘৃণা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ তরুণ সমাজের অন্তরে পুঞ্জিভূত করে মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে আগুনের লেলিহান শিখায় দগ্ধ করে শাসকগোষ্ঠীর সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়নে র স্টিম রোলার চিরতরে স্তব্ধ করতে হবে। শাসকশ্রেণি রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত হাতিয়ার আমাদের জুম্ম জাতির উপর নিক্ষেপ করছে। উৎপীড়ক শাসকশ্রেণি প্রতিটি ক্ষেত্রে নগ্ন থাবা বিস্তার করে চলেছে। জাতিগত নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার আমরা চারিদিকে, ন্যায় বিচার আমরা কোথাও পাই না। হয়রানি ও বিমাতাসুলভ আচরণের শিকার হয়ে জুম্ম জনগণ সর্বোচ্চ হারাচ্ছে। অনন্তকাল ধরে বসবাসরত আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভিটামাটি প্রতিদিন বেদখল করে নেওয়া হচ্ছে। শাসকশ্রেণির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নীরবে প্রতিদিন বেআইনীভাবে বহিরাগত বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটানো হচ্ছে। সেই বহিরাগত বাঙালিদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছে লংগদুর বুকে সাম্প্রদায়িক হামলা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও মানবতা বিরোধী সকল কর্মকান্ড।

লংগদুর গৃহহীন মানুষের জীবন সরেজমিনে গিয়ে দেখে আসলাম। শুধু দেখে আসিনি বেদনাদায়ক জীবনের সাথী হতে গিয়েছিলাম। শুনেছি প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালিদের তান্ডবলীলার হিংস্রতার গল্প। এতই অমানবিক আচরণ করেছে তারা যা দানবরূপী হিংস্র পশুদেরকেও হার মানায়। বাত্যাপাড়া, মানিকজোড়ছড়া ও তিনটিলা এই তিনটি গ্রাম ঘুরে দেখা যায় সেটেলার বাঙালিরা পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে সব শেষ করে দিয়েছে। ঘরে তোলা ফসল, ধান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। লোকজন এখনও বাড়িঘরে ফিরতে পারেনি, খোলা আকাশের নিচে তাদের জীবন। সরকারের পক্ষ থেকে বাড়ি নির্মাণের আশ্বাস দেওয়া হলেও তার কোন কার্যকর পদক্ষেপ এখনও দেখা যায়নি। নতুন করে বাড়ি নির্মাণের জন্য একটা খুঁটিও চোখে পড়েনি। আশেপাশে অনেক অস্থায়ী পুলিশ ও বিজিবি ফাঁড়ি, সেনাবাহিনীর টহলটিম ও তাদের আনাগোনা সবই আছে। কিন্তু গৃহহারা লংগদুর আদিবাসীরা নিরাপদ মনে করে না। লংগদু ঘরহারা মানুষের দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা দেখলে আবেগাপ্লুত না হয়ে পারা যায় না। তাদের সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তি, বাড়িঘর হারিয়ে এখন নিঃস্ব ও সর্বহারা। এই ক্ষতি কোন দিন পূরণ হবে না। তিনটি আদিবাসী গ্রামে ২১৭টি বাড়িঘর, ১৯টি দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই করে দেয়া হয় এবং ৮৮টি বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। সেটেলার বাঙালিরা পেট্রোল ও কেরোসিন ঢেলে একের পর এক অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। সেটেলার বাঙালিরা এক ধরনের গ্যাসের বোতলও ব্যবহার করেছে, যার কারণে পাকা ও আধা-পাকা ঘরবাড়িতে দ্রুত আগুন লেগে যায় এবং সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বর্ষাকালে গৃহহারা মানুষের জীবন যে কত দূর্বিসহ হতে পারে তা ভুক্তভোগী নাহলে অনুভব করা যায় না। লংগদুর সাম্প্রদায়িক হামলা, লুটপাট ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ এর প্রতিবাদে ভারতের বিহারের বুদ্ধগয়ায় ৫ জুন ২০১৭, আগরতলায় ৮ জুন ২০১৭, কানাডায় ১১ জুন ২০১৭, অস্ট্রেলিয়ায় ১২ জুন ২০১৭, ফ্রান্সের প্যারিসে ১৫-১৬ জুন ২০১৭, ২৯ জুন ২০১৭ আমেরিকার ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের সামনে প্রতিবাদ হয়েছে এবং এছাড়াও মায়ানমার, জাপান, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ভারতের দিল্লীসহ অনেক দেশে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে। সেই প্রতিবাদ থেকে বলা হয়েছে, লংগদুর সন্ত্রাস, পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন দিয়ে মানুষ হত্যা, বহুজনকে গৃহহীন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে নতুন করে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

২ জুন ২০১৭ লংগদুতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটার সাথে সাথে ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় অপরাজেয় বাংলা থেকে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ব্যানারে ঢাকার জুম্ম শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে শাহবাগে সমাবেশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও ২৯৯ নং পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার ৫ জুন ২০১৭ দশম জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশনে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে লংগদুতে পাহাড়িদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত বলে অভিযোগ করে এ ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানিয়েছেন। লংগদুতে সেনা-পুলিশের ছত্রছায়ায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সাম্প্রদায়িক হামলার উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে লংগদু হামলা ও অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত ব্যক্তি, নিরাপত্তা ও আইন-প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্যদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা, ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের বাড়ি নির্মাণ ও কমপক্ষে ৬ মাসের রেশনসহ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প ও অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার করা, সেটেলার বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান করার দাবিসহ ৭ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়।

লংগদুর পাহাড়িরা না খেয়ে থাকেনি, বিশ্ব বিবেক কেঁদেছে তাদের অসহায়ত্ব দেখে, জাগ্রত হয়েছে মানবতা। বেসরকারীভাবে মানবতাবাদী মানুষেরাই সব জায়গা থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করে লংগদুবাসীর পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছে। দানবরূপী নরপিশাচের দল যতই ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠুক না কেন, সত্যকে আড়াল করে

কখনো মিথ্যার জয় হবে না। পৃথিবীতে সব সময় ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে, অত:পর মিথ্যার পরাজয় অনিবার্য এবং অপরিহার্যও বটে। ২৩৬টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়, ৭৫ বছর এক বৃদ্ধ মহিলা গুণমালা চাকমাকে সেই নরপিশাচের আগুনে পুড়ে ছাই হতে হলো। হায়রে বৃদ্ধার জীবন শাসকরূপী রাষ্ট্রযন্ত্রের অপশাসনে তোমাকে এভাবে জীবন দিতে হলো! হে তরুণ আবারও বলছি, পৃথিবীব্যাপী যা কিছু অগ্রগতি ও পরিবর্তন, বিবর্তন হয়েছে শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের শ্রমের বিনিময়ে হয়েছে। সেকারণে জুম্ম জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পাহাড়ের বুকে বেঁচে থাকা নিরন্ন খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষগুলোকে ঐক্যবদ্ধ ও জাগ্রত করার দায়িত্ব তরুণ ছাত্র সমাজের উপর বেশি। জেল, জুলুম, পুলিশ, নির্যাতন-নিপীড়ন, দমনপীড়ন মৃত্যু কিছুতেই এই তরুণ সমাজ ভয় পায় না। ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ বেয়ে চলার তাদের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ যে জ্ঞান, সেটা আহরণ করে ভবিষ্যত দিনগুলোতে আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজকে আরো অধিকতরভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে বীর যোদ্ধাদের আদর্শের ঝান্ডা বহন করে জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তরুণ সমাজকে সামিল হতে হবে। পৃথিবীর বুকে কোন শাসকশ্রেণি অধিকার বঞ্চিত কোন জাতিকে সংগ্রাম ছাড়া, বিপ্লব ছাড়া অধিকার দেয়নি। পাহাড়ের বুকে জুম্ম জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে- অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। আপনাদের নিশ্চয় অজানা নয়, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা আরো কঠিন। ঠিক তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করার চেয়ে চুক্তি বাস্তবায়ন করাও অনেক কঠিন। সেই কঠিন কাজটি বাস্তবায়নের জন্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রাম নিরন্তরভাবে চালিয়ে যেতে হবে। ১৯৮৯ সালে ৪ঠা মে লংগদুর রক্তই জুম্ম ছাত্র সমাজের প্রাণের সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জন্ম দেয়। সেই জুম্ম সমাজের প্রাণপ্রিয় সংগঠনের পথচলা আজ ২৮ বছর। দীর্ঘ ২৮ বছরের মাথায় এসে আবারও তরুণ ছাত্র সমাজ প্রত্যক্ষ করলো লংগদু জ্বলছে! কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এর ছাড়পত্র কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে তরুণ ছাত্র সমাজের তারুণ্যের ভিতকে দ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। কবিতায় বলা হয়েছে-

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তুপ-পিটে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশির্বাদ,
তারপর হবো ইতিহাস।

অন্যায়কে প্রতিহত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে কেবলমাত্র এই তরুনেরা। জুম্ম জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের তারুণ্যের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। প্রবীনের বুদ্ধি ও নবীনের শক্তি এই দুইয়ের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে জুম্ম জাতির মুক্তি মিলবে।

লংগদুর মতো আর কতবার সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হবে জুম্মরা?

ধীর কুমার চাকমা

বিজু ২০১৭ উদযাপন কমিটির বিজু-উত্তর পুনর্মিলনী উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় যোগ দিতে যাই। উদযাপন কমিটির সকল উপকমিটির সংশ্লিষ্ট সবাই উপস্থিত প্রায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উদযাপন কমিটির সম্মানিত আহ্বায়কের আগমনের সাথে সাথে সভার কার্যক্রম যথারীতি শুরু হবে। এমতাবস্থায় সম্মানিত আহ্বায়ক উপস্থিত হলে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। তাৎক্ষণিক মুহূর্তে লংগদু থেকে ফোন আসলো লংগদুতে আগুন জ্বলছে। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হলো। ফোনে লংগদুর খবর নেয়া হলো। সবাইয়ের মুখে একটাই কথা '৮৯ সালে লংগদু গণহত্যার রক্তের দাগ এখনো মুছে যায়নি। আর কতবার সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হবে এই লংগদু!! ডিজিটেল যুগের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক খুলে দেখা গেল, জুম্মদের গ্রামে আগুন জ্বলছে। লংগদুর আকাশ আগুনের লেলিহান শিখা আর কালো ধুম্র কুন্ডলিতে ছেঁয়ে গেছে। আদিবাসী জুম্ম আবালবৃদ্ধবণিতা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু তারা যাবে কোথায়? সেই লংগদু তো আর '৪৭ সালের জুম্মদের লংগদু নয়। সেটা এখন চারিদিকে সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ও সেটেলার বাঙালি পরিবেষ্টিত নিষিদ্ধ জনপদ।

এখানে আস্থার সংকট সাধারণ পাহাড়ি-বাঙালির মধ্যে নয়। আস্থার সংকট তৈরী হয়েছে প্রশাসন আর সাধারণ জনগণের মধ্যে। কারণ বাত্যা পাড়ার ভাড়ায় মোটর চালক সাইকেল নুরুল ইসলাম নয়নের লাশ নিয়ে মিছিল বের করার আগে, সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটার বহু পূর্বে জুম্ম জনপ্রনিধিরা সম্ভাব্য ঘটনার আশঙ্কা প্রকাশ করে যথাযথ নিরাপত্তা বিধানের কথা বলেছিলেন লংগদুর স্থানীয় সেনা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের কাছে গিয়ে। তখন জনপ্রতিনিধিদেরকে লংগদুর স্থানীয় জোন কম্যান্ডার এবং থানার পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস দিয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কার্যত প্রতিবাদ মিছিলের সময় সেনা ও পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতি সাম্প্রদায়িক হামলা ও জুম্ম ঘরবাড়ি অগ্নিসংযোগ করা হলো। উপরন্তু ঘটনার পূর্বে যে সব সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা জুম্ম জনপ্রতিনিধিদের সার্বিক নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন তাদেরই ছত্রছায়ায় সমাবেশে অংশগ্রহণকারী সেটেলার বাঙালিরা এই অমানবিক হামলা সংঘটিত করেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে সাধারণ জনগণ স্থানীয় সেনা ও পুলিশ প্রশাসনের উপর কিভাবে আস্থা বিশ্বাস রাখতে পারবেন?

সুতরাং এই সেনা ও পুলিশ কর্মতকর্তাদের বর্তমান পদে বহাল রেখে লংগদুর দুর্দশা কবলিত জুম্ম জনগণের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কোনভাবেই নিষ্কন্টক হতে পারে না। লংগদুর ট্রাজেডি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের শিক্ষা নিতে হবে। নচেৎ দুর্বত্তরা বরাবরই প্রশাসনের নাকের ডগায় লংগদুর মতো দুষ্কর্ম করার সাহস পাবে। বিজ্ঞজনের সতর্কবাণী হচ্ছে, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পর এরকম দুস্কৃতিকারীদের টার্গেট নাকি যে কোন অছিলায় তিন পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার দিকে। তার অর্থ হতে পারে সেটেলার বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল সম্প্রসারণের জন্য তারা এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে।

ঘটনার দিন জ্বলন্ত গ্রাম থেকে কিয়ৎদূর গিয়ে জুম্মরা ঘনঘন পেছন ফিরে তাকায় আর পালাতে থাকে। ফেইস বুকের ছবিতে দেখা যায় একদিকে কর্তব্যরত সেনা, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশছোঁয়া আগুনের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। আরেকদিকে জুম্মরা বাধা দিতে চাইলে সেনা সদস্যরা তাদেরকে ধাওয়া করছে। সেনাবাহিনীর পেছনে রয়েছে সেটেলার বাঙালি যারা সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় প্রকাশ্যে জুম্মদের ঘরবাড়ি লুটপাট করে। সেদিনের ঘটনা ১৯৮৬ সালের ২৯-৩০ জুন জুম্মদের ঘরবাড়ী জ্বালাও-পোড়াও'র মতো নৃশংস ঘটনাকেও ম্লান করে দিয়েছে। সেদিনও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায়- মাটিরাঙ্গা, রামগড়, গুইমারা, পানছড়ি, দীঘিনালা, মহালছড়ি এবং খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় এরকম জ্বালাও-পোড়াও হয়েছিল। তারপর ১ জুলাই'৮৬ থেকে সীমান্তের ওপাড়ে ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরায় দফায় দফায় ৬২ হাজারের অধিক আদিবাসী (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাঁওতাল ইত্যাদি) শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। এই শরণার্থী প্রবাহ ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিত তথাকথিত স্থানীয় সরকার পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাক মূহুর্ত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। উল্লেখ্য, ৭২ হাজার আদিবাসী জুম্মদের বিদেশের মাটিতে (শরণার্থী শিবিরে) রেখে তথাকথিত চাপানো স্থানীয় সরকার পার্বত্য জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৮৬ সালের জুলাই থেকে একাক্রমে ১২টি বছর ত্রিপুরা শরণার্থী শিবিরে কেটে যায় ৭২ হাজারের অধিক পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম শরণার্থীদের জীবন। আজ ১৯৯৭ সালে ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সম্পাদিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ২০ বছরে পদার্পণ করেছে। কিন্তু চুক্তির মৌলিক ধারাগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। বিপরীতে বর্তমান পরিস্থিতি চুক্তি-পূর্বকালের নাজুক পরিস্থিতিকেও হার মানিয়েছে। দেশের যে নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশ, আনসার বাহিনী আমাদের দেশের গৌরব আজ সেই বাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালি দ্বারা এরকম সাম্প্রদায়িক হামলা হবে সেটা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বিশ্বাস করা যায় না এবং ঘটনার বাস্তবতা বুঝা সম্ভব নয়।

এ বছর বিজুর আগে থেকে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার দুর্গম সাজেক ইউনিয়নে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সাজেকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাসীরা বিজু উৎসবের দিনে না খেয়ে কাটিয়েছিল। সাজেকে দুর্ভিক্ষ জর্জরিত জনজীবনের বিপন্নতা না কাটতেই

আবারো নানিয়াচরে সেনা-নির্যাতনে রোমেল হত্যাকান্ডকে ঘিরে রাঙ্গামাটি তথা দেশের সর্বত্র তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহলের ইঙ্গিতে মে ২০১৭ মাঝামাঝি সময়ে তথাকথিত বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের দাবিতে সমঅধিকার আন্দোলন, বাঙালি ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি নামধারী সাম্প্রদায়িক সংগঠনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি শহরে আয়োজন করা হয় সমাবেশ। সমাবেশে বক্তারা চরম সাম্প্রদায়িক, উত্তেজনাকর এবং উসকানীমূলক বক্তব্য দেন।

তারপর ১ জুন ২০১৭ খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কে, কৃষি গবেষণা নামক স্থানে কে বা কারা নুরুল ইসলাম নয়ন নামে একজন মোটর সাইকেল চালক বাঙালিকে হত্যা করে তার মৃতদেহ ফেলে রেখে যায়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন তার লাশ উদ্ধার করে মৃতের বাড়ি লংগদুর বাত্যাপাড়ায় নিয়ে আসেন। এখানে অসাম্প্রদায়িক পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মোটর সাইকেল চালক নয়নকে হত্যা করা নি:সন্দেহে নিন্দনীয় ও চরম অমানবিক। যেই বা যারা এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকুক না কেন তার বা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। তবে খুনীকে সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত না করার আগে মনগড়া কাউকে খুনী সাব্যস্ত করা এবং প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে হামলা করা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । "লাশটা বাঙালি হলে খুনী অবশ্যই পাহাড়ি হবে অথবা লাশটা পাহাড়ি হলে খুনী অবশ্যই বাঙালি হবে" এমন সাম্প্রদায়িকতা কখনোই কাম্য হতে পারে না।

আজকে এমনতর অপরিণামদর্শী ব্যক্তির কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক শান্তি-সম্প্রীতির পরিস্থিতি অবনতির অন্যতম কারণ। সমগ্র বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক সহিংসতার অপসংস্কৃতি বিরাজমান তাতে করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অনেক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তি এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে। তাই সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হতে পারে। সকল শান্তিকামী মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শান্তিপ্রিয় নাগরিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত। তবে কথা হচ্ছে, সাধারণ মানুষের ঘাড় থেকে ভূত তাড়ানোর জন্য সরিষাই যথেষ্ট। কিন্তু সরিষার মধ্যে যদি ভূত থাকলে সেই ভূতকে কিভাবে তাড়ানো যাবে? সরিষার অভ্যন্তরের ভূতই পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিকামী জনতার অশান্তির মূল কারণ। এই কারণ বুঝার ক্ষমতা এবং ভূত তাড়ানোর ক্ষমতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সরিষার ভূতের তাড়নায় শান্তিকামী জনজীবন কখনো নিষ্কন্টক হবে না। পোড় খেয়ে খেয়ে শান্তিকামী জুম্ম জনতাকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আপাততঃ তার বিকল্প উপায় খুবই সীমিত বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে সেকথা তো চিরন্তন সত্য। এসত্যের অপলাপ করা কারো হিম্মত নেই। সত্যকে ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না। সত্যের জয় অবধারিত। জুম্ম জনগণ সত্যের পথে রয়েছে। জুম্ম জনগণ অবশ্যই তাদের সকল দুঃখ-দুর্দশা ও শোকবিহ্বলতা কাটিয়ে উঠবেই।

বলা যায় এই দশকেই বর্তমান জ্বালাও-পোড়াও নীতির বীজ অঙ্কুরোদগম হয়। ১৯৭৯ সালে দেশের তৎকালীন সামরিক সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামকে একদিকে উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়, অন্যদিকে ব্যাপক হারে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনী সেটেলার বাঙালি অনুপবেশ ঘটানো হয়। তখন হেলিকপ্টার যোগে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। তাতে শান্তিকামী জুম্ম জনগণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ঐক্যে ফাটল ধরানোর জন্য লিপলেটে নানারকম উস্কানীমূলক বক্তব্য ছিল। এককথায় পোড়ামাটি নীতির ভিত্তিতে তৎকালীন সামরিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিল। এমতাবস্থায়ও সরকারের শত চাপের মুখে জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে অধিকার আন্দোলন অব্যাহত চালিয়ে এসেছিল। একপর্যায়ে ১৯৮৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সরকারের মধ্যে আনুষ্ঠানিত সংলাপ শুরু হয়। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তরকালে গত ২ জুনে লংগদুর দ্বিতীয় হত্যাকান্ড ঘটলো। এই রকম অনাকাঙ্খিত ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি নাঘটে তার জন্য আসল দোষীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস '৮৯ সালের লংগদু গণহত্যার পরও ছিল। আজকেও লংগদুতে অনুরূপভাবে প্রশাসনের সকল আশ্বাসবাণী মিথ্যায় পর্যবসিত হলো। লংগদুর জুম্মদের অফূরন্ত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হলো এই ফসল তোলা ও বুনার মৌসুমে। তারপরও সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মদের যথাযথ ক্ষতিপূরণদানসহ ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার দ্রুত এগিয়ে আসবেন বলে ক্ষতিগ্রস্ত সহজ-সরল জুম্মদের আন্তরিক প্রত্যাশা রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণেই লংগদু ঘটনার মতো চুক্তি-উত্তর কালে ১৯টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বিধৃত ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে পার্বত্য অধিবাসীর ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গায় পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সকল অস্থায়ী ক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন প্রত্যাহার, আশি দশকে সরকারি উদ্যোগে বসতিপ্রদানকারী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যথাযথ ও সম্মানজনক পুনর্বাসন, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং পার্বত্য পুলিশসহ পার্বত্যাঞ্চলের চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বাস্তবায়িত হলে এ ধরনের ঘটনা ঘটার সুযোগ থাকতো না। সেই সাথে পার্বত্য চুক্তির পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। সরকার হয়তো অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়ে ক্ষয়ক্ষতির কিছুটা পুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু পার্বত্য চুক্তির উল্লেখিত মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত না হলে বারে বারে লংগদু ঘটনার মতো সেনা-পুলিশের ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর ন্যাক্কারজনক সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে।

সাম্প্রতিক লংগদু হামলা প্রসঙ্গে

সজীব চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে এখনও জুম্মদের জানমাল, মানবাধিকার সুরক্ষিত নয়, এখনও যে জুম্মদের উপর হামলা, অগ্নিসংযোগ চলে তা যেন আবার একটু বড় ঝাঁকুনি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলো। সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি, সমস্যার সমাধানের ঘুম পাড়ানির গান আর চুক্তি বাস্তবায়নের মিথ্যাচার যে কত অন্তঃসারশূন্য তা যেন আবার প্রমাণ দিয়ে গেলো। বস্তুত সাম্প্রতিক এই লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলা যেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকার ও রাষ্ট্রের ভালো মানুষী মুখোশ উন্মোচন করে দিলো। রাষ্ট্র বা সেনাবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ইত্যাদি রাষ্ট্রযন্ত্রসমূহ যে প্রায় ক্ষেত্রেই, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী সংবেদনশীল নয়, নিরপেক্ষ নয়, অসাম্প্রদায়িক নয়, সেই চরম ও অপ্রিয় সত্যটি যেন আবার দেখিয়ে দিল এই লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলা।

বর্তমান আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকার প্রায়ই নিজেকে গণতান্ত্রিক, গণমুখী, অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারকবাহক সরকার হিসেবে দাবি করে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের মানুষকে উন্নয়নের অভিযাত্রার কথা ও দেশকে সোনার বাংলায় (আশাকরি কেবল বাঙালি'র দেশের কথা নয়) পরিণত করার স্বপ্নের কথা শুনিয়ে থাকে। কিন্তু দেশে এত গণতন্ত্র আর উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাওয়ার কারণে কিনা সরকার বা রাষ্ট্রযন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের ও জুম্মদের আর্তনাদ ও চিৎকারের শব্দ শুনতে পান না! ভেতর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম যে আবার জ্বলে উঠছে, ধুমরে-মুচড়ে যাচ্ছে, ভূমিধস হচ্ছে তা সত্বেও সরকার যেন কোন মায়াবি অপশক্তির সম্মোহনে সম্বিৎহীন। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি বা সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না বললে তো সরকারের লোকজন, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্বরত সরকারীদলের নেতাকর্মীরা রীতিমত বেজার হন। চুক্তির অন্যতম পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে বারবার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে অচলাবস্থা এবং সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চুক্তির চেতনা বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন প্রকল্প বা পদক্ষেপের বিষয়ে প্রধান-মন্ত্রীসহ সরকারের নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায় আলোচনায় বসা, আবেদন, অনুরোধ, আহ্বান, দাবি জানানো সত্বেও তারা শুনেও না শোনার, জেনেও না জানার ভান করে আছেন। ভাবটা যেন এই–এখানে কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেনি; সবকিছুই তো ঠিক আছে! এটা চরম অবজ্ঞাপূর্ণ ও অহংকারী আচরণ। অপরের প্রতি অসম্মান, তুচ্ছজ্ঞান ও জাত্যভিমান থেকে এ ধরনের নির্বিকার, নিষ্ঠুর আচরণের সৃষ্টি হতে পারে।

আর সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের এই গোষ্ঠীটি সবসময় বলার ও প্রচার করার চেষ্টা করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অধিকাংশই বাস্তবায়িত করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন শান্তি বিরাজ করছে, উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। সেই একই গোষ্ঠী এর সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে এমন প্রচারও চালিয়ে যাচ্ছে যে, জনসংহতি সমিতি বা জুম্মরা বুঝি সবাই চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী হয়ে গেছে, অস্ত্রব্যবসা করছে, বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসী গ্রুপের সাথে যুক্ত হচ্ছে, এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বা বৌদ্ধ বিহারও এখন সন্ত্রাসী হয়ে গেছে, অর্থাৎ অবস্থা এমন যে, জনসংহতি সমিতি ও জুম্মরা এখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। অপরদিকে এর সমান্তরালে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য বা জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে যখন তখন তল্লাশী, বাড়িঘর তছনছ, হুমকী-ধামকি, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে কাউকে আটক-গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলায় জড়িতকরণ, আদালতে হাজিরা দিতে এসে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য কর্তৃক গবাদি পশুপাখির মত ধরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী কর্মকান্ড। জনসংহতি সমিতি ও এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের এত সস্তা ও মামুলি ব্যাপার হয়ে গেছে যে, বাচ্চাদের বা ঘরের কলহ হলেও এখন তাতে জড়িয়ে মামলা করা হচ্ছে। বস্তুত সরকারী দলের সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর দাপটে এবং সেনা-পুলিশের অভিযান, ও হস্তক্ষেপে বান্দরবানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ এলাকার জুম্মদের স্বাভাবিক জীবনও আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মোট কথা সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের এই মহলটি বাইরে এটাই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে যে, সরকার, সরকারী দল ও রাষ্ট্রযন্ত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে (জুম্মদের ভূমি বেদখল, স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ, বহিরাগত অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণসহ) যাকিছু করছে সবই উন্নয়নের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে ইত্যাদি। অপরদিকে জনসংহতি সমিতিসহ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনকারী সকল জুম্ম জনগোষ্ঠী সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ গোষ্ঠী, তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছে, স্বাধীন জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। আর কিছু ভাড়াতে লেখক বা মিডিয়া এই জাতীয় তথ্য, সংবাদ বা লেখা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য সমস্যার প্রকৃত সত্যগুলোকে ঢেকে রেখে মিথ্যা, বানোয়াট, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও কাল্পনিক বিবরণ দাঁড় করিয়ে দেশের ও বিশ্বের মানুষকে ধোঁকা দিতে চাইছে। এটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু গত ২ জুনের লংগদুতে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত বাস্তবতাকে

প্রতারণামূলকভাবে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টায় এক বিরাট আঘাত হেনেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে এখনও জুম্মদের জানমাল, মানবাধিকার সুরক্ষিত নয়, এখনও যে জুম্মদের উপর হামলা, অগ্নিসংযোগ চলে তা যেন আবার একটু বড় ঝাঁকুনি দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলো। সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি, সমস্যার সমাধানের ঘুম পাড়ানির গান আর চুক্তি বাস্তবায়নের মিথ্যাচার যে কত অন্তঃসারশূন্য তা যেন আবার প্রমাণ দিয়ে গেলো। বস্তুত সাম্প্রতিক এই লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলা যেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সরকার ও রাষ্ট্রের ভালো মানুষী মুখোশ উন্মোচন করে দিলো। রাষ্ট্র বা সেনাবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ইত্যাদি রাষ্ট্রযন্ত্রসমূহ যে প্রায় ক্ষেত্রেই, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী সংবেদনশীল নয়, নিরপেক্ষ নয়, অসাম্প্রদায়িক নয়, সেই চরম ও অপ্রিয় সত্যটি যেন আবার দেখিয়ে দিল এই লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলা। উল্লেখ্য যে, এই ঘটনায় আদিবাসী জুম্মদের চারটি গ্রামের দোকানসহ ২২৪ টি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয় ও আরও ৮৮ টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং গুণমালা চাকমা (৭৫) নামের একজন বৃদ্ধ মহিলা নিহত হন। বাড়ি পুড়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও বাড়ির সমস্ত সহায়-সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে যায় হামলাকারী সেটেলার বাঙালিরা।

একটি মহল এই হামলাকে নুরুল ইসলাম নয়নের হত্যাকান্ডের জের হিসেবে তুলে ধরার প্রবণতাটি জোর দিয়ে হামলাটিকে হালকাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। তারা জুম্মদের উপর বর্বরোচিত এই হামলাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেও তুলে ধরার প্রয়াস পান। এমনকি সেদিন লংগদুর জুম্মদের ঘরবাড়ি যখন পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল তখন সকাল ১১:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত মিছিলে কেবল নয়নের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান নয়, অপ্রাসঙ্গিকভাবে উস্কানিমূলক ও বিভ্রান্তিকর শ্লোগানও দেয়া হচ্ছিল, কিন্তু জুম্মদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগকারীদের ব্যাপারে টু শব্দটি ছিল না। উল্লেখ্য যে, নয়ন হত্যাকান্ড তুচ্ছ বা ক্ষমাযোগ্য কোন অপরাধ নয়। অবশ্যই প্রকৃত হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে ঘটনার যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দায়িত্ব। বস্তুত নয়ন হত্যাকান্ডটিই একই সময়ে বিচ্ছিন্ন ও সাধারণ ঘটনা। বিচ্ছিন্ন এই অর্থে যে কে বা কারা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিগত কারণে নয়নকে হত্যা করেছে। আর সাধারণ এই অর্থে যে, দেশের বা এলাকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সাধারণ বাস্তবতার কারণে দেশে প্রতিদিন এধরনের হত্যাকান্ড অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু নয়ন হত্যাকান্ডের অজুহাতে প্রকাশ্য দিবালোকে সেনা-পুলিশের সহায়তায় সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক একজন বৃদ্ধাকে হত্যাসহ শত শত জুম্ম ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করা কোনভাবে যুক্তিসঙ্গত, গ্রহণযোগ্য বা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনার সাথে তুলনীয় হতে পারে না। এটি যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যার সাথেই তুলনীয় হতে পারে। দেশে তো প্রতিদিন কেউ না কেউ খুনের শিকার হচ্ছে। কিন্তু সেই খুনের অজুহাতে তো কোন জনগোষ্ঠীর বা এলাকার শত শত বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে না? সমতলে এ ধরনের ঘটনা হলে সরকারই টিকে থাকতে পারতো কিনা সন্দেহ! কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামেই তা সম্ভব হচ্ছে।

অপরদিকে, লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলা নিঃসন্দেহে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত। কিন্তু এটি কোনভাবে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও হঠাৎ দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা নয়। বরং এটি একটি পরিকল্পিত এবং ধারাবাহিক হিংসাত্মক জুম্ম বিরোধী নীলনকশারই অংশমাত্র। কারণ শুরু থেকে শেষ অবধি ঘটনার যে বিবরণ ও ধারাবাহিকতা তাতে এটাকে সুপরিকল্পিত না বলে উপায় থাকে না। সরকারী দলের অনেক নেতাকর্মী ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। যেন এটা আচমকাই ঘটেছে। তাদের কেউই তা জানতেন না। অথচ স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর যোগসাজশে রাঙ্গামাটি ও লংগদু'র সরকারী দলের নেতাকর্মীরাই এই ঘটনায় নির্দেশক ও পরিচালকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। আর প্রযোজকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তো তারাই যারা এযাবত একটি তুচ্ছ বা বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে পুঁজি করে সাম্প্রদায়িকতার মহাযজ্ঞ আয়োজন করেন, আদিবাসী জুম্মদের জানে-মালে-ভিটে-মাটিতে বিনাশে মেতে থাকেন। যারা প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের কাজ করে থাকেন। বস্তুত এই সকল কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলোই বিচ্ছিন্ন নয়ন হত্যার ঘটনাকে পুঁজি করে ঠান্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে জুম্মদের উপর এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়েছে। পরিকল্পিত হামলা ছিল বলেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকা সত্বেও সেনা ও পুলিশ বাহিনী হামলা প্রতিরোধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। বলা যেতে পারে, বস্তুত তাদের সামনেই, তাদের মদদেই বা তাদের ইশারায় এই হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটানো হয়। সম্প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনেও 'স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চাইলে রাঙ্গামাটির লংগদুতে পাহাড়ি গ্রামে হামলা ঠেকাতে পারত। তাদের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই এই হামলা ঘটে।' (প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০১৭) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

লংগদু এমনিতেই ক্ষতবিক্ষত এক জুম্ম জনপদ। লংগদু হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম জুম্ম জনপদ, যে মানুষরা বারবার শাসকগোষ্ঠীর কখনো উন্নয়ন আগ্রাসনের কখনো রাজনৈতিক আক্রোশের চরম শিকার হয়েছেন। পাকিস্তান আমলের ১৯৬০ দশকের উন্নয়ন প্রকল্প কাপ্তাই বাঁধের অন্যতম অসহায় শিকার হয়েছেন তারা। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ১৫টির অধিক বর্বরোচিত গণহত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম দুটি ঘটেছে এই লংগদুতে। এর মধ্যে ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালি ও ভিডিপি কর্তৃক লংগদু সদরসহ সদরের সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে অন্যতম বর্বরোচিত হত্যাকান্ড ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা যা লংগদু গণহত্যাকান্ড হিসেবেই পরিচিত। সেই লংগদু গণহত্যাকান্ডে নারী-শিশুসহ ৩২ জন জুম্ম নিহত এবং ১১ জন জুম্ম আহত হয়েছিলেন এবং সেদিন লংগদু সদরসহ লংগদুর আশেপাশের ৯টি গ্রামের ১০১১টি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয়া হয়। অপরদিকে আরেকটি গণহত্যাকান্ড হল ১৯৯২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি সেটেলার বাঙালি ও ভিডিপি কর্তৃক সংঘটিত বাঘাইছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী লংগদুর মাল্যা হত্যাকান্ড। এ ঘটনায় ১৪ জুম্মকে নৃশংসভাবে হত্যা করা করা। এছাড়াও পার্বত্য চুক্তি

স্বাক্ষরের পরও সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক ২০১১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি লংগদু বগাচদর এলাকায় জুম্মদের ২১টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়াসহ একাধিক জুম্ম বসতিতে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে।

একদা লংগদুর মূল ও আদি জনগোষ্ঠী জুম্মরাই আজকে লংগদুর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, উপজেলার মোট ৮৫,৫৮০ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৭-১৮ হাজারের মত জুম্ম জনগোষ্ঠী। অর্থাৎ সেই হিসাবে উপজেলার মাত্র এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে জুম্ম জনগোষ্ঠীর মানুষ। ২০১৭ সালের আজকের দিনটি পর্যন্ত অনেকের হিসাবে লংগদুর সেটেলার বাঙালিদের সংখ্যা লক্ষাধিক। মূল অধিবাসীদের নিজ আবাসভূমিতে পরবাসীতে পরিণত হওয়ার জীবন্ত এক দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার আগেও লংগদুতে মুসলিম-হিন্দু মিলে বাঙালি পরিবার ছিল একেবারে হাতেগোনা। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে কিছু পরিবার আসে ব্যবসায়িক ও পেশাগত কারণে। লংগদুর বয়োজ্যেষ্ঠদের বিবরণ অনুযায়ী, মাত্র ১৯৭৯ সালের আগ পর্যন্ত লংগদু সদরের আশেপাশে কয়েকটি এলাকায় একশ' পরিবারের মত বাঙালি পরিবার ছিল। যাদের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ মুসলিম, বাকীরা হিন্দু পরিবার। এদের সাথে জুম্মদের কোন সমস্যাই ছিল না, আজো নেই। কিন্তু ১৯৭৯-৮০ সালের পর সৃষ্টি হয় বিপর্যয়, সরকার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট বিপর্যয়। ১৯৭৯ সালের দিকে সশস্ত্র সংঘাতের জের ধরে জুম্মদেরকে স্বভূমি থেকে উৎখাত করে জায়গা-জমি বেদখলের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী জ্বালিয়ে দিতে থাকে নিরীহ-নিরস্ত্র জুম্মদের একের পর এক গ্রাম। হাজার হাজার জুম্ম প্রাণ বাঁচাতে বাড়িঘর-গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর জুম্মদের সেসব বাস্তুভিটায় ও জমিতে বসিয়ে দেয়া হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে আনা হাজার হাজার বাঙালি পরিবারকে। যাদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ কেউ কোন কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ছিলেন না। সেসময় লংগদু উপজেলার (বর্তমান হিসাব অনুযায়ী) সাতটি ইউনিয়নের–গুলশাখালি, বগাচতর, ভাসন্যা আদাম, কালাপাগোজ্যা– এই চারটি ইউনিয়ন প্রায় সম্পূর্ণ জুম্মশূন্য করে সেখানে বহিরাগত সেটেলার বাঙালিদের বসিয়ে দেয়া হয়। বাকী লংগদু সদর, মাইনী ও আটরকছড়া ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য অংশেও একই কায়দায় সেটেলার বাঙালিদের বসিয়ে দেয়া হয়। আজকে এই সেটেলার বাঙালিরাই সেনা-পুলিশ ইত্যাদি রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তা নিয়ে অথবা সেনা-পুলিশ ও কায়েমী স্বার্থবাদীরাই সেটেলার বাঙালিদের ব্যবহার করে জুম্মদের উপর হামলা চালিয়ে আসছে। ধারণা করা যেতে পারে, জুম্মদের অবশিষ্ট বসতিগুলো জুম্মশূন্য করে বেদখল করার হীন উদ্দেশ্যেও এই হামলা চালানো হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৬০ দশকের কাপ্তাই বাঁধের কথা বাদ, ১৯৭৯-৮০ ও ১৯৮৯ সালের ঘটনার ফলে সৃষ্ট ক্ষত এখনও শুকোয়নি। এখনও সেই দগদগে ঘা এর চিহ্ন বিদ্যমান। সেই ঘটনার শিকার হয়ে বাস্তুচ্যুত হওয়া জুম্মদের বিরাট অংশই এখনও নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে পারেনি। অনেক পরিবারের চেহারা চিরতরে বদলে গেছে। অনেক মানুষের জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে। বরকল ও বাঘাইছড়ির প্রত্যন্ত এলাকায় গেলে দেখা মেলে এখনও সেই ঘটনার শিকার মানুষরা মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। বস্তুত লংগদুর হাজার হাজার জুম্ম পরিবার এখনও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। চুক্তি স্বাক্ষরের ১৯ বছরেও ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়ায় তারা তাদের ভূমি ফেরত পায়নি এবং চুক্তি অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজটি বন্ধ থাকায় পুনর্বাসনের কোন সুবিধাও তারা লাভ করেনি।

বলাবাহুল্য এই লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলা বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেমনি নয়, তেমনি একমাত্র ঘটনাও নয়। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পরও এ পর্যন্ত অন্তত ২০টি সেটেলার-সেনা-পুলিশ কর্তৃক এজাতীয় বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেকটি ঘটনাই একতরফাভাবে পাহাড়িদের উপর হামলা করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনায়ই নিরাপত্তা বাহিনী সুস্পষ্টভাবে পক্ষপাতমূলক ভূমিকা পালন করেছে। এসমস্ত সাম্প্রদায়িক হামলায় জুম্মদের অন্তত ১৬০০ বাড়ি লুটপাটসহ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, হত্যার শিকার হয়েছেন ১২ জন, আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৪৮৮ জন এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ১৬ জন জুম্ম নারী। সবচেয়ে উদ্বেগজনক, লজ্জাজনক ও পরিহাসের ব্যাপার হল, এই সকল হামলার কোনটিরই বিচার নিশ্চিত হয়নি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করা হয়নি। এমনকি সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনকালে এ ব্যাপারে ক্ষমা চাইতে বা অনুশোচনা করতে দেখা যায়নি এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিতেও দেখা যায়নি। উল্টো অনেক সময় প্রশাসন কর্তৃক অপরাধীদের পক্ষ অবলম্বন করতে দেখা যায়। তার অন্যতম উদাহরণ হলো, ২০১১ সালের বগাচদর অগ্নিসংযোগ মামলায় অভিযুক্তরা জামিনে ছাড়া পেয়েছে। উল্টো এখন অভিযুক্তরা বাদীকে হুমকি দিয়ে চলেছে। এমনকি সমঝোতা করার জন্য প্রশাসন থেকে নানাভাবে বাদীকে চাপ দেয়া হচ্ছে।

এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এ জাতীয় হামলা বা অপরাধের যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা একটি গণতান্ত্রিক, গণমুখী ও অসাম্প্রদায়িক সরকার ও রাষ্ট্রের কর্তব্য হওয়া উচিত। এ দায়িত্ব সরকার ও রাষ্ট্র কখনো এড়িয়ে যেতে পারে না। বারবার এধরনের জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হওয়া সত্বেও সরকার বা রাষ্ট্র এবাপারে দায়িত্ব এড়িয়ে যায় বলেই পুনঃপুন এধরনের হামলা সংঘটিত হয়ে চলেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রও এধরনের অপরাধে সম্পৃক্ত হতে সাহস পেয়ে আসছে। লংগদু হামলার পর পুলিশের পক্ষ থেকে এসআই দুলাল হোসেন কর্তৃক একটি পুলিশী মামলা এবং হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে চারটি মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত চারটি মামলার মধ্যে কিশোর চাকমা কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহারটিই কেবল থানায় মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে মো: মাহবুব মিয়া (৫৫) নামে লংগদুর ২৪নং মাইনীমুখ ইউনিয়নের মুসলিম ব্লকের জনৈক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৪৪ জন জুম্ম গ্রামবাসীর নাম উল্লেখ পূর্বক ১৫০ জন পাহাড়ির বিরুদ্ধে মোটর সাইকেল চালক নুরুল ইসলাম নয়নকে অপহরণ ও গুম করার পর হত্যা, চাঁদাবাজি

বাকী অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিকল্প নেই

নীলোৎপল খীসা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম বিধান হচ্ছে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা"। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার বদলে শাসকগোষ্ঠী বরং এই বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করতে নানান ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংক্রান্ত ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "প্রজাতন্ত্র হইবে এমন একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে, এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।" জুম্ম জনগণের বেলায় শাসকগোষ্ঠী সংবিধানের এই অংশে বিধৃত অধিকারের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করে আসছে। জুম্ম জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা, তাদের মর্যাদা ও মূল্য, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ ইত্যাদি নানাভাবে পদদলিত হয়ে চলেছে। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণ ও স্থায়ী বাঙালি জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় তাদের সেই অধিকার নানাভাবে ভূলুণ্ঠিত হতে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম বিধান হচ্ছে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করিয়া এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা"। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করার বদলে শাসকগোষ্ঠী বরং এই বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করতে নানান ষড়যন্ত্র চালিয়ে আসছে। বস্তুত এতদাঞ্চলের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিষয়টি কেবল কাগজে-কলমে স্বীকার করলে হবে না। তার জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে পার্বত্য অধিবাসীর ভূমি অধিকার নিশ্চিতকরণ, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গায় পুনর্বাসন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সকল অস্থায়ী ক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন প্রত্যাহার, আশি দশকে সরকারি উদ্যোগে বসতিপ্রদানকারী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে যথাযথ ও সম্মানজনক পুনর্বাসন, স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও পার্বত্যাঞ্চলের চাকরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। পার্বত্য চুক্তির এসব মৌলিক বিষয়গুলো যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা কখনোই সম্ভব হতে পারে না।

বলাবাহুল্য, আদিবাসী জুম্মদের জায়গা-জমি প্রতিনিয়ত বেদখল হচ্ছে। বিভিন্ন কায়দা-কৌশল অবলম্বন করে জুম্মদের জায়গা-জমি কেড়ে নেয়া হয়। প্রথমত সরকারিভাবে, দ্বিতীয়ত সেটেলার বাঙালিদের মাধ্যমে সরকারের প্রত্যক্ষ ইন্দন ও সহযোগিতায়, তৃতীয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী নয় এমন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে জমি লীজ প্রদানের মাধ্যমে জুম্মদের জমি বেদখল হয়ে থাকে। নানান কায়দায় ও কৌশলে সরকার আদিবাসী জুম্মদের জমি বেদখল করে থাকে। যেমন কখনও উন্নয়নের দোহাই দিয়ে, কখনও পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করার নামে, কখনও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার নামে, কখনও নতুন নতুন ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে, কখনও সেটেলার বাঙালিদের গুচ্ছগ্রাম ও নতুন বসতি সম্প্রসারণের নামে। সেটেলার বাঙালিরা সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় প্রতিনিয়ত জুম্মদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি, সামাজিক মালিকানা জমি, এমনকি শশ্মানের জমি পর্যন্ত তারা বেদখল করে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। জুম্মরা যদি বাধা দেয় তাহলে বাঙালি সেটেলার সাম্প্রদায়িকতার ধোঁয়া তুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধায়। জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ও ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। এভাবে সাম্প্রদায়িক হামলার মাধ্যমে জুম্মদের হত্যা করা, তাদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করা, তাদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে সর্বস্ব-হারা করা, তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সেটেলাররা শক্তিশালী কারণ তারা সরকারের আর্শীবাদপুষ্ট। আদিবাসী জুম্মরা দুর্বল কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র নিরপেক্ষ নয়। নিলজ্জভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র সেটেলারদের পক্ষাবলম্বন করে। জুম্মদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার নেই, তারা মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। জুম্ম নারীরা এই পরিস্থিতির শিকার হয় সবচেয়ে বেশি। জুম্মরা যদি এভাবে ষড়যন্ত্রমূলক পরিস্থিতির শিকার হতে থাকে, স্বভূমি থেকে উৎখাত হতে থাকে, তাহলে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল' থাকবে কিভাবে? বস্তুত প্রতীয়মান হয় যে, সরকারের নীতি হচ্ছে জুম্ম জনগণকে স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ করা, বিতাড়ন করা এবং তাদের জাতিগতভাবে নির্মূল করা। তাহলে জুম্ম জনগণ যাবে কোথায়?

এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসন; সেটেলারদের গুচ্ছগ্রাম সম্প্রসারণ; জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক

হামলা; বহিরাগতদের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণ; ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদান; চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান; ভূমি বেদখল; বহিরাগতদের নিকট ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা প্রদান; জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে নতুন করে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটানো; তথাকথিত 'সমঅধিকার আন্দোলন' গঠনের মাধ্যমে সেটেলার বাঙালিদের সংগঠিত করে পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা, ভূমি জরিপের মাধ্যমে সেটেলার কর্তৃক জবরদখলকৃত ভূমি বৈধতা প্রদানের পাঁয়তারা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলছে। পূর্ববর্তী সরকারের মতো আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা অব্যাহত রয়েছে। এ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে ১০টি সাম্প্রদায়িক হামলাসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর সময়ে অন্তত: ২০টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। সর্বশেষ ২ জুন ২০১৭ লংগদুতে সেনা-পুলিশের সহযোগিতায় ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীগ-যুবলীগের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা এবং ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। এই হামলায় একজন অশীতিপর বৃদ্ধা নিহতসহ ২২৪টি ঘরবাড়ি ও দোকান সম্পূর্ণ ভস্মিভূত এবং ৮৮টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে, আদিবাসী জুম্মরা স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ তাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার না থাকা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুই দশক অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতিই কেবল মিলেছে, চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। ফলত ভয়, আতঙ্ক, নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জন্ম নিচ্ছে ক্ষোভ, সন্তোষ, প্রতিরোধের চেতনা। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয় যে, যেখানে নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণ, বঞ্চনা থাকবে, সেখানে আত্মপ্রত্যয়ী কঠোর ও কঠিন সংগ্রামের জন্ম নেবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি একটি গণদলিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিব পরিষদ এবং রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এ তিন জেলার পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অংশ। এসব প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সরকার গণদাবিকে অগ্রাহ্য করে এসব প্রতিষ্ঠানসমূহকে চুক্তি মোতাবেক পরিচলনা করছে না। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি মোতাবেক সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠনযোগ্য জনপ্রতিনিধিত্বশীল শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রম পরিচালনার পরিবর্তে সরকার দলীয় নেতা-কর্মীদেরকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে নিয়োগ দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে এসব শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে আসছে যারা সত্যিকার অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না, যাদের সাথে জনগণের কোন সংযোগ নেই। এজন্যই পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ পরিণত করা হয়েছে সরকার কর্তৃক মনোনীত কিছু লোকের পুনর্বাসন কেন্দ্র। চুক্তি বাস্তবায়নে তারা অত্যন্ত নির্লিপ্ত। পক্ষান্তরে তাদের বিরুদ্ধে ঘুষ, দুর্নীতিসহ নানান ধরনের অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। ফলত সরকার পার্বত্য গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, "সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে কোন বিরুপ ফল হইতে পারে এইরূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবেন।" পার্বত্যাঞ্চলের পাহাড়ি অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য এই বিধানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ অধিকারের প্রতি সরকারের তেমন কোন শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি নেই। পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধনের কথা রয়েছে, এ অধিকার সরকার পদদলিত করে চলেছে। আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও জেলা প্রশাসন তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি প্রশাসন, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে চলেছে। প্রশাসনিক ক্ষমতা যেসব প্রতিষ্ঠানের থাকার কথা, কার্যত সেসব আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের হাতে নেই। এজন্য এখানে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার।

দেশের মধ্যে অন্যতম অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের বঞ্চনা, নিপীড়ন ও অনিশ্চয়তা-র মধ্য রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটনা কখনোই সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়নের মধ্যেই এতদাঞ্চলসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিহিত রয়েছে। বর্তমান সরকার হরহামেশাই পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফিরিস্তি তুলে ধরে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতেও "পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা, এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা এবং সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করার" বিধান রয়েছে। কিন্তু কেবল উন্নয়নের মাধ্যমে একটা অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও অধিকার নিশ্চিত করা যায় না। সেই অঞ্চলের জনগণের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা, তাদের মর্যাদা ও মূল্য, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে সেই উন্নয়ন টেকসই হতে পারে না। বরঞ্চ সেই উন্নয়ন এতদাঞ্চলের মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের জন্য আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাসহ চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে সরকার রাজনৈতিক দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে আসবে সেটাই পার্বত্যবাসী প্রত্যাশা করে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ গ্রেফতার, বিচার-বহির্ভূত নির্যাতন ও হত্যাঃ
শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে জুম্মদের জনজীবন

সম্প্রতি বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতীত জামিনে থাকা জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে গোয়েন্দা ও সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক অবৈধভাবে আটক করে বান্দরবান সেনা জোনে নিয়ে মারধর ও মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণের ঘটনা একের পর এক ঘটে চলেছে। এভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটিয়ে জুম্মদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো নিম্নরূপ-

১। গত ১৪ জুলাই ২০১৭ দিবাগত রাত আনুমানিক ৩:৩০ টার দিকে বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় রুমা সেনা গ্যারিসনের ২৯ বেঙ্গলের কম্যান্ডার লে: কর্ণেল আতিকুর রহমান ও মেজর মেহেদির নেতৃত্বে সেনা ও পুলিশের একটি দল জনসংহতি সমিতির রুমা থানা কমিটির সদস্য ও রুমা সদর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য শৈহ্লাপ্রু মারমাকে (৫০) রুমা বাজারের ইডেনপাড়া রোড়ের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

২। গত ৩ জুলাই ২০১৭, দুপুর ১২:০০ টার দিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়ন কমিটি'র সাংগঠনিক সম্পাদক রাঙ্গোলাল তঞ্চঙ্গ্যা (৪৭) বান্দরবান জেলা সদরস্থ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন একটি সাজানো মামলায় যথারীতি আদালতে হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় দুপুর আনুমানিক ১২:৩০ টার দিকে বান্দরবান ডিসি অফিসের পশ্চিম দিক থেকে সাদা পোশাক পরিহিত গোয়েন্দা বিভাগের তিনজন লোক রাঙ্গোলাল তঞ্চঙ্গ্যাকে জোরপূর্বক আটক করে মোটর সাইকেলে তুলে নিয়ে যায়। এছাড়া সেদিন সকাল ১১ টার দিকে বান্দরবানের বালাঘাটা যাত্রীছাউনি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির সদস্য রিপন তঞ্চঙ্গ্যাকে (২৫) সাদা পোষাকধারী নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ধরে নিয়ে যায়। রাঙ্গোলাল ও রিপনকে বান্দরবান সেনা জোনে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করার পর মিথ্যা মামলায় জড়িত করে বিকাল ৫ টার দিকে বান্দরবান থানায় সোপর্দ করে।

৩। গত ১২ জুন ২০১৭ সাল বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরের ওয়াগই পাড়ার বাসিন্দা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অনিল তঞ্চঙ্গ্যার (৩৫) বান্দরবানের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে নিয়মিত হাজিরা দিতে আসলে হাজিরা দেয়ার পূর্বে কোর্ট বারান্দা থেকে বেলা ১:৩০ টার দিকে তিনজন ডিজিএফআই/এফআইইউ সদস্য তাকে ধরে বান্দরবান সদর জোনে নিয়ে যায়। জোনে সেনাসদস্যরা অনিল তঞ্চঙ্গ্যাকে অমানুষিকভাবে মারধর করে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় বিকাল ৫:০০ টার দিকে বান্দরবান সদর থানায় সোপর্দ করে। এ সময় পুলিশ অনিল তঞ্চঙ্গ্যাকে ২০১৬ সালের ১৫ জুন তারিখে দায়েরকৃত সাজানো অপহরণ মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামী হিসেবে দেখিয়ে জেলে প্রেরণ করে।

৪। ১৮ মার্চ ২০১৭ সকাল আনুমানিক ৬:৩০ টার দিকে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক-আমতলি সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য টংকাবতী ইউনিয়নের টংকাবতী চাকমা পুনর্বাসন পাড়ার বাসিন্দা ও জনসংহতি সমিতির টংকাবতী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য বিপ্লব চাকমা (৩৩) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির টংকাবতী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য অমর চাকমাকে (৩২) আটক করে নিয়ে গেছে। আটককৃতরা সেসময় বাড়ি থেকে বের হয়ে স্ব স্ব জমিতে কাজে যাচ্ছিল। তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা বা কোন ওয়ারেন্টও ছিল না।

জামিনে থাকা ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ লোকজনদেরকে এভাবে অবৈধভাবে ধরে নিয়ে বিচার-বহির্ভূত শারীরিক নির্যাতন এবং মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণের ঘটনা সরাসরি সংবিধানের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের সামিল বলে বিবেচনা করা যায়। এধরনের ঘটনা কখনোই আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিচায়ক বহন করে না।

উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সেনা অভিযানের নামে সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা-বিজিবি ও ক্ষমতাশালী স্থানীয় মহল কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সহযোগী সংগঠনের সদস্য ও সমর্থকসহ সাধারণ জুম্ম গ্রামবাসীর উপর নিপীড়ন-নির্যাতন সীমাহীন মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সেনা-বিজিবি-পুলিশ কর্তৃক জনসংহতি সমিতির অফিস তল্লাশী ও ভাঙচুর, সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের ও গ্রেফতার, তাদের ঘরবাড়ি তল্লাসী ও তছনছ, জনসংহতি সমিতি ও সমিতির সহযোগী সংগঠনের সদস্যদের তালিকা ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করা ইত্যাদি তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ ১৫০ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মামলা দায়ের, নিরীহ গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্য-সমর্থক ৫০ জনকে গ্রেফতার, শতাধিক ব্যক্তিকে সাময়িক আটক ও ক্যাম্পে নিয়ে মারধর এবং বান্দরবানে জনসংহতি সমিতির প্রায় দেড় শতাধিক সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২০১৬ সালের জুন মাস থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা ও কে এস মং মারমা, রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমা, নোয়াপতং ইউনিয়ন

পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান অংথোয়াইচিং মারমা ও সাবেক চেয়ারম্যান শম্ভু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা, বান্দবান সদর উপজেলার ৩৪৭নং মুরুংক্ষ্যং মৌজার হেডম্যান মংপু মারমা প্রমুখ জনপ্রতিনিধি ও প্রথাগত নেতৃবৃন্দ এলাকাছাড়া অবস্থায় রয়েছেন।

গত ১৯ এপ্রিল ২০১৭ সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত ও নির্যাতনের শিকার এইচএসসি পরীক্ষার্থী রমেল চাকমা চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে গত ৫ এপ্রিল রাঙ্গামাটি সেনা রিজিয়নের জি-২ সৈয়দ তানভীর সালেহ-এর নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচর বাজার থেকে গ্রেফতার করে। পরীক্ষা না থাকায় সেদিন রমেল চাকমা নানিয়ারচর বাজার থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করে বাসায় ফিরছিল। অভিযোগ করা হয় যে, তাঁকে ধরার পর নানিয়ারচর সেনা জোনে নিয়ে বেদম মারধর করা হয়। অমানুষিক নির্যাতনের ফলে রমেল চাকমা গুরুতর আহত হয় বলে অভিযোগ উঠে। মুমুর্ষ অবস্থায় রমেল চাকমাকে সেনা সদস্যরা নানিয়ারচর থানায় সোপর্দ করতে চাইলে পুলিশ গ্রহণ করেনি বলে জানা যায়। পরে সেনা সদস্যরা তাকে নানিয়ারচর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করায়। কিন্তু রমেল চাকমার শারীরিক অবস্থায় অবনতি হলে তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

রমেল চাকমার মৃত্যুর খরব ছড়িয়ে পড়ার পর রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে গর্জে উঠে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সেনাবাহিনী জুম্ম ছাত্র-জনতার এই ক্ষোভের আগুনে আবার ঘি ঢেলে দেয়, রমেল চাকমার লাশ তার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হস্তান্তর করার পর তাদের কাছ থেকে লাশটি বুড়িঘাট ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা কেড়ে নিয়ে। তারপর দিন রমেল চাকমার মা-বাবা ও নিকট আত্মীয় ছাড়া এবং পেট্রোল ও কেরোসিন ঢেলে দিয়ে যথাযথ ধর্মীয় আচার ব্যতীত সেনা, পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃক রমেল চাকমার লাশ দাহ করলে জনমনে আরো জোরালো ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। প্রথা ও ধর্মীয় বিধান অনুসারে লাশটি দাহ করতে না দেয়ায় আপামর জুম্ম ছাত্র-জনতা ধিক্কার জানাতে থাকে।

২৩ এপ্রিল ২০১৭ দৈনিক মানবকণ্ঠ 'হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাঙ্গামাটি: আজ জেলায় সকাল-সন্ধ্যা সড়ক নৌপথ অবরোধ' শীর্ষক সংবাদে উল্লেখ করে যে, "পুলিশ বলছে, সব ঠিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা হয়েছে। এজন্য পুলিশ দায়ী নয়। পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সৃষ্টি করা পরিবেশ। এখন পুলিশকে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মাঝেও মোকাবিলা করতে হচ্ছে। রাঙ্গামাটি পুলিশ সুপার সাঈদ তারিকুল হাসান মানবকণ্ঠকে বলেন, অপরাধীকে ধরা হলো ভালো কথা। কিন্তু তার জন্য তো আইন আছে। সে অনুযায়ী তার বিচার হবে। কিন্তু তাকে নির্যাতন করে পুলিশের কাছে আনা হলো। তার শারীরিক অবস্থা দেখে পুলিশ তাকে গ্রহণ করেনি। পরে সে মারা গেল। মৃত ব্যক্তির লাশ নিয়েও টানাটানি। এখন দায় চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে পুলিশের ওপর। মানুষ মরেছে অবরোধ হবে স্বাভাবিক। এখানে মারপিট করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করা হলো। ফলে পরিবহন ধর্মঘট যোগ হয়েছে। এখন পুলিশকে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে এসব মোকাবিলা করতে হচ্ছে। যা হয়েছে এখানে পুলিশের কোনো হাত নেই। যদি আমাদের দায়ী করা হয় তাহলে তদন্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হোক। অন্যায়কে পুলিশ কখনো প্রশ্রয় দেবে না।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অনলাইন ও ছাপানো পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অপপ্রচার জোরদার করা হয়েছে, অন্যদিকে জুম্মদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতনের সংবাদ এবং আন্দোলনরত সংগঠন ও কর্মীদের আহুত জনসভা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ, নানা কর্মসূচির সংবাদ প্রকাশের উপর শাসকশ্রেণির প্রভাবশালী মহল থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে। ফলে নিপীড়ন-নির্যাতন এবং আন্দোলনরত সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচির সংবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় না।

তারই অংশ হিসেবে জনসংহতি সমিতির সদস্যসহ আন্দোলনরত অধিকার কর্মীদেরকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার, মিথ্যা মামলা দায়ের ও জেলে প্রেরণ, অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন, হত্যা, রাজনৈতিক হয়রানি ইত্যাদিও সমান তালে অব্যাহতভাবে চলছে। যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো ৩১ মার্চ ২০১৭ জনসংহতি সমিতির কাপ্তাইয়ের রাইখালীর সভাপতি ও রাইখালী ইউপি মেম্বার থোয়াই শৈনু মারমা এবং তাঁর ছেলে পিসিপির সদস্য ক্যহিংহ্লা মারমাকে বিজিবি কর্তৃক বিস্ফোরক দ্রব্য গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার, অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন ও জেলে প্রেরণ। নান্যাচরে এইচএসসি পরীক্ষার্থী উঠতি বয়সী রমেল চাকমার হত্যার ঘটনা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একই কায়দায় মাটিরাঙ্গা সেনা জোন কর্তৃক গত ১০ আগস্ট ২০১৪ সালে হত্যা করা হয় জনসংহতি সমিতির সদস্য তিমির বরণ চাকমা ডুরানকে। রমেল চাকমার মতো ১৮ বছরের উঠতি বয়সী উচ্চ মাধ্যমিকের নিরীহ ছাত্র জিম্পু চাকমাকে হত্যা করা হয় মাটিরাঙ্গা সেনা জোনে ২০০৪ সালের ২৩ আগস্ট এবং তাকেও সেনা-পুলিশের উপস্থিতিতে দাহ করতে তার মা-বাবাকে বাধ্য করা হয়। তারও অনেক আগে ৫ মার্চ ২০০০ সালে পার্বত্য চুক্তি অনুসারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির সদস্য মংসাথোয়াই মারমা বিশ্বকে গুইমারা সেনা জোনে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। ১৯৯৬ সালে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমাকে অপহরণ এবং চিরদিনের জন্য গুম করার মতো আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত ঘটনা এখানে উচ্চারণ করা বাহুল্য বৈ কিছু নয়।

অন্যদিকে কতেক ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়া হয় না আন্দোলনরত সংগঠনের জনসভা, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভাবেশ, আন্দোলনের কর্মসূচি আয়োজন। গত ২ ডিসেম্বর ২০১৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বান্দরবানের রাজার মাঠে নাগরিক সমাজের আহুত গণসমাবেশের অনুমতি প্রদান করেনি বান্দরবান জেলা প্রশাসন। গত ২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৬ খাগড়াছড়ি জেলার সিন্দুকছড়ি সাব-জোনের সেনারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ১৯তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে টানানো পোস্টার ছেড়ে ফেলে এবং পোস্টারিং-এর কাজে নিয়োজিত কর্মীদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে

বাকী অংশ ৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

লংগদুতে জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও সাম্প্রদায়িক হামলাঃ

শাসক দল ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাম্প্রদায়িক মুখোশ আরেকবার উন্মোচিত

গত ২ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলা সদরের তিনটিলা এবং পার্শ্ববর্তী মানিকজোড়ছড়া ও বাত্যা পাড়ায় সেনা-পুলিশের ছত্রছায়ায় ক্ষমতাসীন স্থানীয় আওয়ামীলীগ-যুবলীগের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটসহ সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। এই হামলার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ-যুবলীগসহ জাতীয় রাজনৈতিক দল, সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাম্প্রদায়িক মুখোশ আরেকবার উন্মোচিত হয়েছে। লংগদু সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার লে: কর্ণেল আবদুল আলিম চৌধুরী পিএসসি, টুআইসি মেজর রফিক ও সুবেদার মেজর মো: রফিক এবং লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনা-পুলিশের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সেটেলার বাঙালিরা পেট্রোল দিয়ে জুম্মদের ঘরবাড়িতে অবাধে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালিয়েছে। জুম্মরা অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হামলাকারী সেটেলার বাঙালিদেরকে প্রতিরোধে এগিয়ে আসলে সেনাবাহিনী প্রতিরোধকারী জুম্মদের ধাওয়া করে। এমনকি প্রতিরোধকারী জুম্মদের ছত্রভঙ্গ করতে সেনা সদস্যরা ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে বলেও প্রত্যক্ষদর্শী জুম্ম গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছে। অথচ তাদের উপস্থিতিতে কেরোসিন-পেট্রোল ঢেলে জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটকারী সেটেলার বাঙালিদেরকে সেনা-পুলিশ সদস্যরা কোন বাধা প্রদান করেনি, গুলি বা টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে হামলাকারী সেটেলারদের ছত্রভঙ্গ করা তো আরো অনেক দূরের ব্যাপার। এমনকি ঘটনার পরও এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে বা অন্যখাতে প্রবাহিত করতে লংগদু সেনা জোনের নানা ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারের কোন ঘাটতি ছিল না। লংগদুতে এই সাম্প্রদায়িক হামলায় লংগদু সদরের তিনটিলা এলাকায় ১১২টি ঘরাবাড়ি, মানিকজোড়ছড়ায় ৮১টি ঘরবাড়ি, বাত্যা পাড়ায় ২৪টি ঘরাবাড়ি এবং সোনাই গ্রামে ১টিসহ সর্বমোট ২১৮টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মিভূত এবং আরো ৮৮টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনটিলা এলাকায় গুণমালা চাকমা নামে ৭৫ বছরের এক অশীতিপর বৃদ্ধ পালিয়ে যেতে না পারার কারণে ঘরের মধ্যে আগুনে পুড়ে মারা গেছে এবং হামলাকারীদের মারধরের শিকার হন তিন জুম্ম গ্রামবাসী। সেটেলার বাঙালিরা ঘরবাড়ি ও দোকানের মূল্যবান জিনিষপত্র ও মালামাল, গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী লুট করে নিয়ে যায় এবং শুকরগুলো মেরে ফেলে দিয়ে যায়। পুড়ে যাওয়া তিনটিলা, মানিকজোড়ছড়া ও বাত্যা পাড়ার প্রায় ৩০০ পরিবার কেউই কোন সহায় সম্পত্তি রক্ষা করতে পারেনি এবং এক কাপড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে কোন রকমে জীবন রক্ষা করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের তালিকা অনুযায়ী যার ক্ষয়ক্ষতির

লংগদু অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় একনজরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

গ্রাম	ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির সংখ্যা			ভস্মিভূত দোকানের সংখ্যা	সর্বমোট
	সম্পূর্ণ ভস্মিভূত	আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত	মোট		
তিনটিলা	১১২	৪৪	১৫৬	৯	১৬৫
মানিকজোড়ছড়া	৮১	২১	১০২	৬	১০৮
বাত্যাপাড়া	২৪	২৩	৪৭	৪	০৫১
সোনাই	১	-	১	-	১
মোট	২১৮	৮৮	৩০৬	১৯	৩২৫
মোট ক্ষতির পরিমাণ: ৩৩,৯০,০০,০০০ টাকা (৪১,৮৫,১৮৫ ইউএস ডলার)					
ক্ষমিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা (প্রাইমারী থেকে কলেজ পর্যন্ত) : ২৫৬ জন ছাত্রছাত্রীর মোট ক্ষতির পরিমাণ ২৫৬ জন x ৫,০০০ টাকা প্রতিজন = ১২,৮০,০০০ টাকা (১২,৮০২ ইউএস ডলার)					

পরিমাণ ৩৪ কোটি টাকা। এছাড়া প্রাথমিক থেকে কলেজ পড়ুয়া ২৫৬ জন ছাত্র/ছাত্রীর পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষা সামগ্রী, পোষাক পরিচ্ছদ অগ্নিসংযোগে পুড়ে যায়।

ক. ঘটনার সূত্রপাত

গত ১ জুন ২০১৭ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় খাগড়াছড়ি-দিঘীনালা সড়কের চার মাইল নামক স্থানে নুরুল ইসলাম নয়ন নামে ভাড়ায় চালিত একজন মোটর সাইকেল চালকের লাশ উদ্ধার করা হয়। গত ২ জুন সকালে পৌনে ৭টার দিকে খাগড়াছড়ি থেকে লংগদু উপজেলাধীন বটতলী নামক গ্রামে তার লাশ নিয়ে আসা হলে দুইজন পাহাড়ি ভাড়া নিয়ে তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে মর্মে অভিযোগ এনে সেটেলার বাঙালিরা সাম্প্রদায়িক উস্কানী ছড়াতে থাকে। ভোর থেকে মাইক যোগে জুম্মদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়ে নয়নকে হত্যার প্রতিবাদে আহুত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে যোগ দিতে সেটেলার বাঙালিদেরকে আহ্বান জানানো হয়। ফলে সদরের আশেপাশের এলাকাসহ গাদোছড়া, মাইনী, বগাচদর ইত্যাদি এলাকা থেকে গাড়ি ও বোট যোগে শত শত সেটেলার বাঙালি বাত্যা পাড়ায় সমবেত হয়।

এরপর সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সেনাবাহিনী ও পুলিশের উপস্থিতিতে লংগদু উপজেলায় বাত্যা পাড়া থেকে আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিদের এক জঙ্গী সাম্প্রদায়িক মিছিল বের করা হয়। এই জঙ্গী সাম্প্রদায়িক মিছিলটি জুম্ম অধ্যুষিত এলাকার মধ্য দিয়ে আনুমানিক ১০টার দিকে লংগদু সদরের তিনটিলা এলাকার কাছাকাছি পৌঁছলে সেটেলার বাঙালিরা কোন উস্কানী ছাড়াই জুম্মদের ঘরবাড়ি ও দোকান লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে এবং জুম্মদেরকে ধাওয়া করতে থাকে।

খ. অগ্নিসংযোগ ও সাম্প্রদায়িক হামলা

সেটেলার বাঙালিদের মিছিলটি আনুমানিক ১০টার দিকে লংগদু সদরের তিনটিলা এলাকায় পৌঁছলে সেটেলার বাঙালিরা কোন উস্কানী ছাড়াই পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও হেডম্যান এসোসিয়েশনের মাল্টিপারপাস কমিউনিটি সেন্টারের অফিসসহ জুম্মদের ঘরবাড়ি ও দোকানগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং জুম্মদের উপর হামলা করতে শুরু করে। এতে জুম্ম গ্রামবাসীরা প্রাণের ভয়ে মানিকজোড়ছড়া এলাকার দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এ হামলায় তিনটিলা এলাকায় ১০টি দোকানসহ জুম্মদের কমপক্ষে ৯৪টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। সেটেলাররা প্রথমে জুম্মদের ঘরবাড়ি ও দোকানগুলো লুটপাট করে। তারপর পেট্রোল ও কেরোসিন ঢেলে দিয়ে একের পর এক অগ্নিসংযোগ করে থাকে। এমনকি এক ধরনের গ্যাসের বোতল থেকে স্প্রে করে ঘরবাড়ির চালে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় বলে দেখা গেছে। ফলে পাকা বা আধা পাকা ঘরবাড়িগুলোও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে দ্রুত পুড়ে যেতে দেখা যায়।

তিনটিলা এলাকায় অগ্নিসংযোগের সময় লংগদু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও লংগদু মৌজার হেডম্যান কুলিনমিত্র চাকমার বাড়িতে গুণমালা চাকমা নামে ৭৫ বছরের একজন বৃদ্ধ মহিলা আগুনে পুড়ে মারা যায়। সেটেলার বাঙালিরা উক্ত বাড়ীতে আগুন দিলে বার্ধক্যের কারণে গুণমালা চাকমা পালিয়ে যেতে পারেননি। আগুনে পুড়ে মারা যাওয়ার আগে সেটেলাররা এই বৃদ্ধ মহিলাকেও নৃশংসভাবে মারধর করে আহত করে বলে জানা গেছে। অপরদিকে হামলাকারীরা কিলঘুষি ও লাঠিসোটা দিয়ে মারধর করে আটারকছড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মঙ্গল কান্তি চাকমা, যুব সমিতির লংগদু থানা শাখার সদস্য অমর চাকমা (৩২) ও অরুণতন চাকমা (৩৩) পীং সূর্যমণি চাকমা নামে তিনটিলা গ্রামবাসীকে।

মিছিল শেষে লংগদু সদরের উপজেলা মাঠে সেটেলার বাঙালিদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় একদিকে জুম্ম বিরোধী সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ চলতে থাকে, অন্যদিকে তিনটিলার জুম্ম ঘরবাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হতে থাকে। উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলাম ও সেটেলার বাঙালি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, লংগদু উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, লংগদু সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার ও লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বক্তব্য প্রদান করেন।

এরপর সেটেলার বাঙালিরা পার্শ্ববর্তী মানিকজোড়ছড়া নামক জুম্ম গ্রামে হামলা করতে যায়। সেটেলার বাঙালিরা জুম্ম ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করতে গেলে প্রথমে জুম্ম গ্রামবাসীরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ফলে সেটেলার বাঙালিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিছু সময়ের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। তখনো পর্যন্ত সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের ঘরবাড়িতে আগুন ধরাতে সক্ষম হয়নি। এমতাবস্থায় লংগদু সেনা জোনের সুবেদার মেজর রফিকের নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য জুম্মদেরকে অস্ত্র তাক করে এগিয়ে আসে এবং জুম্মদেরকে গুলি করার হুমকি দিতে থাকে। ফলে জুম্মরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তখন সেটে-লার বাঙালিরা নির্বিঘ্নে জুম্মদের ঘরবাড়ি লুটপাট করে এবং পেট্রোল ও কেরোসিন ঢেলে অগ্নিসংযোগ শুরু করে। এতে মানিকজোড়ছড়ায় ৫টি দোকানসহ কমপক্ষে ৮৮টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ছাই হয়ে যায়।

বেলা ১২টার দিকে জেলা প্রশাসন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ১২টার পরেও ২টা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর প্রহরায় সেটেলার বাঙালিরা বাত্যা পাড়ায় অগ্নিসংযোগ শুরু করে। এতে ৪টি দোকানসহ বাত্যা পাড়ায় ৪২টি ঘর পুড়ে যায় বলে জানা যায়। একপর্যায়ে বাত্যা পাড়া থেকে সেটেলাররা ফিরে এলে পার্শ্ববর্তী বড়াদম গ্রামের ঘরবাড়ি অগ্নিসংযোগ থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে।

গ. সেনা ও পুলিশের ভূমিকা

লাশ নিয়ে সেটেলারদের জঙ্গী মিছিল বের করার খবর জানাজানি হলে জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক মণি শংকর চাকমাসহ স্থানীয় জুম্ম জনপ্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক হামলার একদিন আগে ১ জুন সন্ধ্যায় ২ ইবিআরের লংগদু সেনা জোন ও লংগদু থানা কর্তৃপক্ষের কাছে নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কার কথা জানান এবং সেটেলার বাঙালিদেরকে লাশ নিয়ে মিছিল করার অনুমতি না দিতে অনুরোধ করেন। তারই প্রেক্ষিতে

সেদিন রাত ৯টার দিকে সেনা জোনের পক্ষ থেকে টুআইসি মেজর রফিক ও সুবেদার মেজর মো: রফিক নিজে এসে জুম্মদেরকে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'মিছিল করা সেটেলারদের গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। তারা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলটি করবে। মিছিলের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে সেনা-পুলিশ থাকবে। কোন অঘটন ঘটতে দেয়া হবে না।' তাই নিরাপত্তা নিয়ে জুম্মদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে জুম্মদেরকে তিনি আশ্বস্ত করেন। তারও আগে লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোমিনুল ইসলামও একই সুরে জুম্মদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এমনকি ২ জুন সকালে এসে সুবেদার মেজর মো: রফিক আবারও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে যান।

কিন্তু লংগদু সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার লে: কর্ণেল আবদুল আলিম চৌধুরী পিএসসি, টুআইসি মেজর রফিক ও লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে সেনা-পুলিশের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও লাশ নিয়ে সেটেলার বাঙালিদের মিছিল উপজেলা সদরের তিনটিলা এলাকার কাউলতলায় পৌঁছার সাথে সাথে সেটেলাররা জুম্মদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট লুট করতে শুরু করে এবং পেট্রোল ও কেরোসিন ঢেলে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগকারী সেটেলার বাঙালিদেরকে বাধা প্রদানে কর্তব্যরত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের দেখা যায়নি। সেনা ও পুলিশ সদস্যরা এ সময় কয়েকজন সেটেলারকে ধাওয়া করলেও কাউকে আটক করেনি। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগকারী সেটেলার বাঙালিরা সেনা-পুলিশের ঘেরার মধ্যে থাকলেও কাউকে গ্রেফতার না করে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। একদিকে তাড়া খাওয়ার পর সেটেলাররা অনতিদূরে অবস্থিত ঘরবাড়িতে গিয়ে পুনরায় লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।

অন্যদিকে সুবেদার মেজর রফিকের নেতৃত্বে সেনা সদস্যরা মানিকজোড়ছড়ায় না গেলে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করতে সক্ষম হতো না। সেনা সদস্যরা না পৌঁছা পর্যন্ত জুম্ম গ্রামবাসীরা সেটেলার বাঙালিদের প্রতিরোধ করেছিল। সেনা সদস্যরা পৌঁছার পর জুম্মদের গুলি করার হুমকি দিলে জুম্মরা মানিকজোড়ছড়া গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং সেনা-পুলিশের প্রহরায় সেটেলাররা অবাধে জুম্মদের ঘরাবাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় জোন কম্যান্ডার লে: কর্ণেল আবদুল আলিম চৌধুরী মানিকজোড়ছড়ায় গেলে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগরত সেটেলার বাঙালিদের ছত্রভঙ্গ না করে তিনি নীরবে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন। এরপর সেনা-পুলিশ প্রহরায় সেটেলার বাঙালিরা বাত্যা পাড়া ও বড়াদমে হামলা করতে যায়। সেনাবাহিনী ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ সাফাই গেয়ে চলছে যে, মিছিল ও সমাবেশে হাজার হাজার লোক হওয়ায় তাদের পক্ষে জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বাস্তবে সেনাবাহিনী ও পুলিশকে লুটপাটকারী ও অগ্নিসংযোগকারী সেটেলারদের ছত্রভঙ্গ করতে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। এমনকি দুপুর ১২টায় ১৪৪ ধারা জারি করার পরও সেনা-পুলিশকে কোন ফাঁকা গুলি বা কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। সেটেলার বাঙালিদের নিবৃত্ত না করে বরঞ্চ তাদেরকে জুম্মদের হুমকি ও ধাওয়া করতে দেখা গেছে। বলাবাহুল্য, সেটেলার বাঙালিরা হচ্ছে সেনাবাহিনীর পোষ্যপুত্র। সেনাবাহিনীর সম্মতি ছাড়া সেটেলাররা কোন কিছুই করার সাহস করে না। হামলায় লংগদু সেনা জোনের সুবেদার মেজর (এমএস) মো: রফিক ও মেজর রফিক মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অধিকন্তু লংগদু জোন কম্যান্ডার লে: কর্ণেল আবদুল আলিম চৌধুরী ও লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোমিনুল ইসলামও ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সেটেলারদের প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করেন। চাকরিরত অবস্থায় রাষ্ট্রের কোন কর্মচারী একটা পাবলিক প্রতিবাদ সমাবেশে যোগদান করা এবং বক্তব্য দেয়া চাকরি বিধিমালার সরাসরি লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করা যায়। অথচ নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর উক্ত কর্মকর্তারা আইনের তোয়াক্কা না করে একটি সাম্প্রদায়িক সমাবেশে যোগদান করেছিলেন। এ থেকে বুঝা যায় তারাও হামলার পক্ষে ছিল।

সেনা জোন ও থানার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা সত্ত্বেও এবং তাদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতিতে জুম্মদের ঘরবাড়িতে সেটেলার বাঙালিদের অবাধে এই অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও হামলার ঘটনা থেকে এটা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, সেনা-পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতৃত্বের যোগসাজশে জুম্মদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ ও সাম্প্রদায়িক হামলার পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে সেটেলার বাঙালিরা লাশ নিয়ে মিছিল করার আয়োজন করেছিল। জানা গেছে যে, ২ জুন রাতে জোন কম্যাণ্ডারের উদ্যোগে লংগদু থানায় গোপন বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে কিভাবে ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া হবে এবং কার উপর দায়ভার চাপিয়ে দেয়া হবে ইত্যাদি পরিকল্পনা করা হয়।

ঘ. ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে সকল জাতীয় রাজনৈতিকদল ও সাম্প্রদায়িক সেটেলার সংগঠনের অংশগ্রহণ

ড্রাইভার নয়নকে হত্যার প্রতিবাদে আহুত জঙ্গী মিছিল ও সমাবেশে এবং জুম্মদের ঘরবাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলাম প্রভৃতি জাতীয় রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে এবং তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলন ও অন্যান্য সেটেলার বাঙালিদের সংগঠনের লোকজন অংশগ্রহণ করে থাকে। নুরুল ইসলাম নয়নকে হত্যার প্রতিবাদে আওয়ামীলীগের উদ্যোগে আহুত সমাবেশে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দিয়েছেন, লংগদু জোনের জোন কম্যান্ডার লে. কর্ণেল আব্দুল আলীম চৌধুরী ও লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোমিনুল ইসলাম। এছাড়া বক্তব্য প্রদান করেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য ও আওয়ামীলীগের লংগদু শাখার সাধারণ সম্পাদক জানে আলম, লংগদু উপজেলা চেয়ারম্যান ও বিএনপি লংগদু শাখার সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন, লংগদু উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জামায়াতে ইসলামীর লংগদু শাখার আমীর নাসির উদ্দীন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলনের নেতা এ্যাডভোকেট আবছার আলী, লংগদু যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, বাঙালি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি আলমগীর হোসেন প্রমুখ। অপরদিকে তারই অংশ হিসেবে ২ জুন সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উক্ত মোটর সাইকেল চালককে হত্যার প্রতিবাদে রাঙ্গামাটি শহরে

ক্ষমতাসীন দলের যুবলীগ এক জঙ্গী মিছিল বের করে। এতে জুম্ম বিরোধী সাম্প্রদায়িক শ্লোগান প্রদান করা হয় বলে জানা যায়।

এ থেকে এটা বলা যায় যে, ২০১২ সালে যেভাবে কক্সবাজার জেলার রামুতে সকল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ, নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারীর লোকজনের অংশগ্রহণে আগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল, তারপর সম্মিলিতভাবে বৌদ্ধ মন্দির ও সম্প্রদায়ের উপর হামলা চালানো হয়েছিল সেভাবে লংগদুতে সকল জাতীয় রাজনৈতিক দল, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সাম্প্রদায়িক বাঙালি সংগঠনের অংশগ্রহণে একযোগে প্রতিবাদ সমাবেশ ও অগ্নিসংযোগের সাম্প্রদায়িক হামলা চালানো হয়েছিল।

ঙ. মামলা দায়ের ও গ্রেফতার এবং সুবিচারের না পাওয়ার আশঙ্কা

এ সহিংস ঘটনায় গত ২ জুন ২০১৭ বিকালে লংগদু থানার এসআই দুলাল হোসেন কর্তৃক ১৫ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক অজ্ঞাতনামা ৩০০/৪০০ জনের বিরুদ্ধে পাহাড়িদের বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও সরকারি কাজে বাধা প্রদানের অভিযোগে লংগদু থানায় একটি পুলিশী মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের পক্ষ থেকে লংগদু থানায় নিম্নোক্ত চারটি এজাহার দায়ের করা হয়-

(১) তিনটিলা গ্রামের কিশোর চাকমা কর্তৃক ১০ জুন ২০১৭ পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে অনধিকার প্রবেশ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে ৯৮ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক ৩০০/৪০০ জন সেটেলার বাঙালির বিরুদ্ধে লংগদু থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

(২) তিনটিলা গ্রামের বাসিন্দা ও ৭নং লংগদু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কুলিনমিত্র চাকমা কর্তৃক ২০ জুন ২০১৭ পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এবং গুণেমালা চাকমাকে আগুনে পুড়ে হত্যার অভিযোগে ৪ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক ৫০/৬০ জন সেটেলার বাঙালির বিরুদ্ধে লংগদু থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

(৩) তিনটিলা গ্রামের বাসিন্দা কালাসোনা চাকমা কর্তৃক ২০ জুন ২০১৭ পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট এবং তাঁর বৃদ্ধ মাতা গুণেমালা চাকমাকে আগুনে পুড়ে হত্যার অভিযোগে ১৩ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক ৫০/৬০ জন সেটেলার বাঙালির বিরুদ্ধে লংগদু থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

(৪) বাত্যাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সমিরণ চাকমা কর্তৃক ২৭ জুন ২০১৭ পাহাড়িদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের অভিযোগে ৪১ জনের নাম উল্লেখ পূর্বক ৬০/৭০ জন সেটেলার বাঙালির বিরুদ্ধে লংগদু থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

আশ্চর্যের বিষয় যে, ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি কর্তৃক উক্ত চারটি মামলার মধ্যে মাত্র কিশোর চাকমা কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহারটি মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আর বাকি তিনটি এজাহার সাধারণ ডায়েরি হিসেবে নথিভুক্ত করা হয়। উক্ত তিনটি এজাহার মামলা হিসেবে গণ্য না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করছে। বিশেষ করে তিনটিলা পাড়ার গুণমালা চাকমাকে আগুনে পুড়ে হত্যার বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় ২০ জুন ২০১৭ গুণমালা চাকমার মেয়ে কালাসোনা চাকমা কর্তৃক লংগদু থানায় এহাজার দায়ের করা হলেও পুলিশ তা মামলা হিসেবে গ্রহণ না করে সাধারণ ডায়েরি হিসেবে গ্রহণ করেছে। যার নম্বর ৭০৪। লংগদু থানার ওসি মোমিনুল ইসলাম বলেন, কালাসোনা চাকমার অভিযোগটি পুলিশ অগ্নিসংযোগের ঘটনার দায়ের করা মামলাগুলোর সঙ্গে তদন্ত করছে। গুণামালা চাকমার হাড় বলে দাবি করা এসব হাড় সংগ্রহ করে পুলিশ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠিয়েছি বলে তিনি জানিয়েছেন। ডিএনএ পরীক্ষার জন্য সিআইডিতে (অপরাধ তদন্ত বিভাগ) পাঠানো হয়েছে বলে রাঙ্গামাটির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) মোহাম্মদ সাফিউল সারোয়ার স্বীকার করেছেন। কিন্তু ঘটনার দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও ডিএনএ পরীক্ষার ফল না আসায় বিচার না পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অন্যদিকে দুলাল হোসেন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় ৭ জন সেটেলার বাঙালি এবং গ্রেফতারকৃত উক্ত ৭ জনসহ কিশোর চাকমা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় মোট ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে ১০/১২ জন জামিনে বের হয়েছে বলে জানা গেছে। আরো উল্লেখ্য যে, গ্রেফতারকৃত সেটেলার বাঙালিরা অধিকাংশই বিএনপি ও অন্যান্য দলের সদস্য বলে জানা যায়। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ ও যুবলীগের মূলহোতা, লুটপাটকারী ও অগ্নিসংযোগকারীরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে। এছাড়া অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় সেটেলার বাঙালিদেরকে সহায়তাকারী সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যাদের উপস্থিতিতে ও যোগসাজশে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম ২ ইবিআরের লংগদু সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার লে: কর্ণেল আবদুল আলিম চৌধুরী পিএসসি, টুআইসি মেজর রফিক ও সুবেদার মেজর মো: রফিক এবং লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আইনী ও বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

আরো উল্লেখ্য যে, মো: মাহবুব মিয়া (৫৫) নামে লংগদুর ২৪নং মাইনীমুখ ইউনিয়নের মুসলিম ব্লকের জনৈক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৪৪ জন জুম্ম গ্রামবাসীর নাম উল্লেখ পূর্বক ১৫০ জন পাহাড়ির বিরুদ্ধে মোটর সাইকেল চালক নুরুল ইসলাম নয়নকে অপহরণ ও গুম করার হত্যা, চাঁদাবাজি ও সেটেলার বাঙালিদের ঘরবাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি সাজানো মামলা দায়ের করা হয়। তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য উক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে লংগদু থানায় প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানা থেকে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়নি বলে জানা যায়।

অপরদিকে নিহত মোটর সাইকেল চালক নুরুল ইসলাম নয়নের ভাই ও বাত্যা পাড়ার অধিবাসী মো: দীন ইসলাম (লিটন) কর্তৃক ১ জুন ২০১৭ তাঁর ভাইকে হত্যাকে অভিযোগে খাগড়াছড়ি পার্বত্য

জেলার খাগড়াছড়ি সদর থানায় এক মামলা দায়ের করা হয়। পরে উক্ত মামলায় গত ৯ জুন ২০১৭ তারিখে লংগদুর মাইনীমুখ ইউনিয়নের পূর্ব রাঙ্গীপাড়ার বাসিন্দা জুনেল চাকমা (১৮) ও খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলাধীন বাবুছড়ার বাসিন্দা রণেল চাকমা (৩৩) প্রমুখদেরকে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী থানাধীন থোয়াজনগর আদিম পাড়া থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানা যায়। ধৃত উক্ত দু'জন পাহাড়ি মোটরসাইকেল ড্রাইভার নয়নকে হত্যা করেছে মর্মে স্বীকারোক্তি দিয়েছে বলে যদিও পত্রিকা সূত্রে জানা গেছে, তবুও নয়নকে হত্যার পেছনে নানা ধরনের খবর শোনা যায়। যেমন- দুইজন বাঙালি ভাড়াটিয়া নিয়ে খাগড়াছড়ির দিকে যেতে দীঘিনালার বোয়ালখালী স্টেশনে ড্রাইভার নয়নকে দীপালো নামে জনৈক ব্যক্তি দেখেছে বলে শোনা গেছে। দীপালোর সাথে পরিচয় থাকায় তাকে হাতের ইশারা দিয়ে খাগড়াছড়ির দিকে যাচ্ছে বলেও ড্রাইভার নয়ন ইঙ্গিত দিয়ে যায় বলে জানা গেছে। দীপালো এই কথা ফাঁস করায় একসময় তাঁকে সেনা-পুলিশ ও প্রশাসন থেকে হুমকি দেয়া হয়েছিল।

চ. ঘটনার পর প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা

ঘটনার পর গত ৩ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সাঈদ তরিকুল হাসান ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনের পর উপজেলা প্রশাসকের উদ্যোগে উপজেলা সভাকক্ষে একটি শান্তি-শৃঙ্খলা সভা আয়োজন করা হয়। এতে লংগদু সেনা জোনের জোন কম্যান্ডারসহ পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। জুম্মদের মধ্যে জনসংহতি সমিতির লংগদু শাখার সাধারণ সম্পাদক মণি শংকর চাকমা, লংগদু ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও লংগদু মৌজার হেডম্যান কুলিনমিত্র চাকমা, আটারকছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঙ্গল কান্তি চাকমা, তিনটিলা গ্রামের কার্বারী বুদ্ধমনি চাকমা ও ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজনসহ ৭/৮ জন জুম্ম উপস্থিত ছিলেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলাম প্রভৃতি জাতীয় রাজনৈতিক দল এবং তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলন ও অন্যান্য সেটেলার বাঙালিদের সংগঠনের ৩০/৩৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ক্ষতিগ্রস্তদেরকে স্ব স্ব গ্রামে আসতে আহ্বান জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মানজারুল মান্নান। এ সময় তিনি রাজনৈতিক নেতার মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদাগার করেন। জনসংহতি সমিতিসহ আঞ্চলিক সংগঠনগুলোকে ইঙ্গিত করে 'নয়নকে কে বা কারা হত্যা করেছে তা সবাই জানে' বলে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।

গত ৪ জুন আওয়ামীলীগের রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি দীপঙ্কর তালুকদার লংগদুতে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কথা বলার সময় জুম্ম ঘরবাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন কথা না বলে চাঁদাবাজি ও অস্ত্রবাজির বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে থাকলে ক্ষতিগ্রস্তরা তীব্র প্রতিবাদ করে এবং একপর্যায়ে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। লংগদু সেনা জোনের জোন কম্যান্ডার লে. কর্ণেল আব্দুল আলীম চৌধুরীকে তার পক্ষে নেয়ার জন্য তিনি বলেছেন, 'আপনি আমি কখনোই তাদের কাছে ভালো হতে পারবো না।' তারা নাকি জনসংহতি সমিতির ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা নাকি জনসংহতি সমিতি দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে ইত্যাদি প্রলাপ বকে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্ব, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন তাদের অপকর্ম ঢাকতে ও পরিস্থিতিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে এভাবে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করে চলছে।

ছ. সরকারের পদক্ষেপ

ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর এক মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িদের বসতবাড়ী নির্মাণসহ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রদান করা হয়নি। এই বর্ষার সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম পরিবারগুলো অত্যন্ত করুণ অবস্থায় মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। উল্লেখ যে, ঘটনার পর পরই গত ৭ জুন ২০১৭ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশাহ ও পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিংসহ ১৪ দলের একটি প্রতিনিধিদল অগ্নিসংযোগের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও স্থায়ী পুনর্বাসন করা হবে এবং অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার পূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে মর্মে সেসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৪ দলের প্রতিনিধিদলের সরেজমিন পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভাকে আওয়ামীলীগের উদ্যোগে সেটেলার বাঙালিদের সভায় পরিণত করে সম্পন্ন হয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত ও আটারকছড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মঙ্গল কান্তি চাকমা ব্যতীত সেনা-পুলিশের সহায়তায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসীদের কাউকে কথা বলতে সুযোগ দেয়া হয়নি।

এছাড়া ঘটনার পর ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্ত পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: কামাল উদ্দিন তালুকদার, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকসহ সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ঘটনাস্থল সফর করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়িরা তাদের দাবিনামা সম্বলিত স্মারকলিপি এসব মন্ত্রী ও কর্মকর্তাসহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন। জুম্ম ক্ষতিগ্রস্তরা বাড়ি নির্মাণ বাবদ যথোপযুক্ত অর্থ ও কমপক্ষে তিন বছরের রেশনসহ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও যথাযথ পুনর্বাসন এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জুম্মদের ঘরবাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িতদের অচিরেই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার দাবি জানিয়েছেন।

গত ৬ জুলাই ২০১৭ মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত লংগদু ঘটনার ৫-সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি লংগদুতে গণশুনানী আয়োজন করেছে। চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) শঙ্কর রঞ্জন সাহার নেতৃত্বে তদন্ত কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন- দীপক চক্রবর্তী, পরিচালক, স্থানীয়

সরকার, চট্টগ্রাম বিভাগ; মঞ্জুরুল আলম, যুগ্ম সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; এম এ মাসুদ খান, প্রতিনিধি, ডিআইজি, চট্টগ্রাম এবং আবু সাহেদ চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। উপজেলা সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত গণশুনানীতে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ সেটেলার বাঙালিরা উপস্থিত ছিলেন। লংগদু ঘটনার সংঘটিত হওয়ার কারণ এবং উদ্ভূত সমস্যা কিভাবে নিরসন করা যায় তা খুঁজে বের করা ছিল উক্ত তদন্ত কমিটি মূল উদ্দেশ্য বলে শঙ্কর রঞ্জন সাহা জানান। উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ করা হয়নি। গণশুনানীর সময় পাহাড়ি ক্ষতিগ্রস্তরা তদন্ত কমিটির কাছে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং ঘরবাড়ি নির্মাণ ও তিন বছরের রেশনসহ যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানান।

উল্লেখ্য যে, ঘরবাড়ি নির্মাণ ও তিন বছরের রেশনসহ যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের প্যাকেজ পরিকল্পনা ঘোষণা ব্যতীত ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসীরা সরকারি ত্রাণ গ্রহণে অপারগরতা জানিয়ে আসছিলেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রতিপরিবারকে কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা করে পুনর্বাসনের আশ্বাস পেয়ে অবশেষে ঘটনার পাঁচ সপ্তাহ পর ১২ জুলাই ২০১৭ জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে সরকারি ত্রাণ গ্রহণ করেন ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা। জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যেক পরিবারের জন্য নগদ ৬ হাজার টাকা, ২ বান্ডিল টিন, ৩০ কেজি চাল ও ২টি করে কম্বল দেওয়া হয় ত্রাণ ও দুযোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের এই ত্রাণ। এক মাসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় থেকে প্রতিপরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে পুনর্বাসন প্যাকেজ দেয়া হবে বলে রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক মো. মানজারুল মান্নান ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের আশ্বাস দেন। জেলা প্রশাসকের বিশেষ বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের রেশন সহায়তা দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

জানা গেছে যে, গত ১১ জুলাই ২০১৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রেরিত আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) আবুল কালাম শামসুদ্দিনের স্বাক্ষরিত এক পত্রে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে পার্বত্য ৩টি জেলায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর নির্মাণের ব্যবস্থাপনার অধীনে লংগদু ঘটনার ক্ষতিগ্রস্ত ২১২টি পরিবারের বসতগৃহ (৩ কক্ষ বিশিষ্ট ১টি সেমিপাকা ঘর, ১টি রান্না ঘর ও ১টি শৌচাগার) এবং ৮টি দোকান নির্মাণের জন্য প্রাক্কলন ও নজ্ঞ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রতিটি ঘরের প্রাক্কলিত মূল্য আইটিভ্যাটসহ ৫.২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, যাতে আইটিভ্যাট (১০%) বাদে ৪.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্প বিষয়ে আপত্তি রয়েছে এবং লংগদু ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মরা সরকার কর্তৃক ঘর নির্মাণের পরিবর্তে নগদ অর্থ দাবি করে আসছে।

জ. হামলার অন্তরালে

সাম্প্রতিক সময়ে জুম্মদের উপর শাসকদলের সহযোগিতায় সেনা-বিজিবি-পুলিশের দমন-পীড়ন, ধর-পাকড়, ভূমি বেদখল ও স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ ইত্যাদি জোরদার হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ন্যায্য আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে পরিচিহ্নিত করা, জনসংহতি সমিতিসহ আন্দোলনরত সংগঠন ও কর্মীদেরকে দমন-পীড়ন করা, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার হীনউদ্দেশ্যে ক্ষমতাসীন দলের সহযোগিতায় বিজিবি-সেনাবাহিনী-পুলিশ এভাবে জুম্মদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পরিবর্তে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে শাসক-মহল গোয়েবলসীয় কায়দায় নিরবিচ্ছিন্ন অপপ্রচার করে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই মোটরসাইকেলের ড্রাইভার নুরুল ইসলাম নয়নকে হত্যার ঘটনায় সেনাবাহিনী, প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী জুম্মদেরকে দায়ী করে, বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির দিকে ইঙ্গিত দিয়ে অভিযোগ এনে এঘটনাকে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

জুম্মদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের অংশ হিসেবে জুম্মদের উপর ধারাবাহিকভাবে যে গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়ে আসছে তারই অংশ হিসেবে লংগদুতে এই লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর আগেও ১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে লংগদুতে জুম্মদের উপর এক গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। উক্ত গণহত্যায় অন্তত ৩২ জন নিহত ও ৯টি গ্রামের ১০১১টি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, সরকারী উদ্যোগে ১৯৭৯ সাল হতে সমতল জেলাগুলো থেকে পাঁচ লক্ষাধিক মুসলমান বাঙালি বসতি প্রদান কালে লংগদু উপজেলায় সবচেয়ে বেশি বাঙালি পরিবার বসতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে কেবল লংগদু উপজেলায় এক লক্ষাধিক সেটেলার বাঙালি রয়েছে। গত ২ জুনের লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের হামলার মূল লক্ষ্য হল জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে জুম্মদেরকে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি জবরদখল করা এবং সেটেলার বাঙালি বসতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ করা। কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী একদিকে পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীদের অধিকার সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল রেখে সারা দেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ বিকাশের পথ প্রশস্ত করে তুলছে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি-উত্তর কালেও চুক্তি বিরোধী ও মৌলবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ মদদে সেটেলার বাঙালিরা জুম্ম জনগণের উপর লংগদুর এই হামলাসহ এ যাবৎ ২০টি নৃশংস ও বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়েছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

রাঙ্গামাটিতে সেনা পৃষ্ঠপোষকতায় জুম্ম বিরোধী সেটেলার বাঙালিদের সমাবেশঃ

পার্বত্য পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে সাম্প্রদায়িক উস্কানী

গত ১৪ মে ২০১৭ সকাল ১০টায় রাঙ্গামাটি শহরের জুম্ম অধ্যুষিত এলাকা-জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে-সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় 'নির্যাতিত নিপীড়িত পার্বত্যবাসী' নামে বাঙালি সংগঠনগুলোর এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তথাকথিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, গুম অপহরণের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের দাবিতে' এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের আগের দিন ১৩ মে ২০১৭ তথাকথিত পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের খুন, গুম, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাদির অভিযোগ তুলে সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে রাঙ্গামাটি শহরে মাইকিং করা হয়। আরো জানা গেছে যে, ১৩ মে রাঙ্গামাটি সেনা জোনের জি-২ সৈয়দ তানভির সালেহ রাঙ্গামাটির স্থানীয় সাংবাদিকদেরকে সেনা জোনে ডেকে ১৪ মে-এর সমাবেশ কভার করার জন্য সমাবেশ স্থলে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। আরো জানা গেছে যে, সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রাঙ্গামাটি শহর, নানিয়ারচর, রাজস্থলী, কাউখালী, কাপ্তাই, লংগদু, বরকল, বিলাইছড়ি উপজেলাসহ বিভিন্ন এলাকায় সেটেলার বাঙালিদেরকে দোকানপাট বন্ধ করে ও সকল কাজকর্ম ফেলে উক্ত সমাবেশে যোগ দিতে নির্দেশ দেয়। আওয়ামীলীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-জামায়াত ইসলামী নির্বিশেষে জাতীয় রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত সকল বাঙালিদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে হবে বলে স্থানীয় সেনা ক্যাম্প থেকে নির্দেশ দেয়া হয়। বিশেষ করে রাঙ্গামাটির নান্যাচরে সকল পেশাজীবী সাধারণ বাঙালিদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে কড়া নির্দেশ দেন নান্যাচর জোন কমাণ্ডার লে: কর্ণেল মোঃ বাহলুল আলম। সমাবেশে অংশগ্রহণ না করলে প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে বলেও হুমকি দেন তিনি।

যদিও বাঙালি সংগঠনগুলোর এ সমাবেশ সম্পর্কে পুলিশের তেমন কোন ভূমিকা ছিল না, কিন্তু সমাবেশের একদিন আগে সেনাবাহিনী তরফ থেকে পুলিশ বাহিনীকে সমাবেশের দিনে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয়। লক্ষ করা গেছে যে, জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে সমাবেশের জন্য মঞ্চ তৈরি ও প্যান্ডেল টানানোর যাতবীয় কাজ সরাসরি তত্ত্বাবধান করেন সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা। এ সময় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে একদল পুলিশও সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা প্রহরায় থাকতে দেখা গেছে। উল্লেখ্য, পাহাড়িদের সমাবেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের নিরাপত্তা বিধানে পুলিশের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। ১৩ মে সেটেলার বাঙালি নেতৃবৃন্দ, গোয়েন্দা বাহিনী ও পুলিশের পক্ষ থেকে অপপ্রচার করা হয় যে, পাহাড়ি যুবকরা নাকি সমাবেশে বাধা দিচ্ছিল। সমাবেশের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছিল। কিন্তু সরেজমিন তদন্ত করে তার কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। সেসময় রাঙ্গামাটি শহরে একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছিল।

আওয়ামীলীগের সমর্থক ও পার্বত্য নাগরিক পরিষদের সভাপতি নূর জাহানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জাহাঙ্গীর আলম মুন্না। এতে বক্তব্য রাখেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমঅধিকার আন্দোলনের রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর কামাল, বাঙালি ছাত্র পরিষদের উপদেষ্টা মো. ইয়াকুব আলী চৌধুরী, পার্বত্য গণপরিষদের সভাপতি মো. পারভেজ তালুকদার, বাঙালি ছাত্র পরিষদের নেতা মো. সাহাদাৎ ফরায়জী, মো.জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। এছাড়া রূপ কুমার চাকমা, লাল এংলিয়ান পাংখোয়া, নূরেন পাংখোয়া নামক চিহ্নিত সেনা এজেন্টরাও বক্তব্য প্রদান করে বলে জানা যায়। জানা গেছে, সমাবেশ থেকে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সেটেলার বাঙালি নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে বক্তারা বলেন, ৩০ নভেম্বরের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। প্রশাসন যদি অবৈধ অস্ত্রধারীদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়, তবে পার্বত্যবাসী নিজেরাই অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে। সমাবেশের পূর্বে রাঙামাটি পৌর প্রাঙ্গণ থেকে একটি মিছিল বের করে বনরূপা হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জিমনেসিয়াম এলাকায় সমাবেশস্থলে এসে শেষ হয়। উক্ত মিছিলে অন্যান্যের মধ্যে 'একটা দুইটা পাহাড়ি ধরো, সকল বিকাল নাস্তা করো', 'সন্তু লারমার গালে গালে জুতা মারো তালে তালে', 'সন্তু লারমার আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও' ইত্যাদি উগ্র সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দেয় বলে জানা যায়।

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও আতঙ্ক বিরাজ করার কারণে সমাবেশের সময় সকাল ১০টা থেকে রাঙামাটি শহরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অটোরিকশা ও মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়ে সাধারণ মানুষ। গাড়ি না চলায় শহরের বাইরের ভেদভেদি এলাকা থেকে শিল্পকলা পর্যন্ত দুই কিলোমিটারের বেশি পথ হাঁটতে হয়েছে সাধারণ লোকদের। বন্ধ থাকে বনরূপা থেকে ভেদভেদি পর্যন্ত দোকানপাটও। বেলা আড়াইটার দিকে সমাবেশ শেষ হলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জনসংহতি সমিতি ও অন্যান্য অধিকারকামী জুম্ম সংগঠনসমূহকে বিচ্ছিন্নতাবাদী, অস্ত্রধারী, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে সমাবেশে 'পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হোন', 'অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করে পার্বত্যবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে', 'যারা উন্নয়নে বাধা দেয়, তাদের সামাজিকভাবে বর্জন করুন' ইত্যাদি ব্যানার ও প্লাকার্ড প্রদর্শন করা হয়। সেই সাথে জনমতকে বিভ্রান্ত করা এবং মেকি সহানুভূতি দেখিয়ে জুম্মদের সমর্থন লাভ করার জন্য 'বিশাখা চাকমার হত্যার বিচার চাই', 'মোহিনী ত্রিপুরা হত্যা

কেন?' লেখা ব্যানার ও প্লাকার্ডও প্রদর্শন করা হয়। বস্তুত সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালিদের সাম্প্রদায়িক হামলায় অনেক জুম্মকে হত্যা, শত শত ঘরবাড়ি অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট, ভূমি জবরদখল ইত্যাদি অপকর্মকে ধামাচাপা দিতেই বিশাখা চাকমা বা মোহিনী ত্রিপুরার মতো বিতর্কিত হত্যাকণ্ডের বিষয়গুলো সেটেলার বাঙালি সংগঠনগুলো সমাবেশে তুলে ধরে।

বস্তুত সাম্প্রতিক সময়ে জুম্মদের উপর সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান ধরপাকড়, জেল-জুলুম, তল্লাসী ও নিপীড়ন-নির্যাতন; ৬ মে পঙ্কজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ঢাকা থেকে আগত নাগরিক প্রতিনিধিদলকে লামায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্রোদের জায়গা-জমি বেদখলের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য বান্দরবানে ঢুকতে না দেয়া; ১৯ এপ্রিল সেনা নির্যাতনে এসএইচসি পরীক্ষার্থী ও আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী রমেল চাকমা হত্যার বিরুদ্ধে জাতিসংঘসহ দেশে-বিদেশে যে প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে তা ধামাচাপা দিতে এবং জনমতকে অন্যখাতে প্রবাহিত করতে সেনাবাহিনীর উদ্যোগে বাঙালিদের এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ যাবৎ বাঙালি সংগঠনগুলো বিভিন্ন দাবিনামা ও ইস্যু নিয়ে সমাবেশ আয়োজন করার চেষ্টা করলেও সেসব সমাবেশে মুষ্টিমেয় কিছু সেটেলার ছাড়া তেমন কোন লোক উপস্থিত করাতে পারেনি। তবে এবারের সমাবেশে সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ও সমাবেশে উপস্থিত থাকতে সেটেলার বাঙালিদের উপর কড়া নির্দেশ দেয়ার ফলে এই সমাবেশে আনুমানিক ১৫-২০ হাজার সেটেলার বাঙালি উপস্থিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। সেনাবাহিনীর এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এমন কতিপয় জুম্মও সমাবেশে যোগদান করে। সমাবেশে অংশগ্রহণকারী সেটেলার বাঙালিদেরকে রাজস্থলী, কাপ্তাই, কাউখালী, নানিয়ারচর, লংগদু, বরকল থেকে শত শত গাড়ী ও লঞ্চ যোগে রাঙ্গামাটিতে আনা হয়। এছাড়া প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে ভাতের প্যাকেট দেয়া হয়। অনুমান করা হয়, এ সমাবেশে কমপক্ষে এক কোটি টাকা খরচ হতে পারে।

'শান্তকরণ প্রকল্প' নামে কাউন্টার ইনসার্জেন্সী প্রকল্পের অর্থ ও খাদ্যশস্য দিয়ে সেনাবাহিনী বরাবরই জুম্মদের বিরুদ্ধে সেটেলার বাঙালিদেরকে সংগঠিত করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে আসছে তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এবারে কোন আইনের বালাই না করে বাঙালিদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক সমাবেশ আয়োজনে আর্মীরা প্রকাশ্যে ভূমিকা পালন করলো, যা বর্তমান সময়ে সেনাবাহিনীর আগ্রাসী ভূমিকারই বহি:প্রকাশ বলে বলা যায়। কাউখালী উপজেলার আওয়ামীলীগের এক জুম্ম নেতা থেকে জানা গেছে যে, এই সমাবেশ আয়োজনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতৃত্বও পরোক্ষভাবে জোরালো ভূমিকা পালন করেছিল। সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন উপজেলায় আওয়ামীলীগের সমর্থকসহ সেটেলার বাঙালিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল দলের স্থানীয় নেতৃত্ব।

কাউখালী থেকে আসা সেটেলাররা রাঙ্গামাটির সমাবেশে আসার পথে ১৪ মে সকাল ১০টার দিকে কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া কলেজের যাত্রী ছাউনিতে এক আদিবাসী বৃদ্ধের দোকানে গাড়ী থেকে নেমে হামলা চালায়। সেটেলাররা দোকানদার মায়াধন চাকমা (৬৫), পিতা মৃত-বাত্যা চাকমাকে মারধর করে দোকান ভাংচুর করে। দোকান থেকে কয়েক হাজার টাকার মালামাল ও নগদ টাকা লুট করে বলেও জানা যায়। এ সময় কলেজের যাত্রীছাউনিতে বসে থাকা ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্রের উপর হামলা করা হয়। হামলার শিকার হওয়া ছাত্ররা হলো ঘাগড়া মহাজন পাড়ার নিবাসী ধনমনি চাকমার পূত্র দেবাশিষ চাকমা এবং একই পাড়ার নিবাসী উপেন্দ্র চাকমার পূত্র উত্তম চাকমা। হামলার শিকার হওয়া ভিকটিমেরা অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পায়।

২৩ পৃষ্ঠার পর

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবৈধ গ্রেফতার

আটকে রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং সমতল অঞ্চলে আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশনের দাবিতে গত ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ তিন পার্বত্য জেলার জেলায় গণমানববন্ধন আয়োজনে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক খাগড়াছড়ি জেলায় অনুমতি দেওয়া হয়নি। ফলে খাগড়াছড়ি সদরে মানববন্ধনে আসা লোকদের উপর পুলিশ চড়াও হয়। মহালছড়ি উপজেলাধীন মাইসছড়ি ইউনিয়ন ও মহালছড়ি সদরে বাধা প্রদান করে। মহালছড়ি ক্যাম্পের সেনা কর্তৃক মাইসছড়ির ম্যাজিস্ট্রেট পাড়া ও নুনছড়ি পাড়ার মানববন্ধনে আসা লোকদেরকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও বেধড়ক মারধর করে। এতে ৯ জন আহত হয় এবং একজনকে ধরে নিয়ে থানায় কিছুক্ষণ আটকে রাখা হয়। এভাবে আজ সেনাবাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসন মত প্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতার উপরও হস্তক্ষেপ করে চলেছে।

এমতাবস্থায় অচিরেই কোন গ্রেফতারি পরোয়ানা ব্যতীত গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য কর্তৃক জামিনে থাকা জুম্ম গ্রামবাসীদেরঅবৈধভাবে আটক করে সেনা জোনে নিয়ে মারধর ও জেলে প্রেরণের ঘটনা বন্ধ করা এবং আটককৃতদের অচিরেই বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা; বান্দরবানসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন ও রক্ষার স্বার্থে, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি দমনের নামে আইনের অপব্যবহার করে নিরপরাধ মানুষের উপর সেনা-পুলিশী নিপীড়ন বন্ধ করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী ক্যাম্প ও 'অপারেশন উত্তরণ' নামে সেনাশাসন প্রত্যাহার করা এবঙ অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো যথাযথ, দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করার দাবি জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেই সরকারেরঃ

পার্বত্য চুক্তির উল্টো পথে পার্বত্য মন্ত্রণালয়

বর্তমানে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেই। সাম্প্রতিক সময়ে চুক্তির কিছু বিষয়ে সরকারের যে উদ্যোগ ছিল সেগুলোও অনেকটা ডিপফ্রিজে রেখে দেয়া হয়েছে বলে কার্যত প্রতীয়মান হয়। যেমন গত বছর পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের পর ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক কাজ যথাযথভাবে শুরু করার নিমিত্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক ভূমি কমিশনের কার্যবিধিমালার খসড়া তৈরি করে ১লা জানুয়ারি ২০১৭ সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। বর্তমানে সেই খসড়া কার্যবিধিমালা ভূমি মন্ত্রণালয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। উক্ত কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত না হওয়ার কারণে বর্তমানে পার্বত্য ভূমি কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ শুরু করার প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। এছাড়া সরকার এখনো ভূমি কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, জনবল নিয়োগ এবং রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় শাখা অফিস স্থাপনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির উল্টো পথে হাঁটছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তার সর্বশেষ উদাহরণ হলো ইউএনডিপি'র পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে আমন্ত্রণ বা সম্পৃক্ত না করা। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে আমন্ত্রণ করা তো আরো দূরের কথা। অথচ উক্ত দু'টি অনুষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ফসল হিসেবে উঠে এসেছে।

গত ৯ জুলাই ২০১৭ ইউএসএইড ও ড্যানিডার অর্থায়নে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ বাস্তবায়নে ৫ বছর মেয়াদী ৩১ মিলিয়ন ডলারের 'পার্বত্য চট্টগ্রামের টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন (এসআইডি-সিএইচটি) প্রকল্প' উদ্বোধন করা হয় রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উক্ত পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে আমন্ত্রণ বা সম্পৃক্ত করা হয়নি। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে (যিনি প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন) নিমন্ত্রণ করা হয় একটি সাধারণ আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করে যা ছিল অনেকটা অপমানের সামিল। অথচ আইন অনুসারে যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব হচ্ছে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের এবং সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের এখতিয়ার হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের। উক্ত অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন প্রতিনিধি না দেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী, যিনি উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যাদের নিয়ে আজকে এই উন্নয়ন প্রকল্প সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে আমন্ত্রণ বা সম্পৃক্ত না করা কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল স্পিরিটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

গত ১৫ জুলাই ২০১৭ ঢাকার একটি হোটেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পালন হলো এ মন্ত্রণালয়ের ১৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ উপলক্ষে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কাজী গোলাম রহমান। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফসল এই পার্বত্য মন্ত্রণালয় হলেও এ চুক্তির অন্যতম পক্ষ জনসংহতি সমিতির কাউকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। এমনকি আমন্ত্রণ করা হয়নি পার্বত্য চুক্তির অন্যতম রূপকার ও স্বাক্ষরকারী, জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমাকে বা তাঁর কোন প্রতিনিধিকে। উক্ত আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হাসানুল হক ইনু এ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টির পেছনে যাদের নেতৃত্বে রক্তপিচ্ছিল সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও জনসংহতি সমিতির বর্তমান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার অবদান স্বীকার করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কোন মন্ত্রী-আমলা ভুলেও তাদের অমূল্য অবদানের কথা স্মরণ করেননি।

পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের ১৯তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত উক্ত আলোচনা সভায় পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-আমলারা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নের কোন বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য প্রদান করেননি। এ প্রসঙ্গে ক্ষোভ জানিয়ে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব কাজী গোলাম রহমান বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ১৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের এখনো কোন রোডম্যাপ নেই। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেছিলেন, চুক্তি বাস্তবায়নে রোডম্যাপ থাকবে না কেন? রোডম্যাপ ছাড়া এতবড় অর্জন এই চুক্তির বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া কখনোই সম্ভব নয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। হাই কোর্টের রায়ের

বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে চলমান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংক্রান্ত মামলা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগহীনতার জন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন, কেবল উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে একটা অঞ্চলের শান্তি নিশ্চিত করা যায় না। তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে স্বশাসন ও আইনের শাসনের মতো গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রক্রিয়াসমূহ। তিনি দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে চুপ থেকেছেন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আর চুপ থাকার সময় নয়। এখন এ বিষয়গুলো বলতে হবে এবং যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে বলে তিনি জোরালো অভিমত তুলে ধরেন। সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির উপর বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি নির্ভর করে। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়গুলোর উপর, বিশেষত: শান্তি ও উন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

উল্লেখিত দু'টি ঘটনার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ফলে গঠিত এই মন্ত্রণালয় এখন কার্যত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী ভুমিকা পালন করে চলেছে এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করছে। পার্বত্য চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে বলে বর্তমান সরকারের দেশে-বিদেশে যে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তা উঠে এসেছে এই মন্ত্রণালয়ের উর্বর মস্তিস্ক থেকে। প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং ও সচিব নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরার নেতৃত্বে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান এজেণ্ডা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম পক্ষ জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে এবং সমিতির নেতৃত্বাধীন বর্তমান অন্তর্বর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করে চলা এবং প্রকারান্তরে অর্থব করে ফেলা।

পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-আমলারা ক্লান্তিহীনভাবে পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমের ফিরিস্তির বুলি আওড়িয়ে চললেও পার্বত্য চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়নে তাদেরকে সরব ও তৎপর হতে দেখা যায় না। চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলোর মধ্যে বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর এবং এসব পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিতকরণ; পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণে আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের কার্যবিধিমালা চূড়ান্তকরণ এবং পর্যাপ্ত তহবিল ও জনবল বরাদ্দ পূর্বক ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিস্পত্তিকরণ; ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণসহ পুনর্বাসন; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ; চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি বাস্তবায়নে কোন উদ্যোগ ও চেষ্টা-চরিত্র লক্ষ্য করা যায় না। এমনকি সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে চলমান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংক্রান্ত মামলার কাজ এগিয়ে নিতে পার্বত্য মন্ত্রণালয়কে আশ্চর্যজনকভাবে নিশ্চুপ থাকতে দেখা যায়। এভাবে আজ পার্বত্য চুক্তির ফলে সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চুক্তির উল্টো পথে হাঁটছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

৩৮ পৃষ্ঠার পর

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রলয়ঙ্করী...

প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। এভাবে নির্বিচারে পাহাড় কেটে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে।

ভূমিধসের পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে লাগাতার তীব্র বজ্রপাতকেও অনেকে দায়ী করছেন। ১৩ জুন ভূমিধসের প্রাক্কালে টানা তীব্র বজ্রপাত ও মেঘের গর্জন হয়েছিল। তীব্র বজ্রপাত ও গর্জনের সময় মাটি কেঁপে উঠতো। এই ঝাঁকুনীর ফলে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে থাকা পাহাড় আলগা হয়ে পড়ে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যার ফলে এই প্রলয়ঙ্করী ভূমিধস ঘটে। তীব্র বজ্রপাত ও গর্জনের ফলে মাটি ক্ষেপে উঠা এবং তার ফলে ভিজে থাকা মাটি আলগা হওয়া- এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যতা পাওয়া না গেলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনেও অন্যান্যের মধ্যে এটি একটি কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ভূমিধসের পূর্বে ১১ জুন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৩৬৫ মিলিমিটার। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮৩ সালে ৪ আগষ্ট রাঙ্গামাটিতে বৃষ্টিপাত হয়েছিল ৩৩৫ মিলিমিটার, ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই বৃষ্টিপাত হয় ৩১৭ মিলিমিটার, ১৯৯৯ সালের ২৬ জুন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০৭ মিলিমিটার, ২০০৪ সালের ১১ জুলাই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৩৩৭ মিলিমিটার, একই বছরে জুন মাসে ২১ তারিখে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৩০৪ মিলিমিটার। আরো উল্লেখ্য যে, ভূমিধসে ২০০৭ সালের ১১ জুনে মারা যায় ১২৭ জন। ২০০৮ সালের ১৮ আগস্ট ভূমিধসে মারা যায় ১২ জন। ২০১১ সালে মারা যায় ১৭ জন। আর এই গত তিন বছর ভূমিধস হয়েছিল শুধু চট্টগ্রামে। আর ২০১২ সালে ২৬ ও ২৭ জুন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান ও সিলেটে ভূমিধসে মারা যায় ৯৪ জন। ২০১৫ সালে শুধু কক্সবাজারে ভূমিধসে মারা যায় ১৯ জন। আর এবার পাঁচ জেলায় মারা গেল প্রায় ১৭০ জন।

৬. ভূমিধসের প্রভাব

ভূমিধসে ঘরবাড়িসহ কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমি, প্রত্যক্ষ অঞ্চলে ফসলী জমি ও ফলজ বাগানের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ একশ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ অঞ্চলে শত শত একরের যে ফসলী জমি পাহাড়ি ঢলে কাদামাটি ভরাট হয়ে গেছে সেগুলো চাষোপযোগী করতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। ব্যাপক ফসল ও ফল-ফলাদি নষ্ট হওয়ার ফলে কয়েক মাস পর থেকে রাঙ্গামাটি জেলার জলেভাসা এলাকা ও বিভিন্ন উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যাভাব ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।

বিশেষ প্রতিবেদন

ভূষণছড়া ইউপির নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণে অপরাগতাঃ

ছোট হরিণা কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল পূর্বক পুন:নির্বাচনের দাবি

গত বছর জুনে অনুষ্ঠিত ভূষণছড়া ইউনিয়নের ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল পূর্বক পুন:নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভূষণছড়া ইউপির নবনির্বাচিত ৭ জন সদস্য শপথ গ্রহণে অপারগতা জানিয়ে বরকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিত মতামত ও দাবিনামা জমা দিয়েছেন গত সোমবার।

উল্লেখ্য যে, বিগত ৪ জুন ২০১৬ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র দখল করে জাল ভোটের মাধ্যমে ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুনকে অবৈধভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। তাই উক্ত ভোট কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল পূর্বক উক্ত ভোট কেন্দ্রের পুন:নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবি জানিয়েছেন এবং সেই সাথে উক্ত কেন্দ্রের পুন:নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণে অপরাগতা জানিয়েছেন গত ২৩/০৫/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচনে বিজয়ী নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ-

নাম ও পিতা/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড
সুরেশ কুমার চাকমা, পিতা সতীশ চন্দ্র চাকমা	১নং সাধারণ ওয়ার্ড
প্রীতি শংকর দেওয়ান, পিতা জ্ঞানেন্দু বিকাশ দেওয়ান	২নং সাধারণ ওয়ার্ড
জয়সেন কার্বারী, পিতা অখিল চন্দ্র কার্বারী	৩নং সাধারণ ওয়ার্ড
পাত্তর মণি চাকমা, পিতা কিনা চান চাকমা	৪নং সাধারণ ওয়ার্ড
হরি লাল চাকমা, পিতা কিনা মণি চাকমা	৯নং সাধারণ ওয়ার্ড
রিপনা চাকমা, স্বামী সমর বিজয় চাকমা	১নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড
জ্যোৎস্না চাকমা, স্বামী প্রতিময় চাকমা	২নং সংরক্ষিত ওয়ার্ড

২৩/০৫/২০১৭ তারিখ অনুষ্ঠিত বরকল উপজেলাধীন ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ উপনির্বাচনে তাদেরকে বিজয়ী ঘোষণা পূর্বক গত ২১/০৬/২০১৭ তারিখ নির্বাচন কমিশন গেজেট প্রকাশ করেছেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে ১০ জুলাই ২০১৭ তারিখে শপথ গ্রহণের জন্য বরকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া পারভিন ০২/০৭/২০১৭ মূলে তাদেরকে অবহিত করেন। ছোট হরিণা কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল পূর্বক পুন:নির্বাচনের দাবিতে নবনির্বাচিত উল্লেখিত সদস্যরা শপথ গ্রহণের অপরাগরতা জানিয়ে গত সোমবার বরকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে তাদের অভিমত ও দাবিনামা জমা দিয়েছেন। উক্ত লিখিত মতামত ও দাবিনামায় তারা উল্লেখ করেন যে,

যেহেতু ৪ জুন ২০১৬ বরকল উপজেলার ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০ লঙ্ঘন করে আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুন ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ৫০/৬০ জন বহিরাগত লোক দিয়ে কেন্দ্র দখল করে জাল ভোট প্রদান করেছেন;

যেহেতু মামুনুর রশিদ মামুনের প্রভাবে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, বরকল উপজেলা ও প্রিসাইডিং অফিসার, ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র, ভূষণছড়া ইউনিয়ন-এর সহযোগিতায় ও যোগসাজশে মো: আলতাফ হোসেন, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা ও রির্টার্নিং অফিসার, বরকল উপজেলা অবৈধভাবে ও নির্বাচন বিধিমালা লঙ্ঘন করে মামুনুর রশিদ মামুনকে ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছেন এবং হাই কোর্টে মামলা চলাকালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন মামুনুর রশিদ মামুনকে ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে অবৈধভাবে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন;

যেহেতু ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ৪ জুন ২০১৬ নির্বাচনের দিবসে সকালে ভোট গ্রহণ শুরু থেকে ছোট হরিণা জোনের জোন কম্যান্ডারের নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা ভোট কেন্দ্রে আসার পথে নিকটবর্তী স্থানে চেকপোষ্ট বসিয়ে পাহাড়ি ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্র তল্লাসীর নামে হয়রানি করে ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা প্রদান করে এবং উক্ত বিজিবি সদস্যদের সহায়তায় মামুনুর রশিদ মামুনের পক্ষে ৫০-৬০ জন বহিরাগত বাঙালি ভোট কেন্দ্র দখল করে পাহাড়ি ভোটারদের উপর হামলা চালায় এবং কেন্দ্রে দায়িত্বরত পোলিং এজেন্টদেরকে জোরপূর্বক বের করে দিয়ে ব্যালট বাক্স দখল করে জাল ভোট প্রদান করেছে;

যেহেতু উক্ত ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের ভোটার তালিকা অনুসারে ২,৭১২ জন ভোটারদের মধ্যে বিজিবির ১৮ ব্যাটালিয়নের ৩২৫ জন ভোটার ছিলেন এবং উক্ত ৩২৫ জন বিজিবি ভোটারসহ উক্ত ব্যাটালিয়ন ২০১১ সালে ভিন্ন জেলায় বদলি হয়ে গিয়েছেন, তাই বর্তমানে উক্ত কেন্দ্রে নির্বাচন চলাকালীন পাহাড়ি-বাঙালি মিলে মোট ভোটার রয়েছে ২,৩৮৭ জন। অথচ উক্ত কেন্দ্রে ভোট কাস্টিং দেখানো হয়েছে [আওয়ামীলীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী মামুনুর রশিদ মামুন ১,৬৬২ ভোট এবং স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা ৮৩৪ ভোটসহ] ২,৫৮১ টি, যা কেন্দ্রের মোট ভোটার থেকে ১৩১টি ভোট বেশি। এছাড়া কমপক্ষে ১৭ জনের অধিক ভোটার মৃত্যুবরণ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ব্যাপক জাল ভোট প্রদানের মাধ্যমে মামুনুর রশিদ মামুনকে অবৈধভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে;

যেহেতু মামুনুর রশিদ মামুনকে ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে অবৈধভাবে বিজয়ী ঘোষণা করার কারণে স্বতন্ত্র

চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা উক্ত ভোটকেন্দ্রের ভোট বাতিল করে পুন:নির্বাচনের দাবিতে গত ৪ জুন ২০১৬ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে আবেদন করেছেন এবং তৎপরবর্তীতে একই দাবিতে মহামান্য হাই কোর্টে রীট পিটিশন করেছেন; এছাড়া উক্ত নির্বাচন বাতিল করে পুন:নির্বাচনের দাবিতে নির্বাচন বিধিমালা অনুযায়ী ১০/০১/২০১৭ তারিখে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা কর্তৃক বিজ্ঞ নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ ২য় সিনিয়র সহকারি জজ আদালত, চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বর্তমানে উক্ত মামলার বিচার চলমান রয়েছে;

সেহেতু, ৪/০৬/২০১৬ বরকল উপজেলার ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের ছোট হরিণা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র দখল করে জাল ভোটের মাধ্যমে ৪নং ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে অবৈধভাবে বিজয়ী ঘোষিত মামুনুর রশিদ মামুনের সাথে কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তারা তাদের লিখিত মতামত ও দাবিনামা প্রধান নির্বাচন কমিশনার; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব; চট্টগ্রাম বিভাগের স্থানীয় সরকার পরিচালক; রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক; বরকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি জেলার স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক এবং রাঙ্গামাটি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার বরাবরেও অনুলিপি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, গত ৮ জুন ২০১৬ দীলিপ কুমার চাকমা সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এ্যাড. মো: ইদ্রিসুর রহমানের মাধ্যমে ঘটনার বিষয়ে তদন্ত ও উক্ত কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশনাসহ ন্যায়বিচার চেয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশন সচিবের বরাবরে উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন। এছাড়া ৯ জুন ২০১৬ দীলিপ কুমার চাকমা আবারও লিখিতভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে উক্ত ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানান। এরপর ১২ জুন ২০১৬ দীলিপ কুমার চাকমার পক্ষে এ্যাড. মো: ইদ্রিসুর রহমান সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দাখিল করেন। উক্ত রিট পিটিশনের ভিত্তিতে গত ১৬ জুন ২০১৬ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ নির্দেশনা প্রাপ্তির ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে দীলিপ কুমার চাকমার আবেদনের বিষয়ে মীমাংসা করার পরামর্শ দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশনা প্রদান করে। হাইকোর্টের এই নির্দেশনার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন মোঃ আব্দুল বাতেন, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, চট্টগ্রামকে দায়িত্ব দিয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে। উক্ত তদন্ত কমিটি ২৬ জুন ২০১৬ বরকল উপজেলা সদরে গিয়ে দিনব্যাপী তদন্ত কাজ চালায়। তদন্ত কাজের স্বার্থে এলাকার জনসাধারণ ও জনসংহতি সমিতি হাট-বাজার বর্জন ও সড়ক-জলপথ অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত তদন্ত কমিটি তার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। এমনকি চেয়ারম্যান প্রার্থী দীলিপ কুমার চাকমা নির্বাচন কমিশনের বরাবরে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির আবেদন জানালেও তিনি কোন সদুত্তর পাননি।

তবে ১৬ জুলাই ২০১৬ অন্যান্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত ঘোষিত চেয়ারম্যান-মেম্বারগণের সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হলেও ভূষণছড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার নির্বাচনের গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়। এতে নির্বাচন কমিশন ও তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভূমিকা নিয়ে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু উচ্চ আদালতের মামলা প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ পূর্বক স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে গত ১০ নভেম্বর ২০১৬ নির্বাচন কমিশন উক্ত ইউনিয়নের ওয়ার্ড মেম্বার ও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারদের গেজেট প্রকাশ করলে জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এভাবে অসঙ্গতিপূর্ণভাবে গেজেট প্রকাশের পর গত ২৮ নভেম্বর ২০১৬ উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা সুমনী আক্তার উক্ত মেম্বারদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে ইউনিয়নের ৫ জন মেম্বার শপথ গ্রহণ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বাকি ৭ জন মেম্বার ওই শপথ গ্রহণ প্রত্যাখান করেন। এরপর ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ নির্বাচন কমিশন একই কায়দায় জনগণের ব্যাপক ভোট জালিয়াতির অভিযোগ, তদন্ত কমিটির ফলাফল, উচ্চ আদালতের নির্দেশনা ও স্বচ্ছতাকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে মামুনুর রশিদ মামুনের নামে গেজেট প্রকাশ করেন। আর জেলা প্রশাসক কোন কিছু বাছবিচার না করে অনেকটা তাড়াহুড়ো করে গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৬ মামুনুর রশিদ মামুনকে ডেকে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং বৈধ চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষণা দেন। নির্বাচন কমিশন ও জেলা প্রশাসনের সর্বশেষ এই অস্বচ্ছ ও পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকায় জনমনে সৃষ্টি হয়েছে গভীর আস্থাহীনতা, হতাশা ও ক্ষোভ। ভূষণছড়ার মত প্রত্যন্ত একটি ইউনিয়নের একটি মাত্র কেন্দ্র নিয়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও সরকার, নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন যে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে পারে না তাতে এই রাষ্ট্র ও সমাজের গভীর অসুস্থতাকেই ফুটিয়ে তোলে। এটি সরকারি দল ও প্রশাসনের 'বিচার মানি কিন্তু তাল গাছ আমার' এই নীতিই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পাহাড়ধস

১৩১ জন নিহত, ২২৭ জন আহত ও প্রায় ২০,০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

তীব্র বজ্রপাত ও মেঘের গর্জনসহ কয়েকদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টির ফলে গত ১৩ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় ব্যাপক পাহাড় ধস ঘটে। এর ফলে কেবল রাঙ্গামাটি জেলায় ১২১ জনসহ বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় কমপক্ষে ১৭০ লোকের প্রাণহানি ঘটে। এর পাশাপাশি ২২৭ জন আহত হয় বলে জানা যায়। এছাড়া রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় পাহাড় ধসের ফলে হাজার হাজার একরের বাগান-বাগিচা, ধান্য জমি ও ফসল, বসতভিটার ক্ষতি হয়। তিন পার্বত্য জেলায় ভূমিধস ও পাহাড়ী ঢলের আঘাতে যে প্রলয়ঙ্করী ঘটনা ঘটেছে তাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাঙ্গামাটি শহর এলাকা। প্রশাসনের তালিকা অনুসারে রাঙ্গামাটি জেলার মধ্যে রাঙ্গামাটি পৌরভাসহ রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি, রাজস্থলী ও নানিয়ারচর উপজেলায় ১২,৪৫০ পরিবারসহ তিন পার্বত্য জেলায় প্রায় ২০,০০০ পরিবার ক্ষতির শিকার হয় বলে জানা যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ একশ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমিসহ প্রত্যক্ষ অঞ্চলে ফসলী জমি ও ফলজ বাগানের ব্যাপক ক্ষতির ফলে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

১. রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষয়ক্ষতি

মুষলধারে বৃষ্টি ও ভূমিধসের ফলে রাঙামাটি জেলাতেই ১৪৫টি স্থানে পাহাড়ে ধস হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি শহরের সাথে চট্টগ্রাম সড়ক, খাগড়াছড়ি সড়ক ও কাপ্তাই সড়ক এবং ঘাগড়া-বরইছড়ি সড়কের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এর মধ্যে রাঙামাটি-চট্টগ্রামসড়কের ২০ কিলোমিটারের প্রায় ৫০টি স্থান নজিরবিহীনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। সাপছড়ি এলাকায় ব্যাপক ভূমিধসে সাপছড়ি শাল বাগান এলাকায় ১৫০ ফুট নিচে দেবে যায় ও রাস্তা অকেজো হয়ে পড়ে। মঘাইছড়ি থেকে রাঙামাটি শহরের মানিকছড়ি পর্যন্ত সড়কের দুই পাশের এবং নিকটবর্তী অন্তত ১৬টি পাহাড়ের ভয়াবহ ধসজনিত ফাটল দেখা যাচ্ছে। সড়কটির অন্তত ২৫টি অংশের অর্ধেক ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। রাঙ্গামাটি জেলায় অনেক বিদ্যুৎ খুঁটি ভেঙ্গে যায়। ফলে পাঁচদিন পর্যন্ত রাঙ্গামাটি জেলা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে।

রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের কুতুকছড়ি ইউনিয়নের খামার পাড়ায় রাস্তা দেবে যাওয়াসহ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। ফলে রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের সাথে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। জরুরী ভিত্তিতে রাঙ্গামাটি থেকে কাপ্তাই জলপথে লঞ্চ সার্ভিস চালু করা হয় এবং কাপ্তাই-চট্টগ্রাম সড়কের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও ঢাকার সাথে যোগাযোগের সাময়িক বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার ফলে ভূমিধস পরবর্তী কয়েক দিনে রাঙ্গামাটি শহরে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের ব্যাপক অভাব দেখা দেয়। বিশেষ করে জ্বালানী তেলের সংকট দেখা দেয়। বাজারে যে পরিমাণ রয়েছে এর মূল্য দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যায়। সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকার ফলে সৃষ্ট দ্রব্যমূল্যের প্রভাব জেলাধীন অপরাপর উপজেলাগুলোয়ও বিপর্যয় নেমে আসে।

রাঙ্গামাটি জেলার মধ্যে ভূমিধসে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় ৫ জন সেনাসদস্যসহ ৭৪ জন, কাউখালীতে ২১ জন, কাপ্তাইয়ে ১৮ জন, জুরাছড়িতে ৬ জন ও বিলাইছড়ি উপজেলায় ২ জনের মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। তার মধ্যে পাহাড়ী ৬১ জন ও বাঙালি ৬০ জন। রাঙ্গামাটি জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাঙ্গামাটি

শহর এলাকা। রাঙ্গামাটি জেলা শহরে শত শত মানুষের ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আনুমানিক কমপক্ষে ২,০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। রাঙ্গামাটি পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ডের কেবল ভেদভেদী, রাঙ্গাপানি, মোন আদাম, উদন্দী আদাম, মোনঘর এলাকায় মাটি চাপা পড়ে ২২ জন জুম্ম নিহত হয় এবং ২০৭ জুম্ম পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব এলাকায় ঢালু পাহাড়ের ভূমিও ধসে পড়ে। ফলে শত শত একরের ফলজ ও বৃক্ষ বাগান ধ্বংস হয় এবং ধসে পড়া মাটির ফলে পাহাড়ের লাগোয়া শত শত একরের ধান্যজমি ভরাট হয়ে যায়, যা চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়া ৫নং ওয়ার্ডের খিপ্যা পাড়া, তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া, বিলাইছড়ি পাড়া, আসামবস্তী ইত্যাদি গ্রামের ১৪১ পরিবার এবং ৯নং ওয়ার্ডের ভালেদী, বিহারপুর, উলুছড়া ইত্যাদি এলাকায় ব্যাপক ভূমিধসের ফলে ১৪২ পরিবারের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের ঘরবাড়ি বসবাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। পাহাড় ধসে রাঙ্গামাটিতে বাংলাদেশ টেলিভিশন উপকেন্দ্র, বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি উপকেন্দ্র, পাসপোর্ট অফিস, ডিসি বাংলো, এসপি বাংলো, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, সার্কিট হাউস, রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ইনস্টিটিউটের জাদুঘর ও ডরমিটরি ভবন, সমাজসেবা কার্যালয়, এলজিইডি অফিস, ফিশারি ঘাট, মৎস্য ভবন বাংলোসহ শত কোটি টাকার গুরুত্বপূর্ণ অন্তত ১৫টি স্থাপনা নিয়ে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলার আওতাধীন দশটি উপজেলায়ও ভূমিধসে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে রাঙ্গামাটি সদর, কাউখালী, কাপ্তাই, জুরাছড়ি, বিলাইছড়ি ইত্যাদি উপজেলায় ঘরবাড়ি, শত শত একরের ফলজ ও বৃক্ষ বাগান এবং ফলসী জমির ক্ষতি হয়। টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের কারণে কাপ্তাই হ্রদের উজানে পানি বেড়ে যায়। ফলে কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা হাজার হাজার একরের ফসল পানিতে ডুবে যায়। রাঙ্গামাটি উপজেলাধীন ৬টি ইউনিয়নে ১৯১টি বাড়ি সম্পূর্ণ ও ৩৭৪টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং ৩,৫৪৩ পরিবারের ফসল, বাগান-বাগিচা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাউখালী উপজেলা প্রশাসনের মতে ৪টি ইউনিয়নে ১,৬৯৭ পরিবারের ঘরবাড়ি, ফসল, বাগান-বাগিচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ উপজেলার লেবাপাড়া, চম্পাতলী, দেওয়ানপাড়া ও জুনুমাছড়া এলাকা, সন্দ্বীপ কলোনি, বেতছড়ি ও কচুখালীতে ব্যাপক ক্ষতি হয়। কাপ্তাই উপজেলা প্রশাসনের তালিকা অনুযায়ী কাপ্তাই, চিৎমরম, ওয়াগ্গা ও রাইখালী ইউনিয়নে ৬৭৭ পরিবার ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। কাপ্তাই উপজেলার বরইছড়ি, চিৎমরম, ঢাকাইয়া কলোনী, ওয়াগ্গা, চন্দ্রঘোনা, রাইখালীসহ বিভিন্ন স্থানে দুই শতাধিক পরিবারের বসতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ওয়াগ্গা ইউনিয়নের দেবেতাছড়ি পাহাড়ের (মোন) বিরাট অংশ ধসে পড়ে।

জুরাছড়ি উপজেলা প্রশাসনের তথ্য মতে জুরাছড়ি, দুমদুম্যা ও মৈদুং ইউনিয়নে ৫৯৩ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনসংহতি সমিতি সংগৃহিত তথ্য অনুসারে জুরাছড়ি ইউনিয়নে ৬৪টি, বনযোগীছড়া ইউনিয়নে ১২টি, মৈদুং ইউনিয়নে ১৫টি ও দুমদুম্যা ইউনিয়নে ২৩টি পরিবারের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জুরাছড়ি ইউনিয়নের ঘিলাতলী গ্রাম পাহাড়ী ঢলে ভরাট হয়ে যায় এবং ৩৯টি পরিবারের ঘরবাড়ি কাদা মাটিতে তলিয়ে যায়। বিলাইছড়ি উপজেলায় বিলাইছড়ি, ফারুয়া ও কেংড়াছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের তালিকা অনুসারে ৩টি ইউনিয়নে ২,০৩৩ পরিবারের ঘরবাড়ি, বাগান-বাগিচা, ধান্যজমির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে ব্যাপক ভূমিধসে ফারুয়া ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে।

রাজস্থলী উপজেলায় গাইন্দা ও ঘিলাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের তালিকা অনুসারে দুটি ইউনিয়নে ভূমিধস ও প্রবল বৃষ্টিতে ৪৫৩ পরিবারের ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তির ক্ষতি হয়। উপজেলায় রাজস্থলী বাজারের সাথে যে সব এলাকার সহজে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে রাস্তা ব্লক হয়ে যায়। রাজস্থলী সদরে খালের কিনারায় অবস্থিত টিএন্ডটি পাড়া, পুরানো থানার এলাকা, হেডম্যান পাড়া, খাগড়াছড়িপাড়া, কুটির শিল্পপাড়া, অনগ্রীনা পাড়াসহ অনেক বসতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। নানিয়ারচর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের তথ্য অনুসারে ৮৮৯ পরিবারের ঘরবাড়ি, বাগান-বাগিচা, ধান্যজমির ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উপজেলা	নিহত	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা
রাঙ্গামাটি উপজেলা (পৌরসভা)	৬১	২,০০০
রাঙ্গামাটি উপজেলা (ইউপি)	১৩	৪,১০৮
কাউখালী উপজেলা	২১	১,৬৯৭
কাপ্তাই উপজেলা	১৮	৬৭৭
জুরাছড়ি উপজেলা	৬	৫৯৩
বিলাইছড়ি উপজেলা	২	২,০৩৩
রাজস্থলী উপজেলা	-	৪৫৩
নানিয়ারচর উপজেলা	-	৮৮৯
মোট	১২১	১২,৪৫০

২. বান্দরবান জেলার ক্ষয়ক্ষতি

১৩ জুনের পাহাড় ধস ও প্রবল বৃষ্টিতে বান্দরবান সদর ইউনিয়ন ও পৌরসভা এলাকায় ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বান্দরবান শহরের লেমুঝিরি, কালাঘাটা, বড়ুয়ার টেক, পাইনসি ঘোনা, রাজার গোদা, গর্জনিয়া পাড়াসহ বিভিন্ন দুর্গম পাড়ার বসতিগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে। বিভিন্ন সড়কের কিনারের খাড়া পাহাড়ে বসবাসকারী দুই শতাধিক পরিবারের বসতি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। জেলায় পাহাড় ঘেঁষে বসবাস করা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের সংখ্যা ১৪৪টি। এ ছাড়া কম ঝুঁকিপূর্ণ আরও প্রায় একশ পরিবার সড়কের কিনারে বসবাস করছে। প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধসে সারাদেশের সঙ্গে বান্দরবান জেলার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। লামা, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ির বিদ্যুত বিতরণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

৩. খাগড়াছড়ি জেলার ক্ষয়ক্ষতি

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি ও রামগড়ে পাহাড়ধসে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ১৪ ও ১৮ জুন পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে। জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, সদর উপজেলা ছাড়াও মানিকছড়ি, রামগড় ও মহালছড়িতে পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকি নিয়ে লোকজন বসবাস করছে। খাগড়াছড়িতে টানা বর্ষণে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। বন্যার পাশাপাশি টানা বর্ষণের ফলে জেলা সদরসহ বিভিন্ন

উপজেলায় পাহাড়ধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাহাড়ধস এবং বন্যার ফলে দীঘিনালা উপজেলার অনেক গ্রাম বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। খাগড়াছড়ি শহরসহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারী প্রায় দুই হাজার পরিবারের বসতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পাহাড়ধস এবং বন্যার ফলে উপজেলার ৬টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এসব আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় দুই শতাধিক পরিবার আশ্রয় নিয়েছে।

৪. সরকারি পদক্ষেপ ও সহায়তা

রাঙ্গামাটি শহরে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ১৯টি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তার মধ্যে ৬ নং ওয়ার্ডে জুম্মদের ৭টি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে যে ত্রাণ ও আর্থিক সহায়তা এ পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে তা একেবারে অপর্যাপ্ত। ঘরবাড়ি হারানো শত শত মানুষ পুনরায় নতুন করে কখন বসতবাড়ি পাবে বা নিজেরা করবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

১৪ জুন যোগাযোগ মন্ত্রী ও আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়েদুল কাদের ও ত্রাণ মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন মায়া ভূমিধসে বিধ্বস্ত রাঙ্গামাটি সফর করেন। এসে তিনি সার্কিট হাউজ থেকে সরাসরি মানিকছড়িতে মাটি চাপায় ৫ সেনাসদস্য নিহত স্থল পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে সেটেলার অধ্যুষিত শিমূলতলী এলাকা পরিদর্শনের পর রাঙ্গামাটি হাসপাতালে যান। তারপর রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মিটিং করে ঢাকায় চলে যান। এ সময় তিনি নিহত প্রতিজনকে ২০ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন। শিমূলতলী এলাকা পরিদর্শনের পর জুম্ম অধ্যুষিত ভেদভেদী-মোনঘর এলাকা যেখানে ব্যাপক ভূমিধসে কমপক্ষে ২২ জন জুম্ম নিহত হয়েছে তা পরিদর্শনের জন্য রাঙ্গামাটি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রীতা চাকমা যোগাযোগ মন্ত্রী ওবায়েদুল কাদেরকে অনুরোধ করেন। 'সময় নেই, সেনাবাহিনীকে বলে যাচ্ছেন দেখার জন্য' এই বলে তিনি জুম্ম অধ্যুষিত ভেদভেদী-মোনঘর এলাকা পরিদর্শন না করে সরাসরি হাসপাতালে চলে যান।

রাঙ্গামাটি শহরের দুর্যোগ মোকাবেলায় কোন সমন্বয় নেই বলে পরিলক্ষিত হয়। ত্রাণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়টি সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানের এখতিয়ার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের হলেও সরকারের রাঙ্গামাটি ভূমিধস দুর্যোগ মোকাবেলা ও ত্রাণ সহায়তায় আঞ্চলিক পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। এমনকি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও রাঙ্গামাটি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানকে ভূমিধস সংক্রান্ত জেলা প্রশাসনের কোন সভায় ডাকা হয়নি। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গঠিত 'ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং তার অধীনে বিভিন্ন উপকমিটিগুলো মূলত ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এভাবে ব্যাপক দলীয়করণের ফলে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রণয়ন, ত্রাণ বিতরন, আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা, ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপত্তা বিধানের কাজে ব্যাপক অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতা লক্ষ্য করা যায়। সরকার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে নিহতদের জন্য ২০,০০০ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫,০০০ টাকা বিতরণ করেছে। অপরদিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদও নিহতদের জন্য জনপ্রতি ২০,০০০ টাকা ঘোষণা করলেও কেবল দলীয় সমর্থক ক্ষতিগ্রস্তদেরকে বেছে বেছে উক্ত টাকা বিতরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫. ভূমিধসের কারণ

গত ২০ জুন ২০১৭ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় প্রলয়ঙ্করী প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও ভূমি ধসের কারণ খুঁজতে ২৭ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির আহ্বায়ক হলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। কমিটিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি, স্থানীয় সরকার, ফায়ার সার্ভিস, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিসহ পাঁচটি জেলার জেলা প্রশাসককে রাখা হয়েছে। কমিটিকে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। আশচর্যের বিষয় যে, উক্ত কমিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন প্রতিনিধি রাখা হয়নি।

জানা যায় যে, ঝুঁকি রয়েছে এমন এলাকাগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা তিন পার্বত্য জেলার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। তাই পাহাড়ধসে প্রাণহানি ঠেকাতে প্রশাসনের সামগ্রিক প্রস্তুতিও ছিল না। শুধু বর্ষা মৌসুমের আগে প্রতি জেলায় পৃথকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করা হয়। এবার তিন পার্বত্য জেলার দুটিতে সেই তালিকাও করা হয়নি। প্রায় এক দশক ধরে পার্বত্য এলাকায় নিয়মিত ভূমিধস হচ্ছে। এ জন্য আশির দশক থেকে শুরু হওয়া যত্রতত্র বসতি স্থাপন ও বন উজাড়কে মূলত দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পার্বত্য এলাকায় এই নজিরবিহীন ভূমিধসের পেছনে নানা কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হিসেবে ভাবা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক বনজ সম্পদ উজার, প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করে বনবিভাগ কর্তৃক সেগুন বাগান সৃষ্টি করা ও বহিরাগতদের নিকট ব্যাপক পাহাড়ভূমি লীজ দিয়ে নির্বিচারে রাবার বাগান গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত আরেকটি কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে আশি দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে চার লক্ষাধিক সেটেলার বাঙালি বসতি প্রদান করা এবং তাতে করে ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ পড়ে। তৃতীয়ত: সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ভূমি বেদখল ও সাম্প্রদায়িক হামলার কারণে জুম্মদের তাদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার ফলে এবং সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের পুনর্বসান না হওয়ার কারণে রাঙ্গামাটি শহরে জুম্মদের বসতি স্থাপন ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘরবাড়ি নির্মাণও অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। চুতর্থত: এর ফলে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে পাহাড় কেটে অপরিকল্পিত বাড়ি নির্মাণ ও রাঙ্গামাটি শহরে প্রশাসনের ইন্ধনে সেটেলার বাঙালিদের পাহাড়ের পাদদেশে ঝুঁকিপূর্ণ বসতি গড়ে তোলা ইত্যাদি অন্যতম কারণ বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। পঞ্চমত: আইন প্রয়োগের অভাব। প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবাধে পাহাড়া কাটা হলেও

বাকী অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

সাজেকে খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষদের ত্রাণ বিতরণঃ

প্রয়োজন ৬ মাসের রেশন বাবদ প্রায় ১০,০০০ মেট্রিক টন চাল

'মানবতা সেবাই হোক আমাদের আদর্শ, সাজেকের দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান'- এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে সাজেক ত্রাণ সহায়তা কমিটির উদ্যোগে গত ৩১ মে ২০১৭ সাজেকের দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকায় অসহায় মানুষের মানবতার সেবায় প্রায় ৬৬৫ পরিবারের কাছে চাল বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে ২০ কেজি করে ১৩.৩ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগরের জুম্ম শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী, সিলেটের মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নরত জুম্ম শিক্ষার্থী, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী, রাঙ্গামাটিতে জুম্ম শিক্ষার্থীবৃন্দ ও রাঙ্গামাটির সর্বস্তরের জনসাধারণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তত্ত্বাবধানে রাঙ্গামাটি শহরের প্রতিটি এলাকা, রাঙ্গামাটি সদর থানাস্থ বালুখালী, মগবান, বন্দুকভাঙা, জীবতলী, সাপছড়ি ৫টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ প্রতিটি ইউনিয়নের জনসাধারণ এবং নান্যাচর উপজেলা হতে সাজেকের দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের জন্য এই ত্রাণ সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন।

সাজেক ত্রাণ সহায়তা কমিটির চাল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন বাঘাইছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সহ সাধারণ সম্পাদক ত্রিদীপ চাকমা, সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জৈববোই তাং ত্রিপুরা, বাঘাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুনীল বিহারী চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্টাফ সদস্য বাচ্চু চাকমা প্রমুখ। সাজেক পাহাড়ের দুর্গম এলাকা থেকে একদিনের পথ হেঁটে ত্রাণ সংগ্রহ করতে এসেছেন দুর্ভিক্ষ কবলিত অনেক অসহায় মানুষ। তাদেরকে দেখে বুঝা যায় যে, চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে এক ধরনের অসহায়ত্ব চিহ্ন। দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের করুণ আর্তনাদ ও হাহাকারের নির্মম চিত্র দেখে মানবতা গুমরে কেঁদে উঠেছে।

এছাড়া চাকমা রাজপরিবারের উদ্যোগে গত ৫-৬ জুন ২০১৭ তারিখে সাজেকে দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রামবাসীদেরকে ত্রাণ সহায়তা বিতরণ করা হয়। ত্রাণ হিসেবে ২২ মেট্রিক টন চাল, ৯ কুইন্টাল চিদোল, ৯ কুইন্টার লবণ, ঔষধ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। অন্যান্যের মধ্যে ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণ করেন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন সদস্য নিরূপা দেওয়ান, চাকমা রাণী য়েন য়েন, দীঘিনালা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নব কমল চাকমা প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমপক্ষে ৪৫টি গ্রামে খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ৫০টি গ্রামের ২,৫০০ পরিবারের প্রায় ১৫,০০০ আদিবাসী জুম্ম গ্রামবাসী এই খাদ্য সংকটের শিকার রয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সাজেক ইউনিয়নের উদোলছড়ি, নতুনজৌপুই, পুরান জৌপুই, নিউথাংমাং, নিউলংকর, ব্যাটালংপাড়া, ব্যাটলিং তারুংপাড়া, কমলাপুর, লংত্যাং, অরুণপাড়া, কাছ্যাপাড়া, শিয়ালদাই, গন্ডাছড়া, থলছড়া, এগাজ্যাছড়ি, মোন আদাম, ধাব আদাম, কলকপাড়া, বাদলছড়ি, নিমুইপাড়া, হাগড়াকেজিং, দুলুছড়ি, দুলবন্যাসহ প্রভৃতি গ্রামে খাদ্য সংকট চলছে। এছাড়া খাদ্যসংকটের সম্মুখীন হয় বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের দুর্গম এলাকার ৩০০ পরিবার জুম্ম গ্রামবাসী।

সাজেক একটি আদিবাসী জুম্ম অধুষিত অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চল। এই এলাকায় জুম্ম অধিবাসীরা মূলত জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। জুম চাষ করে বড়জোর তারা ৬ থেকে ৯ মাসের খাদ্য যোগাড় করতে পারে। বাকি ৩ থেকে ৬ মাস তাদের মধ্যে খাদ্য সংকট বা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে এই খাদ্য সংকট জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত চলতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের দিকে জুমের ধান পাকলে ধীরে ধীরে এই খাদ্য সংকট কেটে যায়।

আরো উল্লেখ্য যে, গত বছর জুম চাষে তেমন ভালো ফসল হয়নি।

এবার তীব্রভাবে সংকটহওয়ার কারণ হচ্ছে জুমের ফসল কম হওয়া। ফলে জুমচাষী পরিবারগুলোতে ৩ মাস ধরে খাদ্য সংকট চলছে। পাহাড়ের পাদদেশে জুম চাষ, বাঁশও বনজ সম্পদ আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে সাজেকের দুর্গম গ্রামগুলোর বাসিন্দারা। কিন্তু এ বছর জুম চাষে বিপর্যয় হওয়ায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস হ্রাস পাওয়ায় প্রাক-বর্ষা মৌসুম থেকে সাজেকের কমপক্ষে ৫০টি দুর্গম গ্রামে আর্থিক অভাব দেখা দিয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে খাদ্যে। খাদ্যের অভাবে দুর্গম গ্রামেরমানুষগুলো কলা গাছের নরম অংশ খেয়ে আছে বলে শোনা যাচ্ছে। এ সংকটে সবচেয়ে বেশি ভুগছে নারী ও শিশুরা।

সাজেকের অধিকাংশ গ্রামে এখনও পর্যন্ত সড়কযোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। যার কারণে পায়ে হাঁটা পথে মাচালং বাজার থেকে কোন পণ্য ক্রয় করে এসব গ্রামে নেয়া পর্যন্ত খরচ পড়ে ক্রয় মূল্যের তিনগুণ। যার কারণে সাজেকের অধিকাংশ গ্রামের মানুষ খাদ্য ক্রয় করতে পারছে না। এতে করে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। বেশিরভাগ মানুষ পাহাড়ী জঙ্গলের আলু ও কলাগাছ খেয়ে অনাহারে অর্ধাহারে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন। তাছাড়া বাঘাইছড়ি সদর ও খাগড়াছড়ি থেকে চাল নিয়ে সেখানে প্রতি কেজি ৪০-৫০ কেজির চাল বিক্রি করা হচ্ছে ৯০-১১০ টাকায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় রাঙ্গামাটি জেলার সাজকের প্রান্তিক এলাকার ২০-২৫ পরিবারের জন্য যারা গত তিন মাস ধরে খাদ্য সংকটে ভূগছে তাদের জন্য ১০ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অতীব নগণ্য। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ইতোমধ্যে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে অবগত করেছে। বাঘাইছড়ি উপজেলা প্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব উদ্যোগে গত ২২ এপ্রিল গ্রামবাসীদের মধ্যে কিছু চাল বিতরন করেছে কিন্তু তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমা মন্তব্য করেন "আমাদের আরো খাদ্য সহযোগিতা প্রয়োজন। যদি সরকার দ্রুত এবং আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে না আসে তাহলে গ্রামবাসীরা মারা যাবে। এই বছরের পরিস্থিতি আরো অবনতিব দিকে যেতে পারে যদি জরুরি ভিত্তিতে ভূক্তভোগী এলাকাগুলোতে খাদ্য ত্রাণ বন্টন করা না হয়।" সাজেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নেলসন চাকমা বলেন, "গত ২১ এপ্রিল ২০১৭ স্থানীয় প্রশাসন প্রতি ৪১০ পরিবারকে ১০ কেজি করে চাল বন্টন করা হয়েছে। তাদের জন্য আরো ৬০০-৭০০ টন খাদ্যের বরাদ্দ চেয়েছি।" তবে বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ এলাকাসহ সাজেক ইউনিয়নের ২,৮০০ পরিবারের কমপক্ষে ৬ মাসের খোরাকীর জন্য সর্বসার্কুল্যে প্রায় ১০,০০০ মেট্রিনটন চাল প্রয়োজন হতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম আদিবাসীরা ২০০৭ সালে ইঁদুর বন্যার শিকার হয় এবং এর ফলে খাদ্য সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর তাদের জমিতে এবং মুজদকৃত শস্যের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। আবার ২০১২ সালে রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক, বাঘাইছড়ি, বিলাইছড়ি ও জুরাছড়ি উপজেলা এবং বান্দরবান জেলার থানছি ও রুমা উপজেলায় পাহাড়ী আদিবাসীদেরকে খাদ্য সংকট আঘাত হানে। প্রায় ৬৫০০ আক্রান্ত পরিবার একই সময়ে ৬ মাস ধরে ত্রাণের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। এরপর ২০১৩ সাল হতে গত বছর পর্যন্ত থানছি উপঝেলা প্রান্তিক অনেক জুমিয়া পরিবার খাদ্য সংকটের মুখোমুখী হয় এবং তাদের বাস্তুভিটা ছেড়ে আরো গভীর অরণ্যে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। হেলিকপ্টার যোগে এই এলাকাগুলোয় তাদেরকে খাদ্য শস্য সরবরাহ করে।

বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় সংসদে ঊষাতন তালুকদার এমপির ভাষণ

লংগদু অগ্নিসংযোগে ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবি

লংগদুতে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যোগসাজশে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, ঘরবাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এবং দ্রুততার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার। গত ৫ জুন ২০১৭ জাতীয় সংসদে ২০১৬-২০১৭ সালের সম্পূরক বাজেটের উপর আলোচনা চলাকালে পয়েন্ট অব অর্ডারে প্রদত্ত বক্তব্যে তিনি এ দাবি জানান। নিম্নে ঊষাতন তালুকদারের উক্ত বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরীঃ মাননীয় সদস্য জনাব ঊষাতন তালুকদার, পার্বত্য রাঙ্গামাটি; আপনি পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলতে চেয়েছিলেন, এখন বলতে পারেন।

ঊষাতন তালুকদার এমপিঃ মাননীয় স্পীকার, ২০১৬-২০১৭ সম্পূরক বাজেটের উপর আলোচনার পাশাপাশি, আমাকে আমার এলাকার কিছু সমস্যা বিষয়ে বলার জন্য সময় দেয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পয়েন্ট অব অর্ডারে বলছি, গত ১লা জুন নয়ন নামে লংগদুর স্থানীয় বাসিন্দা, যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, আবার উনি মোটর সাইকেলেরও চালক যাত্রী নিয়ে নাকি উনি খাগড়াছড়ি গিয়েছিলেন। কিন্তু ১ তারিখে দুপুরে খাগড়াছড়ির চার মাইল এলাকা, কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের পাশে উনার লাশ পুলিশ পেয়েছে। তারপরের দিন ২রা জুন ভোরে লংগদুর বাত্যাপাড়ায় তাঁর মরদেহ আনা হয়েছিল। আনার পরে মরদেহ নিয়ে লংগদু উপজেলা সদরের মাঠে জানাজা হবে সেই উদ্দেশ্যে মিছিল শুরু হয় সাড়ে নয়টা থেকে। মিছিল যখন পাহাড়ী গ্রাম তিনটিলা গ্রামে পৌঁছলে, তখন পাহাড়ীদের ঘরেবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। এরপরে এটা স্বয়ং আমি নিজে এবং আমার প্রতিনিধি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসন মহলে জানিয়েছিলাম। আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উনার সাথেও কিছুক্ষণ আগে আলাপ হয়েছিল, উনিও নাকি জানিয়েছিলেন।

বিষয়টি হলো, যে বা যারা সেই নয়নকে হত্যা করুক না কেন তার জন্য আমি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি এবং দোষী যে বা যারা হোক না কেন অবিলম্বে তাদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে, এই সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করে সেই মিছিলে দুর্বৃত্তরা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থেকে পাহাড়ীদের গ্রামে উদ্দেশ্যমূলক ও পূর্বপরিকল্পিতভাবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। সেজন্য ঐখানে এখন এলাকাবাসীর প্রায় দুই শ'র অধিক ঘরে আগুন লাগিয়েছে। দোকানপাটেও আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং লোকজন এখনও আশ্বস্ত হতে পারছে না। আজকে লংগদুতে ডিআইজি সাহেব, বিভাগীয় কমিশনার সাহেব গেছেন পরিদর্শনে। ওখানে এখনো পর্যন্ত লোকজন আস্থা রাখতে পারছে না। চরম নিরাপত্তাহীনতায় এই ঝড়বাদলের দিনে, বৃষ্টির দিনে ওরা এখন সেই বনে-বাঁদাড়ে, ঝাড়ে-জঙ্গলে বসবাস করছে। এই ঝড়-বাদলের দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ছে অনেকেই, বিশেষ করে শিশু-বৃদ্ধরা।

এমতাবস্থায় যেটা লক্ষ্য করা গেছে, দুর্বৃত্তরা মূলত সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্যে এবং এলাকায় অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব ঘটনা ঘটানো হয়ে আসছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। বিগত ১৯৮৯ সালের ৪ঠা জুনেও ঐ লংগদুতে এই ধরনের একটা হামলা হয়েছিল। তাই আজকের এই মহান সংসদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে আমি বিশেষত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মন্ত্রী পরিষদসহ, মাননীয় স্পীকার আছেন, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আসুন, এই যে যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে এদেরকে, সরকারের তো তাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে, এদেরকে প্রতিহত করার জন্য, তারা যাতে কোন অবস্থাতেই আর এধরনের কার্যকলাপ করতে না পারে, দেশকে অস্থিতিশীল করতে না পারে, সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে না পারে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

আমি মনে করি যে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া দরকার। পাশাপাশি আমাদের মহান সংসদ থেকে একটা সংসদীয় দল সেই সংঘটিত এলাকায়, দুর্ঘটনা কবলিত এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন

করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আর ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ীদের যে নিরাপত্তাহীনতা আর খাদ্যাভাব দূর করার জন্য খাদ্যের সরবরাহ এবং যথাযথভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। এসমস্ত ঘটনা যে বারে বারে হচ্ছে তার মূলে হলো এখনও পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হওয়া। পার্বত্য চুক্তি অচিরেই পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা, বিশেষত আইন-শৃঙ্খলা, সাধারণ প্রশাসন- এগুলো অবিলম্বে জেলা পরিষদে হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে ঐ এলাকার স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, চুক্তির বিষয়ে খুবই আন্তরিক। অচিরেই এই চুক্তি দ্রুততার সাথে বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান রেখে আমি বিষয়টা আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সবাইকে ধন্যবাদ।

স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরীঃ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য।

==========

লংগদু অগ্নিসংযোগে ও রাঙ্গামাটির ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ, কর্ণফুলী নদী ড্রেজিং, বেসরকারি শিক্ষকদের অবসরভাতা ও গ্রাচুইটির প্রস্তাব ঊষাতন এমপির

লংগদু অগ্নিসংযোগে ও রাঙ্গামাটির ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ, বন্যা ঠেকাতে কর্ণফুলী নদী ড্রেজিং, বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য অবসরভাতা ও গ্রাচুইটির প্রস্তাব দিয়েছেন ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। গত ২১ জুন ২০১৭ জাতীয় সংসদে ২০১৬-২০১৭ সালের সম্পূরক বাজেটের উপর আলোচনায় প্রদত্ত সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার এই প্রস্তাব তুলে ধরেন। নিম্নে ঊষাতন তালুকদারের উক্ত বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

ডেপুটি স্পীকার.....ঃ এবারে আমি বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি পার্বত্য রাঙ্গামাটি এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ঊষাতন তালুকদার, মাননীয় সদস্য আপনার সময় আট মিনিট।

ঊষাতন তালুকদার এমপিঃ মাননীয় স্পীকার, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী অনেক পরিশ্রম করে, গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে, এবং উনি একজন অভিজ্ঞ মানুষ, সেই হিসেবে উনি যে মহান সংসদে বাজেট উপস্থাপন করেছেন, এই জন্য উনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি যারা সংশ্লিষ্ট বিভিন্নভাবে পরিশ্রম করে এই বাজেট তৈরী করার সহযোগিতা করেছেন-উনাদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের এই বাজেট সম্পর্কে কিছু বলার আগে আমি কিছুদিন আগে সাম্প্রতিক সময়ে আমার এলাকায় চরম মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে সেখানে কেবলমাত্র রাঙ্গামাটিতে ১১৮ জনের প্রাণহানি হয়েছে। পাঁচ জেলাতে ১৫৬ জনের প্রাণহানি হয়েছে। অনেক ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষজন উচ্ছেদ হয়েছে এবং অনেকেই আজকে দুই হাজারের অধিক মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে, মানবেতর জীবনযাপন করছে। উনাদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, সমবেদনা জানাচ্ছি, যাতে করে তারা দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারেন। এবং পাশাপাশি লংগদুর যে মানুষ সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়, দুইশ'/আড়াইশ' পরিবার সেখানে উচ্ছেদ হয়েছে, সেখানে ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। তাদেরকেও আমি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধি সম্প্রতি ৭% ছাড়িয়েছে। সারাবিশ্বে অর্থনীতির মন্দাবস্থা থাকলেও আমাদের দেশে মন্দার ছোঁয়া লাগেনি। দেশে অর্থনীতি বাড়ছে, ক্ষুধা-দারিদ্র অনেকটা দূর হয়েছে। দারিদ্র্য ও পুষ্ঠিহীনতা কমছে। কমছে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকগুলো উর্ধ্বমুখী। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল, পায়রাবন্দর, পদ্মাসেতু ইত্যাদি মেগাপ্রজেক্ট এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন পাশ, পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৫৬৬ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মূলত প্রধান ভূমিকা রয়েছে। তাই উনাকেও আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবারের বাজেট ৪ লক্ষ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট। বাজেট বড়-ছোট আমি বলতে চাই না। ১৬ কোটি মানুষের একটা রাষ্ট্রে সম্ভব হলে আরও অধিকতর টাকা বরাদ্দ রাখা গেলেও আমার আপত্তি নেই।

মাননীয় স্পীকার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাজস্ব আদায় ও খরচের লক্ষ্যগুলো বড় করার একটা রীতি হয়ে গেছে। অর্জনযোগ্য নয় জেনেও, দেখানোর জন্য হলেও বড় বাজেট দেওয়া হচ্ছে। ৪ লাখ কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়ন করতে পারা না পারা পরের বিষয়। বাজেট বড় দেখাতে গিয়েও ঘাটতি বেশি হচ্ছে। আমাদের রীতি হয়ে গেছে, ৫% শতাংশের মধ্যে ঘাটতি দেখতে হবে। ঘাটতির ক্ষেত্রে অর্থায়ন কিভাবে হবে সেটিও একটি বড় প্রশ্ন। বিদেশি সহায়তা প্রাপ্তির খরচ ৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি দেখানো হয়েছে। সেটাও উচ্চাভিলাষী। ব্যাংক ও আর্থিক খাত এখন সবচেয়ে বড় ঝুঁকির জায়গা। এই খাতের সংস্কারে বাজেট তেমন কিছু নেই। বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে। ঘাটতি পূরণের জন্য বাজেট থেকে অর্থ যোগান দেওয়া হচ্ছে। অথচ খেলাপি ঋণ নামে কোন শব্দ বাজেটে নেই। এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ খাত, সেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে, এই ঘাটতি জনগণের করের টাকা দিয়ে পূরণ করা হচ্ছে, ভ্যাট আইন চালু করে রাজস্ব আদায় বাড়ানো হচ্ছে! করদাতারা যদি প্রশ্ন করেন, খেলাপি ঋণের টাকা যোগান দেয়ার নৈতিক ও অর্থনৈতিক যুক্তিটা কী? কোন উত্তর বাজেটে নেই। উন্নত দেশে জনসাধারণেরা অনেক কর দেয়। বিষয়টা হলো করের টাকার মাধ্যমে চোখের পড়ার মতো উন্নয়ন বা সুবিধাদি দৃশ্যমান হতে হবে। তবেই মানুষ কর দিতে এগিয়ে আসবে। শুধুমাত্র আইন করে, জোর খাটিয়ে আদায় করে আশাব্যঞ্জক সুফল পাওয়া যাবে না। নতুন বাজেট মধ্যবিত্ত ও সীমিত আয়ের মানুষকে আরো চাপে ফেলে দেবে।

ব্যাংক আমানতে আবগারি শুল্ক বাড়ানো হলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখার প্রবণতা নিরুৎসাহিত হবে। তাই আমানত, আবগারি শুল্ক না বাড়িয়ে পূববৎ পরিমাণ ধার্য করাই উত্তম বলে মনে করি। অন্যদিকে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বাজেট তেমন কিছু নেই। আগামী এক বছরে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা নেই। বৈদিশিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, আগামী অর্থবছরে অর্থের প্রবাহ বাড়বে। এজন্য এটি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু গত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন খুব ধীর। অনেক প্রকল্পের কাজ এখনও শুরুই হয়নি। সরকারের অন্যতম বড় খরচের জায়গাটি হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) বাস্তবায়ন মাত্র ৫৫%, খরচ হয়েছে ৬৫,০০০ কোটি টাকা। ছয়টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বরাদ্দের তিন ভাগের এক ভাগও খরচ করতে পারেনি। দুদক ও সরকারি কর্মকমিশনের খরচের খাতা শূণ্যই বলা চলে। অপরদিকে দেশের মুষ্ঠিমেয় মানুষের উন্নতি আসল উন্নতি নয়, এবং এর ফল কখনো ভালো হয় না বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ডেনভারের অর্থনীতির শিক্ষক অধ্যাপক হায়দার আলী খান, যিনি একজন বাংলাদেশী। তাঁর কাছে উন্নয়ন মানে দেশের আপামর জনগণের উন্নয়ন নয় যদিওবা ঢাকার অভিজাত এলাকায় বসবাসকারী অভিজাত মানুষের উন্নতি হয়।

মাননীয় স্পীকার, রাষ্ট্রের সম্পদ সীমিত হলেও মানব কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলো এমপিওভুক্ত হয় নাই, অনেকে আলাপ করছেন, আমি জানি, বিশ্বাস করি, আমাদের দেশে সম্পদ সীমিত, কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে মানুষ শিক্ষিত হলে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হবে এবং আমাদের দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার এবং দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে...(মাইক বন্ধ এবং স্পীকার: মাননীয় সদস্য, এক মিনিট বলুন.., উষাতন তালুকদার এমপি: স্যার, দুই মিনিট...স্পীকার: আচ্ছা, বলেন, আপনি দুই মিনিট বলেন।) ....উন্নতির জন্য যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয় নাই সেগুলো এমপিওভুক্ত করা হোক। আমার এলাকায় হ্যাচারি ও সদর হাসপাতাল এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ব্রীজ এবছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং এবারে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং লোকজন মারা গেছে, ভূমিধস হয়েছে, লংগদুতে ২০০-২৫০ পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে, এদের অচিরেই তাদের ঘরবাড়ি নির্মাণ ও ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বাসন করার জন্য এবছরের বাজেটে অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হোক, এজন্য আমি এই মহান সংসদে প্রস্তাব রাখছি। স্বাস্থ্যখাতে, শিক্ষাখাতে, বিশেষ করে গবেষণা ও প্রশিক্ষণে আরও বরাদ্দ বাড়ানো হোক। বেসরকারি শিক্ষকদের বিড়ম্বনা, যারা পেনশনে যায়, আমি অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব সাক্ষী, দেখেছি সেখানে গেলে বিড়ম্বনা মন্ত্রণালয়ে, অধিদপ্তরে। বেসরকারি শিক্ষকের বিড়ম্বনা দূর করার জন্য অবসর ভাতা, গ্রাচুইটি দ্রুত যাতে প্রাপ্তির বিধান রাখা হোক।

পরিশেষে, কাপ্তাই লেকে ড্রেজিং করার বিষয়টা বেশ কিছু সময় থেকে আমরা বলে আসছি। কিন্তু বাস্তবে সেটা দেখছি না। সেখানে এবারে সামান্য বৃষ্টিতে-ঝড়ে যে বন্যায় পাকা ধান, আধা পাকা ধান বেশ ক্ষতি হয়েছে, যেভাবে সিলেটের হাওরে হয়েছে। তাই সেখানে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। সেজন্য এই ড্রেজিং অবশ্যই জরুরী। আশাকরি, এবারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং আমি এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাই হোক, আমি এই বাজেট যাতে সবাইয়ের আলোচনাক্রমে....

স্পীকার: ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, মাননীয় সদস্য, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

১৯ পৃষ্ঠার পর

সাম্প্রতিক লংগদু...

ও সেটেলার বাঙালিদের ঘরবাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি সাজানো মামলাও দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

তবে যাই হোক, ঘটনার পর দেশে-বিদেশে আলোচনা- সমালোচনা-নিন্দার মুখে প্রশাসন কয়েকদিন পর দুলাল হোসেন ও কিশোর চাকমা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু প্রকৃত দোষীদের বা হোতাদের যে গ্রেফতার করা হয়নি সে ব্যাপারে জোর আলোচনা ও অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে এধরনের বড় হামলার জন্য যারা সাধারণ সেটেলারদের উত্তেজিত, সংগঠিত ও প্ররোচিত করেছিল এবং অগ্নিসংযোগে ও লুটপাটে নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের কেউ গ্রেফতার হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, অভিযুক্ত সরকারদলীয় কর্মীদের বাদ দিয়ে অন্যান্য দলীয় লোকদেরই কেবল গ্রেফতার করা হয়েছে। অপরদিকে এই হামলার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সেনা ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যারা দায়িত্বে ছিলেন, তারাও কোন যুক্তিতেই এই অপরাধের দায়মুক্ত ও অপরাধের বিচারের আওতামুক্ত থাকতে পারেন না। কারণ কয়েক ঘন্টাব্যাপী চলা এই হামলা ও অগ্নিসংযোগে হামলাকারীদের কেন তারা বাধা দেননি? উপস্থিত সেনা ও পুলিশবাহিনী যদি হামলায় অংশগ্রহণ না করে বা সহযোগিতা না দিয়ে থাকেন তাহলে হামলা ও অগ্নিসংযোগের সময় তারা কেন কোন হামলাকারীকে বা অপরাধীকে আটক বা গ্রেফতার করল না?

বস্তুত স্বাধীনতার ৪৬ বছর এবং পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের ১৯ বছর পরেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও পাকিস্তানী আদর্শের ভিত্তিতে বাঙালি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণির ঔপনিবেশিক শাসনশোষণই চলমান রয়েছে এবং পূর্বের মতই জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখা হয়েছে। তারই লক্ষ্যে লংগদুর এই হামলা সংঘটিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম যদি এদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয় এবং এ অঞ্চলের মানুষ যদি স্বাধীন দেশেরই নাগরিক হন, তাহলে এখানে এ ধরনের নিপীড়নের ও বৈষম্যের নীতি চলবে কেন? পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান, এই অঞ্চলের দীর্ঘ নিপীড়িত ও বঞ্চিত জুম্মদের অধিকার সুরক্ষিত হোক এবং এই অঞ্চলে শান্তির পরিবেশে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা প্রবাহিত হোক–তা যদি প্রধানমন্ত্রী বা সরকার আন্তরিকভাবে চান তাহলে এযুগেও এধরনের ঘটনা এখানে ঘটবে কেন? নিশ্চয়ই ইতিহাস এখানে শেষ নয়। জুম্ম জনগণ তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তি নীরবে ও নির্বিবাদে মেনে নিতে পারে না – মেনে নেবে না।

বিশেষ প্রতিবেদন

কারেন্টের শক দিয়ে, রশি বেঁধে টাঙিয়ে, মুখে পানি ঢেলে অনিল তঞ্চঙ্গ্যাকে নির্যাতন

হাজিরা দিতে গেলে বান্দরবান কোর্ট থেকে গোয়েন্দা সদস্য কর্তৃক পুন:গ্রেফতার

গত ১২ জুন ২০১৭ সাল বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরের ওয়াগই পাড়ার বাসিন্দা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রোয়াংছড়ি থানা শাখার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অনিল তঞ্চঙ্গ্যার (৩৫) বান্দরবানের ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে নিয়মিত হাজিরা প্রদান শেষ হলে কোর্ট বারান্দা থেকে বেলা ১:৩০ টার দিকে তিনজন ডিজিএফআই/এফআইইউ সদস্য তাকে ধরে বান্দরবান সদর জোনে নিয়ে যায়। জোনে সেনাসদস্যরা অনিল তঞ্চঙ্গ্যাকে অমানুষিকভাবে মারধর করে এবং গুরুতর আহত অবস্থায় বিকাল ৫:০০ টার দিকে বান্দরবান সদর থানায় সোপর্দ করে। এ সময় পুলিশ অনিল তঞ্চঙ্গ্যাকে ২০১৬ সালের ১৫ জুন তারিখে রাজনৈতিক হয়রানির উদ্দেশ্যে বান্দরবানের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সদস্যদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সাজানো অপহরণ মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামী হিসেবে দেখিয়ে জেলে প্রেরণ করে।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ অনিল তঞ্চঙ্গ্যাকে রোয়াংছড়ি উপজেলা সদরের ওয়াগই পাড়া থেকে সেনাসদস্যরা বান্দরবান জোনে তুলে নিয়ে তার উপর নির্যাতন চালায় এবং একটি সাজানো ডাকাতি মামলায় জড়িত করে জেলে পাঠায়। অনিল তঞ্চঙ্গ্যাকে বাড়ি থেকে ধরে আনার সময় সেনা সদস্যরা অনিল তঞ্চঙ্গার স্ত্রী ভাগ্যলতা তঞ্চঙ্গ্যাকেও ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। অনিল তঞ্চঙ্গ্যা প্রায় তিন মাস জেলে থাকার পর গত ৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জামিনে মুক্তি পান। এরপর থেকে তিনি নিয়মিত বান্দরবান জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজিরা দিয়ে আসছেন। গত ১২ জুন বান্দরবান ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজিরা দিতে গেলে আবার তাকে আটক করা হয়। পর পর ধরে নিয়ে কত জঘন্যভাবে সেনা সদস্যরা তাঁকে নির্যাতন করেছিল, তার হুবহু বয়ান নিম্নে দেয়া গেল-

গত ০১/০১/২০১৭ সকাল ১০ ঘটিকার সময় ওয়াগই পাড়াস্থ মাদু বড়ুয়ার চা দোকানে নাস্তা করার জন্য গিয়েছিলাম। হঠাৎ করে সেনাবাহিনীর এক কম্যাণ্ডারের নেতৃত্বে ৫ সেনা সদস্য তাদের গাড়ী থেকে নামার পর আমার নাম ধরে আমার বাড়ি খুঁজতে থাকে। এর একটু আগে আমার এক বন্ধু আমাকে মোবাইল ফোনে জানিয়ে দেন যে, সেনা সদস্যরা আমাকে খুঁজছে, সতর্ক থাকার জন্য। এর কিছুক্ষণ পর সেনা সদস্যরা তাদের গোয়েন্দা/সোর্সের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, আমি উক্ত চা দোকানে আছি। আমি তাৎক্ষণিক পালিয়ে যেতে পারিনি। তারপর সেনা সদস্যরা উক্ত দোকানে সকল লোকজনকে বের করে দিয়ে আমাকে ধরে ফেলে।

তারপর সেনা সদস্যরা সরাসরি উক্ত চা-দোকানে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এবং সাথে সাথে আমার হাত পিছনে করে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যায়। তখন আমার সহধর্মীনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উক্ত সেনা কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন ছেড়ে দেয়ার জন্য। সেনা সদস্যরা আমার সহধর্মীনির কোন কথা না শুনে তাদের গাড়ীতে করে বান্দরবান সেনা ব্রিগেডে নিয়ে যায়। পরে গাড়ী থেকে নামিয়ে দুপুর প্রায় ১২টার দিকে সেনাবাহিনীর টর্চার সেলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়।

অপু নামক একজন সন্ত্রাসী কোথায় থাকে, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতি গাড়ীতে কত টাকা চাঁদা নেয়া হয়, মংপুকে কারা অপহরণ করেছে ইত্যাদি জানি কিনা জিজ্ঞাসা করতে থাকে। জেএসএস-এর ট্রেনিং সেন্টার কোথায়, জেএসএস চাঁদা উত্তোলন করে কোথায় পাঠায় – এভাবে নানা প্রশ্ন করে শারিরীক নির্যাতন ও মারধর করতে থাকে।

এ বিষয়ে আমি কোন কিছু জানি না বললে আমাকে রশি দিয়ে টাঙিয়ে রেখে বেদম মারধর ও নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে কারেন্টের শক দেয় আমাকে। তখন আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর আমার একটু জ্ঞান ফিরলে গামছা দিয়ে আমার চোখ বাঁধা হয় । তখন সেনা সদস্যরা আমাকে সকল ঘটনা স্বীকার করতে বলে। যদি না করি তাহলে ক্রসফায়ারে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। তাদের কথা মতো স্বীকার না করায় মুখে পানি একনাগারে ঢালতে থাকে। তখন আমি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আমার আবার জ্ঞান ফিরে আসলে দু'হাত বাঁধা, চোখ বাঁধা অবস্থায় সারা রাত সেনা নির্যাতন সেল ঘরের বারান্দায় রাখা হয়।

পরের দিন সকাল ০২/০১/২০১৭ আবার নির্যাতন সেলে নিয়ে টাঙানো অবস্থায় নানা ধরনের প্রশ্ন করেন এবং নির্যাতন করতে থাকে। আমাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন করে কোন স্বীকারোক্তি না পেয়ে বান্দরবান রোয়াংছড়ি থানার পুলিশের সেকেন্ড অফিসারের কাছে সেনা সদস্যরা আমাকে আহত অবস্থায় হস্তান্তর করেন। থানার পুলিশ আমাকে বান্দরবান সদর হাসপাতালে ডাক্তারের চিকিৎসা করার পর আদালতের পুলিশের কাছে প্রেরণ করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়। পরে জানতে পারলাম যে, আমাকে চাঁদাবাজি মামলায় আসামী বানানো হয়েছে।

এরপর দুই মাস আট দিন বিনা চিকিৎসায় জেলহাজতে থাকার পর এপ্রিল মাসের ৮ তারিখে জামিনে মুক্তি পাই। উক্ত মিথ্যা মামলায় তৃতীয় বারের মতো হাজিরা দিতে কোর্টে গেলে গত ১২/০৬/২০১৭ সোমবার সকাল ১০টার সময় পূর্বে ওঁতপেতে থাকা সেনাবাহিনীর সোর্স ডিজিএফআই-এর সদস্যরা কোর্ট বারান্দায় গিয়ে আমার কাছে আমার নাম ও মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে। আমিও সরল বিশ্বাসে তা দিয়ে ফেলি। দুপুর ১২ টার সময় কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত হন আদালতের এজলাজে। আমরা হাজিরা দিতে অপেক্ষমান ছিলাম। এমন সময় আর এক সেনা সোর্স কোন কিছু না বলে আমাকে ছবি তুলে আনেন। তখন আমার মনে সন্দেহ হয় যে, আজকে আমাকে একটা কিছু করা হবে।

বাকী অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদন

রাঙ্গামাটিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপিত

৮ মার্চ ২০১৭ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উদ্যোগে রাঙ্গামাটি জেলা সদরে এক র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ১০:০০ টায় রাজবাড়ি সড়কস্থ জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণ হতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করে বনরূপা ঘুরে এসে আবার সেখানে এসে সমাপ্ত হয়। এরপর সকাল ১১:০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি জড়িতা চাকমার সভাপতিত্বে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে 'নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন সমাজ গড়ি – পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করি' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান এবং অতিথি আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা। এছাড়া আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন এম এন লারমা মেমোরিয়েল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক ও কবি শিশির চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ ত্রিপুরা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি চঞ্চনা চাকমা। আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা।

আলোচনা সভায় জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) বলেন, 'আজকে সমাজের মধ্যে সবচেয়ে যারা ক্ষমতাবান সেই শাসকগোষ্ঠীই নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়। সেই ক্ষমতাবানরাই জাতীয় জীবন ও সমাজ জীবনের ক্ষেত্রটা নিয়ন্ত্রণ করছেন। সেই কারণে আজকে বছর বছর ধরে নারীরা যেভাবে লড়াই-সংগ্রাম করে যাচ্ছে সেই অনুপাতে কিন্তু তারা তাদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা দরকার।' তিনি বলেন, আজকে নারীদের সেই অনুভূতি, 'সেই চিন্তাধারা সেই আদর্শ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে যে আদর্শ, যে অনুভূতি, যে চিন্তাধারা সমাজের বাস্তবতাকে আমূল পরিবর্তন করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।' তিনি বলেন, 'আজকে এদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী হলেও যেহেতু তিনি এদেশের শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন যে শাসকগোষ্ঠী কিন্তু সমাজের আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়।'

শ্রী লারমা আরও বলেন, 'সারা বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টা যেভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে, ঠিক তেমনি আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের যে অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সেটা বাস্তবায়িত হতে পারছে না। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে স্থায়ী অধিবাসী সকল মানুষকে, নারী-পুরুষকে বুঝতে হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের যে অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে সেই অধিকার আদায়ের জন্য আরও আন্দোলন জোরদার করতে হবে। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদেরকে আরও এগিয়ে আসতে হবে।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি শ্রী গৌতম দেওয়ান বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে এটা- আমাদের মত দেশে প্রশাসন যন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্রের যারা কর্ণধার, তারা যে মনমানসিকতা পোষণ করেন সেক্ষেত্রে চুক্তি বাস্তবায়ন খুব দ্রুত হয়ে যাবে সেটা আশা করতে পারি না। কিন্তু সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করে চুক্তির বাস্তবায়নের দাবি করছে। এটা একটা প্রতারণার সামিল। এভাবেই সরকার আজকে চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ে অপপ্রচারণার কৌশল নিয়েছে। তিনি আরও

বলেন, 'আন্দোলন জোরদার করা ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই। এবং সেই আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ঊনিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, অনেক সময় চলে গেছে। আর সময় দেওয়া যায় না।'

শ্রী বিজয় কেতন চাকমা বলেন, 'আজকে আমাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। ভূমির অধিকারও আমরা পাইনি। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা যেখানে অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবিরোধী হয়, সেখানে স্বাভাবিকভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও আদিবাসী নারীরা নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হবে।'

শ্রী মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, 'এই অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক সমাজ ও রাষ্ট্রকে যদি আমরা গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র ও সমাজে রূপান্তর করে না পারি তাহলে এই সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে কখনো নারীর উপর, আদিবাসীদের উপর বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা তা কখনোই নিঃশেষ হয়ে যাবে না।' তিনি আরও বলেন, 'আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠী এখানকার জুম্মসহ পার্বত্য অধিবাসীদের অধিকার মেনে নিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার আজকে সেই অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে না। আজ ঊনিশ বছর হয়ে গেছে চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি। এভাবে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে চলেছে। উপরন্তু সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন না করে জুম্মদেরকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র নানাভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে।'

জাতিসংঘের Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030- প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন "নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন সমাজ গড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করি" শ্লোগানকে সামনে রেখে এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। উল্লেখ্য, ১৯১০ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে বিশ্বের সংগ্রামী ও সমাজতান্ত্রিক নারীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা নেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাব অনুসারেই ৮ মার্চ তারিখে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উদযাপনের সূত্রপাত ঘটে। মূলত ১৯০৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে কাজের অমানবিক অবস্থা ও বৈষম্যমূলক মজুরীর প্রতিবাদে পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটের স্মরণে এই দিবসটিকে বেছে নেয়া হয়। পরবর্তীতে বিশ্বের দেশে দেশে অব্যাহতভাবে নারী সমাজের জাগরণ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘও ৮ মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৯৭৬ হতে ১৯৮৫ সময়কালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। ফলে এই আন্তর্জাতিক নারী দিবস আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ ও গভীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে থাকে।

৪৪ পৃষ্ঠার পর

কারেন্টের শক দিয়ে.....

এমতাবস্থায় পারছি না কোর্ট ছেড়ে পালাতে, ভয়ও করছে সেখানে থাকতে এমন অবস্থায়। কিছুক্ষণ পর বিচারক হাজিরা ডাকতে থাকেন। তখন আমি কোন মতে হাজিরা দিয়ে বের হবার পর পরই সেনাবাহিনীর সাদা পোষাকে ৪/৫ জন সদস্য কোর্ট পুলিশের সামনে আমাকে বসিয়ে অতীতের মতো নানা প্রশ্ন করতে থাকে। তখন আমি অস্বীকার করলে কিছুক্ষণ পর সাদা পোষাকধারী সেনা সদস্যরা আমাকে কিছু না বলে ২ জন সেনাসদস্য দু'হাতে দু'জন ধরে তাদের গাড়ীতে তুলে সরাসরি বান্দরবান সেনা জোন কমান্ডারের অফিস কক্ষে নিয়ে যায়। সাথে সাথে আমার দু'হাত ও দু'চোখ শক্তভাবে বেঁধে ফেলে। তারপর আগের মতো নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে আবার আগের মতো মারধর, অবর্ণনীয় নির্যাতন করতে থাকে। স্বীকার না করলে ক্রসফায়ারে হত্যার হুমকি দেয়।

সেনাবাহিনীর নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আমি নির্যাতনকারী সেনা সদস্যদের বলি যে, আমাকে এভাবে নির্যাতন না করে সরাসরি গুলি করে মারুন। তাতে হলেও আমার স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়রা শান্তি পাবে এবং আমিও তাতে রেহাই পাবো। ৪ ঘন্টা ব্যাপী কঠিন শাস্তি ও নির্যাতন করার পর বান্দরবান সদর থানার এসআই এর হাতে আমাকে হস্তান্তর করলে সারা রাত থানা পুলিশের হেফাজতে রেখে পরের দিন ১৩/০৬/২০১৭ তারিখ বিকাল ৩ টার সময় কোর্টে প্রেরণ করেন। মংপু অপহরণ মামলায় আসামী করে কোর্টের মাধ্যমে আমাকে আবারও বান্দরবান জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।

২০ দিন জেলহাজতে বিনা চিকিৎসায় থাকার পর গত ০২/০৭/২০১৭ তারিখে বান্দরবান জজকোর্ট হতে দ্বিতীয় বারের মতো জামিনে মুক্তি পাই। বর্তমানে আমার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ। উন্নত চিকিৎসা করার অতীব জরুরী। অন্যথায় আমার শারীরিক সমস্যা হতে পারে।

বিশেষ প্রতিবেদন

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২২তম কাউন্সিল:

জুম্ম ছাত্র সমাজকে দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদিতা ও সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে – সন্তু লারমা

"জুম্ম ছাত্র সমাজকে দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদিতা ও সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ছাত্র সমাজের মধ্যে যারা দোদুল্যমান, যারা নিজেদের সুবিধা নিয়ে শুধু ভাবেন, যারা নিজেকে সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনার তার থেকে বেরিয়ে আসুন।" গত ২০ মে ২০১৭ রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে জুম্ম ছাত্র সমাজের প্রতি এ আহ্বান জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা।

'প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও চুক্তি বিরোধীদের রুখে দাঁড়ান' ও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ইস্পাত কঠিন আন্দোলন সংগঠিত করুন' – এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২২তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনীর অনুষ্ঠানের ছাত্র ও জনসমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. আমিরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক মহিউদ্দিন মাহিম ও বসুমিত্র চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি টোয়েন চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি জি এম জিলানী, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক-চন্দ্রা ত্রিপুরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা ও দলীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানে কার্যক্রম শুরু করা হয়। সমাবেশে পিসিপির সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বাচ্চু চাকমা এবং অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য সুমন মারমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২২তম কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদত্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার ভাষণ হুবহু নিম্নে পত্রস্থ করা হলো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংগ্রামী সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সমাবেশে আগত সম্মানিত সুধীমন্ডলী ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সংগ্রামী ছাত্রছাত্রী বন্ধুগণ! ইতিমধ্যে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এই সমাবেশে অনেক বক্তব্য

উপস্থাপিত হয়েছে, যেগুলোর মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তথা সারা দেশের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আজ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রতি বছর অনেক কথা বলা হয়ে থাকে। পার্বত্যাঞ্চলের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ১৯৮৯ সালে যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, আমার মনে হয়, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আজ অবধি সেই অঙ্গীকার পরিপূরণে অনেক কিছু অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়ে গেছে। যে কারণে আমরা এভাবে এই প্রতিষ্ঠা দিবসেও সেই অনেক কিছু বলার মধ্যেও একটি কথা ও একটি বিষয় সবচেয়ে প্রতিফলিত হয়ে আসছে সেটা হলো পার্বত্যাঞ্চল ভাল অবস্থাতে নেই। পার্বত্যাঞ্চলের মানুষ আজকে প্রায় বিলুপ্তির দাঁড়প্রান্তে। সেই বিলুপ্তি প্রায় বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য যে লড়াই-সংগ্রাম সেটা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বিগত ২৮ বছর ধরে তার দায়িত্ব পালন করে আসছে। সেই দায়িত্ব, আজ আমি মনে করি, নতুন করে নতুন মাত্রায় তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

আজকের এই সমাবেশে আমি তেমন বিশেষ কিছু বলতে যাচ্ছি না। আমি শুধু পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো এবং আমি বলার মতো সেই বাস্তবতা দেখি। আজকে পাহাড়ের দিকে যদি আমরা তাকাই সেই পাহাড় আজকে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সেই পাহাড়ে নিরাপত্তা নেই, সেই পাহাড়ে হাসি নেই, মানুষের অন্তরে আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকলেও সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা আজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে চলেছে। আজকে এই বাস্তবতার সামনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা এই পার্বত্যাঞ্চলের যুব সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯১৫ সালে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে এই ছাত্ররাই জন্ম দিয়েছিল নতুন করে জীবনকে সাজাতে, নতুন করে পাহাড়ের জুম্ম জীবনধারাকে এগিয়ে নিতে। সেই ধারাবাহিকতায় পাহাড়ী ছাত্র সমাজ তথা যুব সমাজ ব্রিটিশ আমলে, তারপর পাকিস্তান আমলে, অধুনা বাংলাদেশের আমলে সেই একই দায়িত্বকে প্রধান্য দিয়ে চলেছে। সংগ্রামে থেকে, বিপ্লবের নানা দিক থেকে অংশগ্রহণ করে তারা আজকে সামনের দিকে ধাবমান, তারা আজকে সংগ্রামরত।

১৯৬০ সালে পাহাড়ের ছাত্র সমাজ কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা দেখেছি, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়ে গেল। দেশ ভাগ হওয়ার সময়ে যে ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্বকে আবিষ্কার করা হয়েছিল, মুসলমানের জন্য মুসলিম রাষ্ট্র হবে, হিন্দুদের জন্য হিন্দু রাষ্ট্র হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখি, মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল, কিন্তু হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে হিন্দু রাষ্ট্র গঠিত হতে পারেনি। আজ অবধি সেই অসমাপ্ত কাজের বাস্তবতা আমরা দেখি। আজকে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পার্বত্যাঞ্চলের অবস্থান কোথায় হওয়ার কথা ছিল? অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চলের অবস্থান হওয়ার কথা ছিল বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মের, বহু নীতি-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে আমাদের প্রতিবেশি দেশ ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হতে পারেনি, শাসকগোষ্ঠী হতে দেয়নি। তখন থেকে শুরু হয়েছিল পার্বত্যাঞ্চলের বুকে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র। দেশ ভাগ ও পাকিস্তান গঠিত হতে না হতেই পার্বত্যাঞ্চলের বুকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের তাবেদার গোষ্ঠীর সাথে মিলিতভাবে শুরু করে এই এলাকার ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র।

সেজন্য আমরা দেখি পঞ্চাশ দশকের শুরুতেই এখানে বাইরের লোকের বসতি প্রদান করে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে আরেকটি ভিন্নমুখী বাস্তবতা সৃষ্টি করতে। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করে থাকলেও উক্ত শাসনবিধিতে স্বীকৃত এখানকার পাহাড়ী পুলিশ ব্যবস্থাপনা তুলে দেওয়া হয়। এখানে পার্বত্যাঞ্চলে প্রবেশ করার জন্য যে বিশেষ অনুমতি নিতে হতো সেই বাধানিষেধও প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৫৩ সালে কর্ণফুলী নদীর বুকে কাপ্তাই বাঁধ দিয়ে এখানে একটা বহুমুখী পরিকল্পনা নেওয়া হলো, যে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির একটা পরিপূর্ণ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হয়েছে ১৯৬০ সালে, তা আমরা দেখেছি। কাপ্তাই বাঁধের ফলে পার্বত্যাঞ্চলের জনজীবন, তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক সমস্ত কিছুই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন থেকে আমাদের এই পার্বত্যাঞ্চলের ছাত্র ও যুব সমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আজকে আমার যে বিষয় বলা, সেটা হলো পার্বত্যাঞ্চলের বাস্তবতা নতুন করে বলার কিছুই নেই। এখানে এই পার্বত্যাঞ্চল শাসিত হচ্ছে প্রধানত দুই ভাগে। একটা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে, আরেকটা হচ্ছে এখানকার নিয়োজিত অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে। আজকে পার্বত্যাঞ্চলে এই দুই ধরনের নেতৃত্ব যে বিরাজমান, সেভাবে তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা বহুবার, বহুবিধভাবে, একেবারে পুঙ্খানুপঙ্খভাবে মোটা দাগে পার্বত্যাঞ্চলের এই বাস্তবতা ও পরিস্থিতির উপর বক্তব্য দিয়েছি। আজকেও এখানে আমি বলার আগে যারা বক্তব্য দিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের এই নির্মম বাস্তবতা সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। আজকে এই পার্বত্যাঞ্চল বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে সেনাশাসনে শাসিত হয়ে আসছে। তার সাথে যুক্ত আছে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন, যে কেন্দ্রীয় সরকার মন্ত্রীপরিষদের নেতৃত্বে সারাদেশকে পরিচালনা করে, শাসন করে। সেই মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং এখানে নিয়োজিত সেনাবাহিনী তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর ভর করে পার্বত্যাঞ্চল বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে শাসিত হয়ে আসছে।

আজকে আমরা এখানে যে বাস্তবতা দেখি সেই বাস্তবতায় কি দাবি রাখে? সেই দাবির কথা আমার মনে হয় এখানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এক পাতার যে বিবৃতি, তার মধ্যে তারা বলেছে। এভাবে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের যে ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং তাদের যে কাউন্সিল হতে যাচ্ছে, এই সমাবেশে ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তাদের যে ঘোষণা, তাদের যে স্লোগান– 'প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও চুক্তি বিরোধীদের রুখে দাঁড়ান'– সেই শ্লোগানের প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও চুক্তি বিরোধী কারা? সেটা নতুন করে বলার কোন অবকাশ নেই। আজকে এই সমাবেশে যারা

উপস্থিত আপনারা সবাই এই প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও চুক্তি বিরোধীদের জানেন। নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা প্রত্যকে কম বেশি এই প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী ও চুক্তি বিরোধীদের জানি এবং তাদেরকে চিহ্নিত করে আসছি। এই চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া সেটা নতুন করে শুরু করা বা বলার কোন বাস্তবতা আছে বলে আমি মনে করি না।

দ্বিতীয় যে শ্লোগান– 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ইস্পাত কঠিন আন্দোলন সংগঠিত করুন'– এখানে হয়তো বা কিছু বলার, কিছু ব্যাখ্যা দেওয়ার, কিছু বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। আজকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এই দু'টি ঘোষণার মধ্য দিয়ে যে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎযাপন করতে যাচ্ছে এবং কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে আগামী দিনে যারা আসছেন, আমার মনে হয় এই বিষয় দুটি যথাযথভাবে অনুধাবন করে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। আজকে এই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এক পাতার যে বক্তব্য সেই বক্তব্যে পার্বত্যাঞ্চলের বাস্তবতা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। আজকে পাহাড়ের মানুষ কেউ নিরাপদ নয়। তিনি বাঙালি হোন বা ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতি হোন। আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে যে বাস্তবতা এটা বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের মানুষ সম্যকভাবে জানে না। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। আমি দেখেছি, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষমতাসীন দলের যারা নেতৃত্বে রয়েছেন, তারাও জানেন না পার্বত্যাঞ্চলের বুকে কি দানবীয় দমনপীড়ন চলছে। এখানে জুম্ম জনগণের উপর কি জঘন্য সন্ত্রাস বিরাজমান সেটা তারা জানেন না। বাংলাদেশের মন্ত্রীপরিষদের অনেক মন্ত্রী আছেন যারা পার্বত্যাঞ্চলকে চিনেন না, জানেন না, বুঝেন না। অথচ মন্ত্রীপরিষদের বিভিন্ন বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন এবং নীতি নির্ধারণ করে থাকেন।

আজকে বাংলাদেশের এই যে বাস্তবতা আমরা দেখি, তাতে দেশে কোন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশে শাসন ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত, যারা শাসকগোষ্ঠী, তাদের মধ্যে আছে ইসলামী সাম্প্রদায়িকতাবোধ, আছে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবোধ, আছে দুর্নীতি পরায়ন এবং জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারা। আজকের এই বাস্তবতায় আমরা কি আশা করতে পারি যে, এই সরকার, শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৭ সালে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল অনেক অঙ্গীকার নিয়ে, অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে, অনেক কিছু বলে, সেই চুক্তি কি বাস্তবায়ন করবে? সেই শেখ হাসিনা সরকার ২০০৯ সাল থেকে আজকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধীষ্ঠিত রয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নকল্পে, পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যা সমাধানকল্পে কোন বাস্তব সম্মত ব্যবস্থা নিয়েছে? আমি মনে করি সেটা গ্রহণ করেনি, করতে এগিয়ে আসেনি। বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে তার সরকারের আমলে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেই চুক্তি বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র এই সরকার অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

আজকে শেখ হাসিনা সরকার অনেক কিছু দাবি করতে পারে। শেখ হাসিনা সরকার প্রতিদিন পার্বত্যাঞ্চলের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে, সরকার সমর্থনকারী পত্রপত্রিকায়, মিডিয়াতে এই করেছি সেই করেছি বলা হয়ে থাকে। মনে হয় যেন বাংলাদেশ একটা সুখী সমৃদ্ধ দেশ। যেখানে মানুষ তাদের মৌলিক অধিকার নিয়ে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকছে। তাদের মধ্যে শুধু আনন্দ, হাসি, উল্লাস এবং জীবনকে আরো উজ্জীবিত করার একটা প্রবনতা। বাস্তবে তার বিপরীতটাই আমরা দেখি। আজকে বাংলাদেশে সতের কোটি মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে অবাঙালি জাতিসমূহ বা বিভিন্ন আদিবাসী জাতিসমূহ যারা আজকে এদেশে বসবাস করছে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। তবুও এই সরকার দাবি করে যে, বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। আসলে সেটা সঠিক নয়, সেটা বাস্তব নয়।

আজকে বাস্তবতা হচ্ছে যে, বাংলাদেশে একটা গণমুখী সংবিধান নেই, বাংলাদেশের যে সংবিধান এটা বিশেষ মহলের, বিশেষ শ্রেণি মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একটা সংবিধান, যে সংবিধান বাংলাদেশের স্বার্থ চরিতার্থ করতে পারে না। বাংলাদেশের আপামর জনগণের, মেহনতি মানুষের, শ্রমজীবী মানুষের, ক্ষেত-মজুর মানুষের, স্বল্প আয়ের মানুষের স্বার্থকে এই সংবিধান পূরণ করে দিতে পারে না। পারে না বাংলাদেশের মত পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা পরিপূরণ করে দিতে। আজকে বাংলাদেশে যে শাসনব্যবস্থা, এই শাসনব্যবস্থা এই পার্বত্যাঞ্চলকে কিভাবে কোন দিকে ধাবিত করছে এই বাস্তবতা বাংলাদেশের মানুষ কয়জন জানে। আজকে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে বাস্তবতা দেখা যায়, সেই বাস্তবতার মধ্যে পার্বত্যাঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্তির জন্য এমন একটা পর্যায়ে চলে এসেছে, যে পর্যায়কে আমরা বলতে পারি 'অন্তিম পর্যায়'। এমনি এক পর্যায়ে আজকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তার ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে।

আজকে আমরা যদি দেখি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশের জন্ম, ১৯৭২ এর যে সংবিধান রচনা এবং তার পরবর্তী সময়ে যে বাস্তবতা পাহাড়ের বুকে, সেই বাস্তবতায় আমরা কি দেখি? ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান যদিও জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের মূলনীতির ঘোষণা করে রচিত হয়েছে, কিন্তু দেখা গেছে যে, সেখানে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন এবং সেখানে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে তার বিপরীত বাস্তবতা সংবিধানে আমরা দেখেছি। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়া হয়েছে। সেই সংবিধানে পার্বত্যাঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। আমাদের মহান নেতা এম এন লারমার নেতৃত্বে ৭২ সালের সংবিধানে জুম্ম জনগণের বিশেষ শাসনতান্ত্রিক অধিকারের যে দাবি করা হয়েছিল সেই দাবি ঘৃণাভরে উপেক্ষিত হয়েছিল।

তার পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি যে, ১৯৭৩ সালে রাতারাতি পার্বত্যাঞ্চলের বুকে দীঘিনালা, রুমা, আলীকদমে পাহাড়ী মানুষের জমি বেদখল করে সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ

সরকারের এই যে যাত্রা, তার ফলশ্রুতিতে আজকে ৪৭ বছর ধরে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে সেনাশাসন চলছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যে শাসকগোষ্ঠী রয়েছে, যারা দেশকে পরিচালনা করছে, তারা আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে জুম্মদের চিরতরে বিলুপ্ত করে ইসলামী সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্যাঞ্চলের বুকে ১৯৪৭ সালে অপাহাড়ী বা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা শতকরা যেখানে মাত্র আড়াই ভাগ ছিল, যারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি সূত্রে এসেছিল। আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে আমরা কি দেখি? আজকে এখানে পাহাড়ের মানুষ সংখ্যালঘু হতে হতে এমন পর্যায়ে এসে গেছে, যেখানে পার্বত্যাঞ্চলের আদি মানুষ জুম্ম জনগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

এখানে ইসলামী সম্প্রসারণবাদ আজকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। হয়তো অনেকেই বলবে যে, এটা হয়নি। তবে আমি মনে করি পার্বত্যাঞ্চলের বুকে পাকিস্তান সরকারের যে ষড়যন্ত্র '৪৭-এ শুরু হয়েছিল, সেটার ধারাবাহিকতায় ১৯৫৮ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি অধিগ্রহণ আইনের মধ্য দিয়ে ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ, ১৯৬৩ সালে পার্বত্যাঞ্চলের বিশেষ শাসনব্যবস্থার অস্বীকৃতি, ১৯৭২ সালে সংবিধানে জুম্ম জনগণের বিশেষ শাসনের অস্বীকৃতি, ১৯৭৩ সালে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে তিনটি সেনানিবাস স্থাপন তথা ধীরে ধীরে জিয়াউর রহমান সরকারের আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমপক্ষে ৫ লক্ষাধিক ভাসমান জনগণকে এখানে নিয়ে এসে আমাদের জুম্ম জনগণের ভিটেমাটি উপর যে বসিয়ে দেওয়া হল এবং অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে অভিবাসন ও সেনাশাসন চলছে, তার মধ্য দিয়ে আজকে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে পার্বত্যাঞ্চলকে পরিণত করেছে একটা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে।

আজকে এখানে ইসলামী সম্প্রসারণবাদ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সারাদেশে যদি আমরা দেখি সেই ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ছিল, বাংলাদেশ হবে একটা গণতান্ত্রিক, একটা বহু ভাষাভাষী, বহু জাতির, বহু ধর্মের, বহু সংস্কৃতির দেশ। বাংলাদেশ হবে একটা অসাম্প্রদায়িক দেশ, যেখানে একটা গণমুখী শাসন ব্যবস্থা থাকবে। আজকে সারা বাংলাদেশে আমরা যেটা প্রত্যক্ষ করি সেখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদ চেপে বসেছে। আজকে সারা বাংলাদেশে ইসলামীকরণের যে প্রক্রিয়া সেটা সহজেই আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি। আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে সেটা স্থাপিত হয়ে গেছে। আজকে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্যাঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে যারা এই জনপদ আবাদযোগ্য করেছে, তারা আজকে পরদেশী হয়ে আছে। আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে একটা ঔপনিবেশ হিসেবে শাসিত হয়ে আসছে। পাকিস্তান আমলে দেখেছি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পার্বত্যাঞ্চলসহ পূর্ব পাকিস্তানকে একটা ঔপনিবেশিক প্রদেশ হিসেবে শাসন করেছিল। আজকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী, মুক্তিকামী মানুষেরা লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। আজকে সেই শাসকগোষ্ঠী যারা শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করেছে, তারা মুক্তিকামী ব্যক্তিরা পার্বত্যাঞ্চলের শাসকে পরিণত হয়েছে, সারা দেশের শাসকে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানী কায়দায় পার্বত্যাঞ্চলকে তারা ঔপনিবেশ হিসেবে শাসন করছে, এখানে শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচার-অবিচার করছে। তাদের স্বার্থ পূরণ করে চলেছে। আজকে এই বাস্তবতা পার্বত্যাঞ্চলের বুকে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

এখানে আমরা অনেক কিছু বলতে পারি, আজকে পার্বত্যাঞ্চলে নিয়োজিত সেনাবাহিনী 'অপারেশন উত্তরণের' ক্ষমতার বলে কর্তৃত্ব করছেন তা তারা স্বীকার করেন না, স্বীকার করতে চান না। এটাই তো বাস্তবতা! পার্বত্যাঞ্চল শুধু এখন না, বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের আমল থেকে, পার্বত্যাঞ্চলের বুকে সেনাশাসন চলছে। আজকে ৪৭ বছর ধরে এভাবে পাহাড়ের বুকে আমরা বসবাস করছি। আমাদের জীবন তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আজকে আমরা জীবন মৃত অবস্থায় আছি। আমরা কথা বলছি, আমরা অনেক পেশায় যুক্ত থেকে অনেক কিছু করেছি। কিন্তু আমাদের বুকের ভেতর যে আগুন জ্বলছে, যে দুঃখ-বেদনা আমাদের বুকে সম্প্রসারিত হয়েছে, পুঞ্জিভূত হয়েছে সেটা কি শেখ হাসিনা এবং তার সরকার জানেন না? এদেশের শাসকগোষ্ঠী কি জানে না? পার্বত্যাঞ্চলের নিয়োজিত সেনা কর্মকর্তারা কি সেটা বুঝতে চান? তারা কি অনুভব করতে পারেন না, আমাদের বুকের যে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে?

এই আগুন বুকের ভেতর থাকবে না, এই আগুন বেরিয়ে আসবে এবং বেরিয়ে আসার বাস্তবতা তৈরী হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ আজকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঘোষণার মধ্যে তারা যে আহবান জানাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ইস্পাত কঠিন আন্দোলন সংগঠিত করার তাদের যে অভিব্যক্তি, তাদের অন্তরের যে প্রতিক্রিয়া সেটা আজকে এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। আমি আজকে বলতে চাই যে, আপনারা পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজ নিশ্চয় সেটা অনুভব করেন। আজকে আমার বুকে যে যন্ত্রণা, আমার বুকে যে আগুন জ্বলছে, নিশ্চয় আমি মনে করি আপনাদের বুকে সেই একই যন্ত্রণা, একই আগুন জ্বলছে। আজকে সেই বাস্তবতাকে অনুভব করে আমাদের সামনে দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কি সরকারের, এদেশের শাসকগোষ্ঠীর এভাবে আমাদেরকে জীবনের উপর যে শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে, সেটা কি আমরা মেনে নেবো, নাকি আমরা মানবো না। আমরা কি করবো?

আমি মনে করি আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে এভাবে জীবন মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার কোন অর্থই হতে পারে না। সরকার যেভাবে দেশের এবং এই পার্বত্যাঞ্চলের শাসন চালিয়ে যাচ্ছে, ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না, তা মেনে নেয়া যায় না। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হবে বলেও কোন লক্ষণ আমি দেখি না। বরং আমরা যে লক্ষণটা দেখি সেটা হলো যে, আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে যারা বসবাস করে, সেই সংখ্যালঘু জুম্ম জাতি বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে আমরা দেখি। সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আজকে আমাদের বুঝতে হবে,

আমাদের করণীয় কি হতে পারে তা ঠিক করতে হবে।

সংগ্রামী সমাবেশ আমার বক্তব্য প্রায় শেষ পর্যায়ে এসেছি। আমি যে বিষয়টা আপনাদের কাছে বলার চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে যে, আজকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ যে করণীয় কথা বলছে, যে প্রকার ঘোষণা দিয়েছে, সেই করণীয় বিষয়ে আপনি একজন ছাত্রছাত্রী হিসেবে, আপনি একজন যুব সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে, এই ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি হতে পারে, না পারে সেটা আপনাকে এগিয়ে এসে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও মতামত আপনাকে দিয়ে দিতে হবে। আজকে এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ যেটা বলার চেষ্টা করেছে, আমি মনে করি আজকের বাস্তবতা অনুযায়ী পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঘোষণাই হলো তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয়।

আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন, জুম্ম জনগণের অধিকার-স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, অস্তিত্ব সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক অধিকার, শাসনতান্ত্রিক অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের যে বাস্তবতা, সবকিছু মিলেই আজকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সেই কর্মসূচি ঘোষণা দিয়েছে, তাদের করণীয় বিষয়ে বলার চেষ্টা করেছে বলে আমি মনে করি। সে বিষয়ে আমাদের গভীরভাবে ভাবা দরকার। আজকের এই সমাবেশ বিগত সময়ের যে কোন সমাবেশের তুলনায় ২০১৭ সালের এই সমাবেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে আমি মনে করি। আমি তাই বলবো, আজকে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের এই কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে যে নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, যে নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে, সেই নেতৃত্ব এবারের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর যে স্লোগান ও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেটা তারা গভীরভাবে অনুধাবন করবেন। সেই অনুযায়ী দায়িত্ব প্রতিপালনে, তাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য প্রতিফলনে তারা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

আজকে এখানে অনেক ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজের মধ্যে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী হিসেবে রয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তাদের যে শিক্ষা জীবনের অনেক কিছু করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখানে একটা বিষয় হলো যে, এই জুম্ম ছাত্র বা ছাত্রীর মধ্যে অনেকেই আগামী দিনে কি করতে যাচ্ছেন, কি করবেন, সে ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্তহীনতায় থাকেন বলে আমি মনে করি। আমি বহু ছাত্রছাত্রী-দের সাথে কথা বলে দেখেছি তারা নিজেদের অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না। বুঝাতে পারে না যে তাদের ভবিষ্যৎ আগামী দিনে কি হবে। তবে তারা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ছাত্র সমাজের মধ্যে যারা দুদুল্যমান, যারা নিজেদের সুবিধা নিয়ে শুধু ভাবেন, যারা নিজেকে সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছেন, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনার তার থেকে বেরিয়ে আসুন।

আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বহু ভাষাভাষী ১৪টি জুম্ম জাতি আছে, তাদের মধ্যে থেকে শত শত ছাত্রছাত্রী পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছেন। এখানে দেখা যায়, ছাত্র সমাজের মধ্যে অনেকে নিজের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার কারণে তারা প্রকারান্তরে ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে যাচ্ছে এবং তারা শাসকগোষ্ঠীকে প্রকারান্তরে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে, যার বদৌলতে এদেশের শাসকগোষ্ঠী জুম্ম নিধনের, জুম্ম অস্তিত্ব বিলুপ্তির ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়িত করে চলেছে।

আজকে আমি স্মরণ করে দিতে চাই যে, আজকে পার্বত্যাঞ্চলের ১৩টি জাতিগোষ্ঠীর যে ছাত্র যুব সমাজ রয়েছে, তাদের উচিত হবে আমাদের মধ্যে এই অধিকার-স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার যে লড়াই সংগ্রামে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার। আমি মনে করি, আজকে আপনি যদি শুধু আপনার নিজেদের জীবনকে নিয়ে ভাবেন, আপনি যদি আপনার জাতিকে নিয়ে ভাবেন না, তাহলে সেটা বাস্তবোপযোগী হতে পারে না। আপনাকে সমগ্র জুম্ম ছাত্র সমাজের জন্য, সমগ্র জুম্ম জাতির জন্য আপনার ভাবনা করা দরকার, ঐক্যমতে যাওয়ার ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি এই বিষয়টা আজকে সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাদের সংগ্রামী দৃষ্টি, সংগ্রামী চিন্তা ভাবনা কামনা রেখে এই বিষয়টা বলতে চাচ্ছি।

আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বাস্তবতা কি? প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, চুক্তি বিরোধী যারা আছেন তাদের যে ভূমিকা লক্ষ করা যায়, নিঃসন্দেহে সেটা আত্মঘাতী ভূমিকা। আজকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থেকে, বিভিন্ন সংগঠনে যুক্ত থেকে, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত থেকে, এই প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, চুক্তি বিরোধীরা আজকে পার্বত্যাঞ্চলের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে চলেছে যাতে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত না হতে পারে; সে ধরনের ষড়যন্ত্রের জালে তারা আবদ্ধ হয়েছে। সে ধরনের ভূমিকায় তারা যুক্ত থেকে তারা নিজের জীবনকে নিয়ে ভাবছে।

আমি আজকে সেই প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, চুক্তি বিরোধীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি যে, আপনারা সতর্ক হয়ে যান। আপনারা নিজের যে অবস্থান সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবুন। অন্যথায় আগামী দিনে এই পার্বত্যাঞ্চলের বুকে আরো নতুন করে বেঁচে থাকার লড়াই সংগ্রাম শুরু হলে আপনারা কোথায় উবে যান তার ইয়ত্তা থাকবে না।

দীর্ঘ দুই দশক ব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত থেকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। কিন্তু ১৯ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও এদেশের সরকার শাসকগোষ্ঠী, বিশেষ করে যে সরকারের আমলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই শেখ হাসিনা সরকারের আমলে আজকে এই চুক্তিকে অবদমিত ও পদদলিত করা হচ্ছে। এই চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন করতে গিয়ে আজকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতিকে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ হিসেবে আখ্যায়িত করতে চাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ সরকার।

মূলত: পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পাহাড়ী মানুষেরা সংঘবদ্ধ হয়ে স্বাধীকার আদায়ের লড়াই করে এসেছিল, আজো তারা করে যাচ্ছে। আজকে সেই জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে মিথ্যা অজুহাতে মামলা দেওয়া হচ্ছে, অস্ত্র গুজিয়ে দিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, নির্মমভাবে শারীরিক অত্যাচার করা হচ্ছে। যারা আজকে সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, চুক্তি বিরোধী ভূমিকা পালন করছে তাদেরকে শেখ হাসিনা সরকার, এদেশের শাসকগোষ্ঠী, সেনা শাসকরা জামাই আদর করে

রেখে দিয়েছে। জনসংহতি সমিতির সদস্যরা এদেশের আপামর জনগণের একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য, একটা গণমুখী জীবনধারার জন্য লড়াই করছে। তারা পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আজকে নানা নামে নানাভাবে আখ্যায়িত করে শাসকগোষ্ঠী জনসংহতি সমিতির অস্তিত্বকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জনসংহতি সমিতির একটা সহযোগী সংগঠন। এই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কাছে যে বাস্তবতার দাবি রাখে, সেটা কি? সেটা হচ্ছে তাদের ভূমিকাও হতে হবে জনসংহতি সমিতির মতো।

পার্বত্যাঞ্চলে যারা শাসন করছে, আমি তাদের প্রতি এই আহবান রাখি যে, আপনারা গভীরভাবে ভাবুন। যে জনসংহতি সমিতি দীর্ঘ বছর ধরে লড়াই সংগ্রাম করে এখানকার সমস্যা সমাধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরে বাংলাদেশ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীকে বাধ্য করেছে, সেই জনসংহতি সমিতিকে আজকে চিরতরে লুপ্ত করার যে দমনপীড়ন শুরু করা হয়েছে, তা সফল হতে পারে না। সেটা কখনোই বাস্তব সম্মত নয়। সেই দমনপীড়ন কার্যক্রমের বিপরীতে পার্বত্যাঞ্চলে প্রতিরোধের একটা ধারা যে জন্ম নিবে না, সেটার কোন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।

আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বাস্তবতায় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্যাঞ্চলের মানুষদেরকে, পাহাড়ীদেরকে নাগরিক হিসেবে মনে করে না। এজন্য এদেশ যারা শাসন করছেন, যারা সেনাশাসক, কেন্দ্রীয় শাসক তারা মিলিতভাবে পার্বত্যাঞ্চলকে আজকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হলো, এই পার্বত্যাঞ্চল হচ্ছে জুম্ম জনগণের। পার্বত্যাঞ্চলের পূর্ব-পুরুষেরা, জুম্ম জনগণের পূর্ব পুরুষেরা স্বাপদ-সঙ্কুল বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে, হিংস্র জন্তু জানোয়ারের সাথে লড়াই করে এই পার্বত্যাঞ্চলকে আবাদযোগ্য করেছে। এই জমি, এই মাটি, এই পার্বত্যাঞ্চল হচ্ছে জুম্ম জনগণের। এই অধিকার বাংলাদেশের কোন সরকার, কোন শাসকগোষ্ঠী, কোন শক্তি কেড়ে নিতে পারে না। জুম্ম জনগণের এই মাটি, এই জন্মভূমির উপর তাদের যে অধিকার, সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য, ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম জনগণ কোনদিন পিছিয়ে থাকবে না, থাকতে পারে না। আমরা জনসংহতি সমিতি, আমরা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি, গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী যারা এই পার্বত্যাঞ্চলের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম, যুক্ত আছি, যুক্ত থাকবো আমরা শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্র মেনে নিতে পারিনা। আমরা এই পার্বত্যাঞ্চলের বুকে জুম্ম জনগণের জীবনধারাকে অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করে ছাড়বোই ছাড়বো। সবাইকে ধন্যবাদ।

কাউন্সিল অধিবেশন: ২ মে ২০১৭ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপির বিদায়ী সভাপতি বাচ্চু চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অধিবেশনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা। এই অধিবেশনের মাধ্যমে জুয়েল চাকমাকে সভাপতি, সুমন মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মনিশংকর চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩১ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বিদায়ী সভাপতি বাচ্চু চাকমা। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা। শ্রী লারমার উক্ত বক্তব্য হুবহু নিম্নে পত্রস্থ করা হলো-

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ২২তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ২২তম কাউন্সিলের মধ ্যদিয়ে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ এবং সেই সাথে এই পার্বত্য অঞ্চলের যুব সমাজের যে বর্তমান অবস্থা, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই সংগ্রামে তাদের যে পদাচারনা ও বাস্তবতা, সেটার প্রতিফলন মনে হয় আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ছাত্র সমাজ কতটুকু নিজেদেরকে সংগঠিত করতে পেরেছে, আদর্শ সংহত করতে পেরেছে এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের অবস্থানকে কতটুকু তারা দৃঢ় করতে পেরেছে তার প্রতিফলন হিসেবে এই সম্মেলন।

বিগত সময়েও আমরা দেখেছি এই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং তাদের কাউন্সিল, তাদের ভূমিকা, কার্যক্রম, তাদের বক্তব্য, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন আচার-আচরণ ইত্যাদি। আমি বলতে চাচ্ছি যে, এবারের একটা বিশেষ বাস্তবতার প্রেক্ষপটে তাদের সংগ্রামী ভূমিকা এবং বাস্তবতাকে তারা তাদের অন্তরে স্থান দেয়ার চেষ্টা করছে। আমি মনে করি তাদের মধ্যে সচেতনতা আগের যে কোন সময়ের তুলনায় সম্প্রসারিত হচ্ছে। শুধু এবারের কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে যে নেতৃত্ব তারা নির্বাচিত করেছে সে নেতৃত্ব আগামী দিনে বা অদূর ভবিষতে তাদের কি ভূমিকা হতে পারে না পারে সে সম্পর্কে বলতে চায়।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী সময়ে আমরা অনেক কাউন্সিল দেখেছি, কমিটি গঠিত হয়েছে, দায়িত্ব নিয়েছে এবং যতদিন তারা ছাত্র জীবনে ছিলেন ততদিন আমরা দেখেছি তাদের কর্মতৎপরতা। কারো কারোর সেই কর্মতৎপরতা চোখে পড়ার মতো। আবার অনেকে নিষ্ক্রিয় থেকে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। আজকে যে বিষয়টা সবচেয়ে আমার মনে জাগে সেটা হলো- এই যে ছাত্র সমাজ যারা যুব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যারা একটা জনগোষ্ঠীর, একটা অঞ্চলের তথা সারা বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে তারা আগামী দিনে কি ধরনের ভূমিকার মধ্যে অবতীর্ণ হবেন সেটা ভাবনার মধ্যে এসে যায়।

১৯৯৭ সালের পরে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ছাত্র সমাজের সঙ্গে, তাদের কর্মকান্ডের সঙ্গে শুধু না, তাদের মানসিক জগতের সাথেও আমি যুক্ত থাকার চেষ্টা করেছিলাম। আমি অনেকজনকে দেখেছি যাদের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দেখা গেছে যে, একটা বিশেষ সময়ে তারা হারিয়ে গেছে এবং আমি তাদের হারিয়ে যাওয়ার পেছনের কারণগুলো জানার চেষ্টা করেছি। আমাদের জুম্ম সমাজ

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজ হিসেবেই আমরা চিহ্নিত করেছি, যে সমাজে পদে পদে সামন্তবাদী চিন্তাধারা, সামন্তবাদী জীবনধারা আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেই সমাজের মধ্যেই এই ছাত্র সমাজ বা যুব সমাজ। তাই স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি আদর্শগত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এই যে হারিয়ে যাওয়া বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার কারণগুলো বা নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারার উত্তর সেখানে খুঁজে পেতে পারি।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বাস্তবতা তা হলো- জুম্ম ছাত্র সমাজে জাতিগতভাবে যেমন বিভক্তি ও বিভেদ আছে, তেমনি একই জাতির মধ্যেও আদর্শগত কারণেই যে মতবিরোধ বা বিভেদ সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করি। পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা আমরা বসবাস করে আসছি এক বাক্যে আমরা যাদেরকে জুম্ম বলে থাকি তাদের মধ্যে যে বিভেদ-বৈষম্য সেটাকে সমাজের গভীরে গিয়ে জানতে হবে। আমাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতিগত সহিংসতা না থাকলেও এখানে জাতি বিশেষে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রত্যক্ষ করি তাদের পদচারণায়। তাদের বক্তব্য, তাদের কর্মকান্ড, আচার-আচরণের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যাগতভাবে তুলনা করলে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো ইত্যাদি জাতিসত্ত্বাসমূহের মধ্যে কোন জাতির ছাত্র সমাজ বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন সেটা সঠিকভাবে বলাটা কঠিন। সাধারণত: আমরা বলতে পারি যে, ব্যক্তিগতভাবে যার চিন্তাধারা যেমন, যার আদর্শ যে ধরনের, সেটার উপরই ভিত্তি করে যোগ্যতা নিরূপন হতে পারে।

জুম্ম সমাজে চাকমারা সংখ্যায় বেশি বটে। চাকমা ছাত্র সমাজে অনেক ছাত্র তারা এগিয়ে যাচ্ছে প্রগতিশীল আদর্শ ধারণ করে, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে সমুন্নত রেখে। পাশাপাশি আমরা দেখি- তার বিপরীতে প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী এবং শাসকগোষ্ঠীর সাথে সামিল হয়ে জুম্ম জাতীয় স্বার্থ বিরোধী তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের অধিকাংশই চাকমা। স্পষ্টভাবে যদি বলি- ১৯৯৮ সালে ইউপিডিএফ-এর মধ্যে বা চুক্তি বিরোধীদের মধ্যে কতজন অন্যান্য জাতিসত্ত্বার ছাত্র ছিলেন? নেতৃত্বের মধ্যে আমরা দেখেছি, ঐ চাকমারাই নেতৃত্বে ছিল। প্রসিত খীসা ছাত্র পরিষদে ছিলেন। কোন একসময় সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। তাই এখানে বলতে চাচ্ছি যে, সংখ্যায় বেশি হলে যে তাদের ভূমিকাটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হবে সেটা নয়। আর সংখ্যায় কম হলে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেমে তারা পিছিয়ে থাকবে তারও কোন মানে হয় না।

সেই প্রসিত খীসার নেতৃত্বে আজকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের পথে তারা যে অন্তরায় সৃষ্টি করে আছে তাদেরকে কার সাথে, কোন পক্ষের সাথে তুলনাই বা করতে পারি। তবে এটাই বলতে পারি যে, ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম-স্বার্থ বিরোধী যে ভূমিকা পালন করে আসছে এটা খুবই মারাত্মক, ধ্বংসাত্মক। যা কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রহণযোগ্যতা থাকতেই পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ আজও তার সেই চুক্তি বিরোধী, জুম্ম-স্বার্থ বিরোধী, জনসংহতি সমিতির বিরোধী ভূমিকা পালন করে আজও রয়ে গেছে। সেই অপতৎপরতা আজকে শুধু পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শুধু বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় পর্যন্ত রয়েছে। এই ইউপিডিএফ এর কাজ গ্রহণযোগ্যতা না থাকলেও, আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হলেও, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামের পথে অন্তরায় হলেও আমরা তো দেখি দিব্যি তারা তাদের হীনকর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি বলতে চাচ্ছি যে, সামগ্রিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে জুম্ম ছাত্র সমাজ সেই জুম্ম ছাত্র সমাজের যে বাস্তব চিত্র সেটা নিঃসন্দেহে আমি মনে করি সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু সেটা বিষয় নয়, বিষয়টা হলো যাদের মাঝে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, সাম্যবাদী চেতনাবোধ আছে তারা এগিয়ে আছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের প্রবক্তা যারা ছিলেন, দেশপ্রেমিক ছিলেন, জাতীয়তাবাদী ছিলেন তারাও এক সময় ছাত্র ছিলেন এবং তারা প্রগতিশীল, সাম্যবাদী আদর্শের অনুসারী ছিলেন। বিশেষ করে ১৯৬০ দশকে দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে, তৎকালীন পাহাড়ী ছাত্র সমাজে অনেকে ছিলেন প্রগতিশীল, সাম্যবাদী আদর্শের অনুসারী। আজকে আমরা স্মরণ করতে পারি মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার কথা, যিনি এক সময়ে ছাত্র ছিলেন, যিনি পাহাড়ী ছাত্র সমিতির নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং পাহাড়ী ছাত্র সমিতির মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক একটা নেতৃত্ব গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন এবং আমি মনে করি সেটা তিনি বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছেন। আজও সে ধরনের প্রগতিশীল, সাম্যবাদী আদর্শের ছাত্র নিশ্চয়ই থাকবে এবং তিনি যেকোন জাতিসত্ত্বা থেকে হতে পারেন। তা সুনির্দিষ্টভাবে কোন জাতি থেকে হতে পারে বলা যায় না।

আমি মনে করি, বর্তমান জুম্ম ছাত্র সমাজ তাদের যে প্রতিনিধিত্ব করার বাসনা, তাদের মধ্যেও প্রগতিশীল, সাম্যবাদী আদর্শ ধারণ করে নিজেকে এগিয়ে নিতে নিরন্তর প্রচেষ্টায় রয়েছেন। আমি দেখেছি বিগত সময়েও অনেক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হারিয়ে গেলেও এগিয়ে যাওয়ার তাদের প্রচেষ্টা সবসময় ছিল। অত্যন্ত কঠিন সময়েও এই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ যে সাহসিকতা রেখেছিল, যেভাবে তারা তাদের দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ জাগ্রত রেখে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তা কোন প্রকারে অস্বীকার করা যায় না। অধিকার আদায়ের জন্য তাদের আকাঙ্খা, বাসনা সেটাকে তারা ধারণ করতে পেরেছে বলে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ অতি দুঃসময়েও ঠিকেছিল এবং আজকের এ পর্যায়ে উপনিত হতে পেরেছে।

আজকের এই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ তাদের কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে তারা যে নেতৃত্ব নির্বাচিত করেছেন সে নেতৃত্বের প্রতি আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধাবোধ আছে, অভিনন্দন আছে। পাশাপাশি কামনা করি যে, এই নেতৃত্ব অধিকতরভাবে পার্বত্য অঞ্চলে বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাদের সাহসী ভূমিকা উজ্জীবিত থাকবেন এবং পার্বত্য অঞ্চলের যুব সমাজকে আরো অধিকতর দৃঢ় অবস্থানে নিয়ে যেতে বিশেষ ভূমিকা রাখবেন। এই কামনা আমাদের প্রত্যেকের, আমি বিশেষভাবে এটাই কামনা করি।

আজকে পার্বত্য অঞ্চলে যে সামগ্রিক পরিস্থিতি, যে রূঢ় বাস্তবতা, কঠিন বাস্তবতা, যার মধ্যে আমাদের কারো নিরাপত্তা নেই, তাতে সীমাহীন দুঃখ দুর্দশা, বেদনা, যন্ত্রণা, শোষণ-নিপীড়ন, অত্যাচার বঞ্চনার মধ্যে আমাদের জীবন চলছে। এটা আমরা বুঝি, বোঝাতে পারি, যে কোন সময় যে কোনভাবে আমাদের বোঝানোর মতো সক্ষমতা রাখি। আজকে তাই সেটার প্রেক্ষিতে বলতে চাচ্ছি যে, এর মধ্যে থেকেও আমাদের যে এগিয়ে চলার সাহস রাখতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তবতার নিরিখে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে তার অগ্রণী ভূমিকা, যুব সমাজকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ববোধ বাড়াতে হবে এবং তাদের আরো অধিকতর ভূমিকা রাখার প্রয়োজন হতে পারে। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নেতৃত্ব দরকার সে নেতৃত্ব গঠনে, নেতৃত্ব বিকাশে এই পাহাড়ী ছাত্র সমাজকে আরো অধিকতর ভূমিকা পালন করতে হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে আমার যে অভিজ্ঞতা, আমি দেখেছি- পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে মাত্র দু'একজন ব্যক্তি জুম্ম জনগণের কথা ভাবতেন। সামন্ত নেতৃত্ব, রাজা-হেডম্যান-কার্বারীরা ছিলেন নীরব। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির সময়ও তারা ছিলেন নির্বিকার। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের সময় এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও আমি দেখেছি এই নেতৃত্ব আমাদেরকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু কিছু সংখ্যক ছাত্র এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।

১৯৪৭ সালের সময়ে সামন্ত নেতৃত্ব এতই শাক্তিশালী ছিল যে, দেশ বিভক্তি সময় প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ধারায় জুম্ম জনগণকে এগিয়ে নেয়ার অনেক অনেক চেষ্টার পরও সামন্ত নেতৃত্বের বাধা অতিক্রম করতে পারেনি। তার পরবর্তী পঞ্চাশ দশকে প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ তাদের জীবনকে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। ষাট দশকে এসে আমাদের এম এন লারমার নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে এবং পরবর্তীতে একটা রাজনৈতিক নেতৃত্বও গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। সেই নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ স্বপ্ন দেখতে থাকে যে, তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাবে, সকল প্রকার শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভ করে একটা স্বাধীন জীবন তারা পাবে। এই স্বপ্ন, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তারা সংগ্রামে শরীক হয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান রচিত হলো। সেখানে আমাদেরকে অস্বীকার করা হলো। খুব দ্রুত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে একটা অসহায়, অনিশ্চিয়তার দিকে যখন শাসকগোষ্ঠী ঠেলে দিয়েছিল তখন জুম্ম জনগণ সেই পার্টির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দীর্ঘ এই লড়াই সংগ্রামে অনেক সমস্যা, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা সত্ত্বেও জুম্ম জনগণ তারা এগিয়েছে। ১৯৮০ দশকে সেই চার কুচক্রীর যে চক্রান্ত ১৯৯৭ সালের চুক্তির পরেও আমরা দেখেছি একই চক্রান্ত। এতকিছুর পরও আমি দেখেছি ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ তারা পরিস্থিতি এবং বাস্তবতা সম্পর্কে সদা সচেতন ছিল, তারা জাগ্রত ছিল। জনসংহতি সমিতির পতাকাতলে সমবেত হয়ে ছাত্র-যুব সমাজ যে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে তা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। যে কারণে পার্টি সাহসী পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাবোধ করেনি। জুম্ম সমাজের অগ্রগামী বাহিনী ছাত্র-যুব সমাজকে নিয়ে জনসংহতি সমিতি তার রাজনৈতিক সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। পার্টির নেতৃত্ব বিশ্বাস রাখে যে, ছাত্র-যুব সমাজ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে। তবে কিছুটা সংশয় রয়েছে বটে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাস্তবতা এবং সামন্তবাদী চিন্তাধারা এই সংশয় সৃষ্টি করেছে।

যেহেতু ছাত্ররা লেখাপড়া করছেন, আধুনিক জগতের সাথে যুক্ত হচ্ছেন, তাদের চিন্তাধারার মধ্যে গোটা বিশ্ব সমাজের চিন্তাধারা আলোড়িত এবং একারণে ছাত্র সমাজ এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা নতুন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। তাই ছাত্র সমাজের তার প্রগতির দিকটাকে নিয়ে আমরা আশাবাদী। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে নেতিবাচক চিন্তাধারা এবং এখান থেকে বেরিয়ে আসার যে প্রক্রিয়া- দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং প্রগতির ভাবনা ছাত্রদের মধ্যে কারো না কারোর অন্তরে আলোড়িত করে এবং নিজেকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সেটা নিবিষ্টভাবে সচেষ্ট আছে বলে আমি মনে করি।

আজকে যে বিষয়টা আমি প্রাধান্য দিয়ে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো- আমাদের জুম্ম সমাজে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন দেশপ্রেমী হওয়া, জাতীয়তাবাদী হওয়া খুবই কঠিন। তার চেয়ে কঠিন সাম্যবাদী আদর্শে সমুন্নত হওয়ার দিকটা। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে, একজন ব্যক্তি যদি মানুষের জন্য, দেশের জন্য, স্বজাতির জন্য, পরিবারের জন্য, সবার জন্য যদি সবচেয়ে উত্তমটা করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই সবচেয়ে প্রগতিশীল সাম্যবাদী আদর্শকে ধারণ করতে হবে। এই ছাত্র সমাজের অনেকে বিগত সময়ে অনেক অনেক ভূমিকা রেখেছেন, আশা সঞ্চার করেছেন। দেখা গেছে যে যিনি সবচেয়ে বেশি এগিয়ে এসেছিলেন, অনেক অনেক কিছু করা চেষ্টা করেছিলেন, অনেক ভালো বক্তব্য দিয়েছেন, তিনি হারিয়ে গিয়েছেন। এই হারিয়ে যাওয়ার পিছনে যে কারণ, সেটা হলো আদর্শের যে সংঘাত, আদর্শের যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সেখানে ছিল বিধায় সে ঠিকে থাকতে পারেনি। ফলে সামগ্রিক বাস্তবতায় সে হারিয়ে গিয়েছে, হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

কিন্তু আজকে আমি যেটা বলতে চাই, পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম সমাজ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে পিছিয়ে আছে এটা ঠিক। তাই বলে একজন ছাত্র তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন, নিজের দেশকে জানছেন, স্বজাতিকে জানছেন, পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের উপর যে নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা সবকিছু দেখছেন, তিনি তার দিকটাও দেখছেন, তার আজকে বাস্তভিটাও নেই, সবকিছু হারিয়েছেন, একটা ভাসমান মানুষের মত একটা জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাকে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে এইটুকুই তার সামনে উপস্থিত। তার সামনে আর কি দেখা যায়- এখানে সেনাশাসন, লক্ষ লক্ষ সেটেলার, এখানকার অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে তারা বাইরের, এখানে শাসন ব্যবস্থাপনায়, প্রশাসনিক ব্যবস্থানায় সবাই তো বাইরের। আজকের এই বাস্তবতা তো আমরা দু'চোখে দেখি,

আমরা মনচক্ষু দিয়েও সেটা দেখে থাকি। আজকে আমাদের জীবনের চারিপাশে যে উপনিবেশিক কায়দায় বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী শোষণ-নিপীড়ন চালাচ্ছে দীর্ঘ ৪৭ বছর ধরে। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে এখানে সেনাশাসনে নিষ্পেষিত হতে হতে আজকে আমরা এই পর্যায়ে এসে গেছি। তবে আমাদেরকে আটকাতে পারবে না, আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

আজকে এখানে আমরা আলাদাভাবে ভাবতে যাবো কেন। আমি চাকমা, আমি মারমা, আমি ত্রিপুরা, আমি খিয়াং, লুসাই, পাংখোয়া ইত্যাদি ইত্যাদি নামে আলাদাভাবে আমরা ভাবতে যাবো কেন। আমি যদি আলাদাভাবে শুধু আমারটাই দেখি- তাহলে আমার মুক্তি, আমার অধিকার কিভাবে ফিরে পাবো? এ তো হয় না এবং হতে পারে না। বরং সামগ্রিক চিন্তাভাবনাটাই জরুরী। আমরা সংখ্যায় কম, সবকিছুতেই পিছিয়ে পড়া, সুতরাং আমাদের যৌথবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে এবং অগণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। আমরা লড়াই যদি করতে চাই, তাহলে যৌথবদ্ধ হয়ে আমাদের করতে হবে। আমরা যদি আলাদা আলাদা করে ভাবি তাহলে তো হয় না।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ যার জন্ম ১৯৮৯ সালে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজ তো আরো অনেক আগেই মুক্তিকামী হয়েছিল বা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যুক্ত ছিল। পাহাড়ী ছাত্র সমিতির মাধ্যমে পঞ্চাশ দশকে যে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সে সাহসী যাত্রা শুরু করেছিল, সেটা তো থেমে থাকেনি। তারা তো এগিয়ে গেছে এবং ষাট দশকে আমরা দেখেছি পাহাড়ী ছাত্র সমাজ নবজন্ম লাভ করেছিল। তারা নতুন করে জীবনকে ভাবতে শুরু করে এবং ঘুণেধরা সামন্তবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে, তথাকথিত উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রদের বাধা পেরিয়ে এগিয়ে গেছে। ষাট দশক থেকে আজকে ২০১৭ সাল দীর্ঘ ৫৭ বছর ধরে এগিয়ে চলছে। একটা সময়ে তৎকালীন সরকার পাহাড়ী ছাত্র সমিতির কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেও ১৯৭৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজ আবারে নতুন করে মহান নেতা এম এন লারমার নেতৃত্বে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে অধিকার আদায় করতে হবে। তার মানে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট অনুসারে ছাত্র সমাজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারে এবং তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের ছাত্র সমাজ কিছুটা সময় দ্বিধাগ্রস্ত থাকলেও আবার নতুন করে যৌথবদ্ধ হয়েছে যেখানে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা ইত্যাদি নির্বিশেষে; আলাদা ভাবে নয়।

আমি যেটা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে যাচ্ছি, সেটা হলো- আমরা অনেক কিছু শিখেছি, জেনেছি, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। অনেক অনেক আঘাত পেয়েছি, অনেক যন্ত্রণা-বেদনা নিয়ে আমরা অনেক কিছুর মুখোমুখি হয়েছি। আমাদের অনেক দ্বিধা-সংশয় তাও দেখেছি। আজকে আমাদের সামনে বিশাল একটা পর্বতসম বাধা বা সমস্যা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মধ্যে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ, যারা শাসকগোষ্ঠী দ্বারা লালিত-পালিত, যারা ক্রমাগতই আঘাত করে যাচ্ছে। সেই সাথে ২০০৬ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে উপদল, তারাও আজকে আমাদের সামনে বাধা হয়ে উপস্থিত। আজকে আমাদের এই পর্বতসম সমস্যা ডিঙাতে হচ্ছে, এই সমস্যাটা অবশ্যই নিরসন করতে হবে। যেহেতু তারা সংঘাতময়, শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে যদি সমস্যা সমাধান করা না যায়, তাহলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সেটা নিরসন করতে হবে।

আজকের আমাদের সামনে সেনাশাসন। বিশাল সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলের বুকে আমাদের সামনে দন্ডায়মান। আমাদেরকে কোনকিছুই করতে দেয় না তারা, আমাদের ভাবনা তারা শ্রদ্ধা করে না, সম্মান করে না। আজকে তারা প্রতিনিধিত্ব করছে উগ্র জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী বাংলাদেশ সরকার ও শাসকগোষ্টির স্বার্থ রক্ষার জন্য। তারা প্রহরীর ভূমিকায় শুধু নয়, তারা আমাদেরকে ধ্বংস করার কার্যকর ভূমিকায় পার্বত্য অঞ্চলের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে প্রায় সাত লক্ষ সেটেলার বাঙালি আমাদেরকে চেপে ধরে বসে আছে। প্রতিদিন তারা আমাদের ভূমি বেদখলের চেষ্টায় আছে, প্রতিদিন তারা জুম্ম জনগণের উপর নির্বিচারে অত্যাচার-অবিচার করছে। এখানে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদে প্রতিনিধিত্বকারী তিনটি জেলায় ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ে অনেক আমলা, অনেক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে অনেক কর্মকর্তা, এককথায় বেসামরিক আমলা বাহিনী আছে। এই বিশাল বেসামরিক আমলা বাহিনী তারাও আমাদের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ রেখে আমাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আজকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বহিরাগত বাঙালি ধনীরা এখানকার আমলা বাহিনীর সাথে আঁতাত করে পুরো অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। জুম্মদের সম্পদ লুটপাট করছে এবং জুম্মদেরকে একেবারে মজুর শ্রেণিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এগুলো তো আমরা সবাই জানি। কাজেই কোথাও আমাদের নিরবে-নিবৃতে বসবাস করার জায়গা নেই। গতকাল থেকে আজ পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিরা অনেক কথা বলেছেন, বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, আমরা অনেক গভীরে গিয়ে অনুধাবন করার, অনুসন্ধান করার চেষ্টা করি।

আমি মনে করি দুটো বিষয় আমাদের সামনে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে দু'টো বিষয় হচ্ছে- সরকার যেভাবে উপনিবেশিক কায়দায় জুম্ম জনগণকে শাসন-শোষণ করছে, উন্নয়নের নামে যা কিছু করছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে যা কিছু করছে এবং এখানকার মানুষের জীবন নিয়ে সরকার যা কিছু করছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ইত্যাদিকে ঘিরে, সেগুলো কি আমরা সেভাবেই মেনে নেবো? নাকি আমরা মানবো না, কোনটা? আমাদের সিদ্ধান্তে উপনিত হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সামগ্রিক বাস্তবতা সেটাকে অনুধাবন করে, উপলব্দি করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি কি সরকার যা করছে তাই মেনে নেবো? নাকি সেটাকে মেনে না নিয়ে অন্য কিছু করার কথা ভাববো, কোনটা?

বাংলাদেশ সরকারকে একটা উপনিবেশিক সরকার বলতে পারি। কেননা সেই উপনিবেশিক পাকিস্তান সরকার যেভাবে শাসন-শোষণ করেছিল সেই একই কায়দায় বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণকে শাসন-শোষণের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।

চূড়ান্তভাবে আমাদের অস্তিত্বকে বিলিন করে দিতে চায় শাসকগোষ্ঠী। কাজেই এই যে বাংলাদেশ সরকার যা করছে সেটা কোন অবস্থাতেই আমাদের ভালোর জন্য নয়। যদি হতো তাহলে চুক্তি কেন বাস্তবায়ন করবে না? পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করতে এত বছর তো প্রয়োজন হতে পারে না। বিভিন্ন দলের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করার পর ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা সরকারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তখন ৩ বছর ৮ মাস সময় তারা পায় এবং ২০০৯ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৮ বছর শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু ৮ বছরে শেখ হাসিনা সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি। কাজেই চুক্তি বাস্তবায়নের কোন সম্ভাবনাই নেই।

আগামী পঞ্চাশ বছরেও বাংলাদেশে একটা গণমুখী, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসতে পারবে বলে আমি মনে করি না। বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয় পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে এবং তার চেয়েও বেশি জটিল একটা আবর্ত সৃষ্টি হতে পারে ধর্ম বা সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশ একটা মুসলিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী আমাদের অমুসলিমদেরকে মানতে চায় না, মেনে নিতে পারে না এবং আমাদের অস্তিত্বকে চিরতরে নির্মূল করে সেখানে তারা অন্যকিছু করতে চায়, ভাবতে চায়। আমাদেরকে অধিকার দেবে না। যদি দিতে চাইত তাহলে চুক্তি বাস্তবায়ন হতো, চুক্তি বাস্তবায়ন করতো। ৩ বছর ৮ মাস বাদই দিলাম পরবর্তীতে ২০০৯ সাল থেকে নতুন করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে শেখ হাসিনা সরকার। চুক্তি বাস্তবায়নে যদি আন্তরিকতা থাকতো তাহলে অনেক কিছু করতে পারতো এই ৮ বছরে। বরঞ্চ তা না করে যাতে আমরা দ্রুত একটা অসহনীয় পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হই, সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নানা ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে।

আগামীতে আবার নির্বাচন হবে, নতুন সরকার গঠন হবে কিন্তু আমাদের অবস্থা সেই একই তিমিরে থেকে যাবে। কারণ বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র হচ্ছে- তারা মুসলিম। তাদের জীবনটাই হচ্ছে ধর্ম ভিত্তিক। ইসলামের বিধি-বিধানের বাইরে তাদের ভাববার সুযোগ নেই। সুতরাং বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর কাছে আমরা অবাঞ্ছিত। আর আগামীতে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় সেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন বামপন্থী রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসতে পারবে বলে আমার মনে হয় না। সেই সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। সুতরাং আজকের এই অবস্থাতেই আমাদের কী করণীয় হতে পারে? আমরা সরকার যা করছে তা মেনে নেবো? মেনে নেওয়া মানে হচ্ছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া, বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রোতধারায় বিলীন হওয়া। তার পাশাপাশি সর্বস্ব হারা হওয়া। ভূমি অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, শাসনতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া। শুধু জাতীয় স্রোতধারায় নিজেকে বিলীন হওয়া নয়, সর্বস্ব হারিয়ে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার যে বাস্তবতা সেটা কোনভাবে মেনে নেওয়া কি সম্ভব?

এখানে দেখা যায় যে, আমাদের সমাজে যারা চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, ঠিকাদারী করেন বা অন্যান্য পেশাজীবী যারা আছেন তারা অনেকে মুরুব্বিসূলভ বক্তব্য দেন যে- চেষ্টা করে দেখা যাক না। চেষ্টা করতে করতে যা পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে একটা বাস্তবতা থাকলেও, যুক্তি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এই পর্যায়ে এসে আমরা কি পেয়েছি বা কি পাচ্ছি? সুতরাং আপনারা এখন কি করবেন? আপনাদের মধ্যে তারুণ্য শক্তি আছে, সংগ্রামী মেজাজ আছে। এই শক্তিকে যদি আদর্শগতভাবে কাজে লাগাতে না পারি তাহলে কি পরিণতি হতে পারে? আজকের এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বা মুখোমুখি হতে হবে। এমতাবস্থায় ছাত্র-যুব সমাজ কি করবে? সরকার যা করতে চাচ্ছে তা মেনে নেবে? না অন্য কিছু করবে? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেটা হয় না, মেনে নেয়া যায় না। মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না।

আমরা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য দীর্ঘসময় ধরে লড়াই-সংগ্রাম করে আসছি। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই সম্মেলন। এই সম্মেলনে আপনাদের যে ঘোষণা- সুবিধাবাদী, দালাল, প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিরোধ করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে জোরদার করুন। তাহলে আজকের যে বাস্তবতা সে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামকে উচ্চমার্গে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে টুটি চেপে ধরেছে শুধু নয়, একেবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সকল প্রকার হীনকার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে বাস্তবতা এই বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে তার মুখোমুখী হতে হবে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলে চলবে না, আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। যে ধরনের আন্দোলন-সংগ্রাম আমাদের প্রয়োজন, সেটাই যেন গ্রহণ করতে পারি। যে কোন ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মানসিকতা থাকতে হবে, আদর্শগতভাবে প্রস্তুত হতে হবে। আমি আশা করি- পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পতাকাতলে জুম্ম ছাত্র সমাজ অবশ্যই আরো অধিকতরভাবে ঐক্যবদ্ধ হবেন, তারা আরো সংগ্রামে উজ্জীবিত হবেন।

এখানে সবশেষে যে কথাটা বলে শেষ করছি, সেটা হলো- সামন্তবাদী চিন্তাধারা পরিহার করতে হবে, ভুল চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যতদূর সম্ভব মতাদর্শগত সংগ্রাম অর্থাৎ পেটি-বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সাম্যবাদী আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে এগিয়ে থাকতে হবে। যুব সমাজকে আরো অধিকতরভাবে সাম্যবাদী আদর্শে আলোড়িত হতে হবে। আমরা যেটা করতে পারি নাই বা যতটুকু আমরা করেছি, সেটার উপর ভর করে ছাত্র-যুব সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে। আজকের এই নির্মম বাস্তবতার অন্ধকার গহ্বর বেরিয়ে আসতে হলে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে শাসকগোষ্ঠীর যে উপনিবেশিক শোষণ-নিপীড়ন সেটাকে অবশ্যই প্রতিহত করতে হবে। পার্বত্য চুক্তিই শুধু নয়, তার চেয়ে অধিকতর যদি কোন কিছু আমাদের অর্জনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় সেক্ষেত্রে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে, থাকার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

বিশেষ প্রতিবেদন

পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী কার্বারী-হেডম্যান সম্মেলনঃ

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে ও নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে নেতৃত্ব বিকাশে নারী হেডম্যান-কার্বারীদের এগিয়ে আসার আহ্বান সন্তু লারমার

নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নারী যদি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও সাম্যবাদী নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন তবেই তিনি সমাজকে অধিকতর এগিয়ে নিতে যোগ্যতর ভূমিকা পালন করতে পারবেন। সমাজ জীবনে নারীর প্রতিনিধিত্বের অপরিহার্যতা প্রমাণে এবং সমাজ বিকাশে ও সমাজ উন্নয়নে নারী হেডম্যান-কার্বারীদের সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের আরো অধিকতর সচেতন হতে হবে। - রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইস্টিটিউট মিলনায়তনে সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক ও নারী হেডম্যান-কার্বারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান-কার্বারী সম্মেলনে এ আহ্বান জানান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা।

উল্লেখ্য, 'পার্বত্য আদিবাসী সমাজ উন্নয়নে নারীদের প্রতিনিধিত্ব অত্যাবশ্যক' প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ১২ ও ১৩ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি সাংস্কৃতিক ইস্টিটিউট মিলনায়তনে সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্ক ও নারী হেডম্যান-কার্বারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান-কার্বারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন ঘোষণা করেন চাকমা সার্কেলের সার্কেল চিফ ব্যারিস্টার রাজা দেবাশীষ রায়। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরকল উপজেলার চেয়ারম্যান মণি চাকমা, ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ-এর জেন্ডার এন্ড লোকাল কনফিডেন্স বিল্ডিং ক্লাস্টার সম্পর্কিত টিম লিডার ঝুমা দেওয়ান। উক্ত উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সহ সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপুরা এবং স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সিএইচটি হেডম্যান নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক শান্তি বিজয় চাকমা। দু'দিনব্যাপী উক্ত সম্মেলন চারটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়।

দু'দিনব্যাপী পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান-কার্বারী সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি, জুম্ম জাতিগোষ্ঠীসমূহের সমাজব্যবস্থা, শাসকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম, নারী হেডম্যান-কার্বারীদের ভূমিকা ও যোগ্যতা অর্জন সম্পর্কে বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর সেই নাতিদীর্ঘ বক্তব্য হুবহু পত্রস্থ করা হলো-

'আদিবাসী সমাজ উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব অত্যাবশ্যক'– এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী কার্বারী-হেডম্যান সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ, সমবেত সম্মানিত মহিলা কার্বারী-হেডম্যান ও সুধীবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সবাইকে আমি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কিছুক্ষণ আগে আমরা আজকের এই সম্মেলনের স্বাগত ভাষণ শুনেছি, সেই স্বাগত ভাষণে এবারে সম্মেলনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলা হয়েছে। তাছাড়া এখানে আজকের এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের বিরাজমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে আজকের বিকালের অধিবেশনে আরো অনেক বক্তব্য আসতে পারে এবং আগামীকাল দ্বিতীয় দিনের শেষ দিনে পুরো অধিবেশনে যে বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়েছে তাতে এই সম্মেলনের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলো প্রতিফলিত হয়েছে, যেগুলো সম্মেলনের

বাস্তবতার আলোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে হেডম্যান-কার্বারী সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্যমান পরিস্থিতি, পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের সমস্যা, পাহাড়ী-বাঙালিদের যে দুর্বিষহ জীবন, নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চিত জীবন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য হেডম্যান ও কার্বারীদের কি কি ভূমিকা হতে পারে বা না হতে পারে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে আলোকপাত করা হবে এবং হেডম্যান-কার্বারীগণ তাদের স্ব স্ব কর্মস্থলে ফিরে গিয়ে তাদের কর্ম সম্পাদনে আরো উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে থাকবেন সেটা আমি কামনা রাখি আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

আজকের সম্মেলনে আমি তেমন কিছু বলতে যাচ্ছি না। শুধু একটা বিষয়ের মধ্যে আমি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চাই। পার্বত্য অঞ্চলের যে সমাজ ব্যবস্থা এবং তার যে অর্থনৈতিক বাস্তবতা, তাতে দেখা যায়, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। সবাই জানি এখানে পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী সমাজ বা জুম্ম সমাজের জীবনধারা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা বা সামন্ততান্ত্রিক দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। সে কারণে এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য অঞ্চলে শুধু সামাজিক জীবন নয় বা জাতীয় জীবনে নয়, সামগ্রিকভাবে আমাদের জীবনধারার উপর নারী কার্বারী ও হেডম্যানদের পর্যায়ে কি ধরনের ভূমিকা হতে পারে, না পারে সেটা গভীরে গিয়ে হেডম্যান-কার্বারীদের জানতে হবে বুঝতে হবে। তার মানে এখানে অনেক কিছু করার আছে, অনেক কিছু শেখার ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে, অনেক মতবিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা আছে।

আজকের এই সম্মেলনের যে মর্ম কথাটি বলা আছে তা হলো, আদিবাসী জুম্ম সমাজের উন্নয়নে নারী প্রতিনিধিত্ব অত্যাবশ্যক। নিঃসন্দেহে আমি এটার দ্বিমত পোষণ করি না। নারী-পুরুষ নিয়ে সমাজ বা আমাদের জীবনধারা। প্রাণী জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী ও সর্বোৎকৃষ্ট এবং মানুষের জীবনধারায় শুধু এককভাবে পুরুষেরাই থাকবেন, নারীরা থাকবেন না, তাদের বাদ দিয়ে পুরুষেরা জাতীয় জীবনের সবকিছু করে নিবেন এটা হয় না, হতে পারে না। সমাজ বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখেছিলাম আদিকালে নারীরা সমাজ জীবনে বৈষম্যহীন জীবনের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক পালা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যখন অর্থনীতি পুরুষের হাতে গেলে, পুরুষের নিয়ন্ত্রণে গেলে, তখন থেকে সমাজ জীবনে নারীর উপস্থিতি, ভূমিকা বা কর্তৃত্ব স্তিমিত হতে হতে একটা পর্যায়ে পুরুষতান্ত্রিক বা ব্যক্তিতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের একক নেতৃত্ব স্থান পায়। নারী তার জীবন কিভাবে পরিচালিত করবে বা না করবে, তা পুরুষরাই নির্ধারণ করে দেয়। সেভাবে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। যুগ যুগ ধরে এখানে সেভাবেই আমাদের সমাজ জীবনকে দেখে আসছি এবং সেভাবেই চলছে। কিন্তু কোন কিছু অপরিবর্তনীয় থাকে না। বস্তু জগৎ পরিবর্তনশীল। সমাজে পরিবর্তন ঘটে। তার পাশাপাশি সমাজে যারা থাকে তারাও পরিবর্তিত হতে বাধ্য হয়। আমাদের জুম্ম সমাজে যে পরিবর্তনের বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করি।

আজকে শুধু আমাদের জুম্ম সমাজে নয়, এখানকার পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালি সমাজেও দেখি, তারা পিতৃতান্ত্রিক-পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তাদের জীবনকে পরিচালিত করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে। সুতরাং পার্বত্য অঞ্চলের ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহ, যে জাতিগোষ্ঠীরই সদস্য হোক না কেন, পার্বত্য অঞ্চলের সমাজ জীবনে পরিবর্তনের জোয়ার আমরা দেখি। এটা নারী সমাজ উপলব্ধি করতে যাচ্ছে যে, একজন পুরুষও মানুষ, একজন নারীও মানুষ। পুরুষ যে সম্মান-অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় বা বেঁচে থাকে, নারীরও সেভাবে সেই অধিকার-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

এই বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের নারী সমাজে বাঙালি হোক, বড়ুয়া হোক অথবা ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম সমাজের নারী হোক, তারা এই বাস্তবতা উপলব্ধি করছেন। সেটা শিখে হোক অথবা হোঁচট খেয়ে হোক অথবা বাধাগ্রস্ত হয়ে হোক অথবা কোন না কোনভাবে হোক, আজকে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম সমাজের উপর যে শোষণ-নিপীড়ন-দমন-পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে পার্বত্য অঞ্চলের নারী সমাজ, বিশেষ করে জুম্ম নারী সমাজ সচেতন হয়ে উঠছে এবং পাশাপাশি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তারা সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। আজকে সারা বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। সেই পুঁজিবাদী সমাজেও আমরা দেখি, শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা বিশ্বে বিরাজ করছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জীবন। পুরুষেরাই সবকিছু, পুরুষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমাজ চলবে, দেশ চলবে, সবকিছু চলবে এবং সেভাবে মানুষের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হবে। গোটা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে আমরা সেটাই দেখি।

আজকে আমাদের জুম্ম সমাজে বা পার্বত্য অঞ্চলে নারী সমাজে, পাহাড়ী-বাঙালি যেই হোক না কেন, যারা লেখাপড়া করছেন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, নিজেদের অধিকারের প্রতি সচেতন হয়ে, তার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হলেও তিনি বুঝতে পারছেন, দেখছেন ও শুনছেন এবং আচার, আচারণ ও ব্যবহারের মধ্যে উপলব্ধি করছেন যে, নারীও মানুষ। তার অধিকার আছে, তার মর্যাদা আছে এবং তার মর্যাদার স্বীকৃতি আছে এই বিষয়ে আমাদের জুম্ম নারী সমাজের একটা অনুভূতি ও চেতনা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

আপনারা জানেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মহান নেতা এম এন লারমার নেতৃত্বে যে আন্দোলন আমরা পেয়েছি ও সারা পার্বত্য অঞ্চল ব্যাপী চলছে সেই আন্দোলনের একটা দিক ছিল নারীর অধিকার। এম এন লারমা বলেছেন- "পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে সেই মর্যাদা নারীরও পাবার অধিকার আছে"। তার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জনসংহতি সমিতির একটা ব্যবস্থা ছিল যে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বাধ্যগতভাবে একজন নারীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। আমরা দেখেছি, তখনকার পুরুষ সমাজ নারীর সেই প্রতিনিধিত্বকে মানতে পারেনি। গ্রাম পঞ্চায়েতে নারীর প্রতিনিধি থাকবে কেন এমন প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু জনসংহতি সমিতি তার বিরুদ্ধে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে নারীকে সংশ্লিষ্ট রাখার কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছিল। আমি নিজে

দেখেছি, গ্রাম পঞ্চায়েতে কোন বিষয় নিয়ে বিচারে বসলে সেখানে নারী প্রতিনিধিত্বের উপস্থিতি অনেকটা জড়সড় হয়ে থাকতে। কিন্তু আজকে নারীর প্রতিনিধিত্ব ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পেতে চলেছে।

অনেক বছর আগের কথা, বৃটিশ আমলে গুটি কয়েক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী সন্তানেরা পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু আজকের সমাজে অনেক অনেক পরিবর্তন এসেছে, তার অনেক অনেক ব্যাপকতা বেড়ে গেছে। তাই আজকে সমাজের সর্বস্তরের পরিবার থেকে নারীরা লেখাপড়া শিখছে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার পাশাপাশি পার্বত্য অঞ্চলের যে রাজনৈতিক ধারা ও আন্দোলন, তার প্রভাব নারী সমাজের উপর প্রত্যক্ষভাবে পড়েছে। বিগত বিশ বছর ধরে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে লড়াই সংগ্রাম চলছে সেখানেও নারীর ভূমিকা ছিল উচ্চ পর্যায়ে। নারীরা অনুভব করেছে যে, অধিকার যদি পাওয়া না যায় তাহলে শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। দুই দশকের অধিক সময় ধরে পার্বত্য যে আন্দোলন সে আন্দোলনে নারী সফলভাবে ভূমিকা পালন করেছিল, সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই রাজনৈতিক প্রভাব বা রাজনৈতিক ধারার ফলশ্রুতিতে গোটা পার্বত্য অঞ্চলে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী-বাঙালি প্রত্যেকের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই চুক্তি বা চুক্তি অনুযায়ী প্রণীত আইন বাস্তবায়নের আন্দোলন-সংগ্রামের যে বাস্তবতা, সেই বাস্তবতা থেকে নারী শিখতে শুরু করেছে। অনুভব করছে ধর্মীয় জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে তার অবস্থান। নারীকে অবহেলিত, নির্যাতিত অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যে নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতা তাদের জীবনের উপর রয়েছে, পুরুষ সমাজের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী নারী সমাজকে ব্যবহার করে আসছে ও পরিচালিত করে আসছে, সেই বাস্তবতা আজকে নারী সমাজ উপলব্ধি করছে।

এই সম্মেলনে বলা হচ্ছে যে, নারীর প্রতিনিধিত্ব অত্যাবশ্যক। কিন্তু কেবল অত্যাবশ্যক নয়, এটা অপরিহার্য। সমাজ বিকাশের ইতিহাসে কোন না কোনভাবে সময়ের ব্যবধানে নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে। আজকে সারা বিশ্বে দেশে দেশে যদিও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নারীরা এখনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে; সেই অতি উন্নত দেশ ইউরোপ-আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়া-কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তারা বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে; তারা শিক্ষা-দীক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে; আজকে অনেক নারী অর্থনৈতিকভাবে ধনাঢ্য হতে পেরেছে; অনেক নারী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিশাল অবদান রাখছে; বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, কৃষি-বাণিজ্য-চারুকলা-শিল্পকলা-সঙ্গীত সকল ক্ষেত্রে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশাল অবদান থাকলেও বস্তুতঃ নারীকে এখনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের অধীনে থাকতে হচ্ছে। নারী প্রধানমন্ত্রী হতে পারে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী প্রধান হতে পারে কিন্তু সমাজ জীবনে নারী এখনো পুরুষের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজে পুরুষের কর্তৃত্বে তাদের জীবন কাটাতে হচ্ছে।

সাধারণভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই বাস্তবতা ব্যতিক্রম হতে পারে। ছোট বয়স থেকে একেবারে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত, সমাজ জীবনের এই বাস্তবতা আজকে নারীরা বুঝছে। আজকে পার্বত্য অঞ্চলের নারী সমাজ তাদের অবস্থান বুঝতে শিখছে। পুরুষের উপর শাসকগোষ্ঠীর যে দমন-পীড়ন সেটা নারীকে বাদ দিয়ে নয় বরং নারী আরো বেশি নিপীড়িত-নির্যাতিত- অবদমিত হয় এবং শোষণ-নিপীড়নটা নারীর উপর আরো বেশি বেশি পরিমাণে বর্তায়। আজকের এই বাস্তবতা আমি মনে করি নারীরা বুঝে নেবে। আমরা যদি সমাজকে এগিয়ে নিতে চাই, সমাজ উন্নয়ন শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, এখানে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সামাজিক-রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে গোটা সাংস্কৃতিক জীবনে সমগ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, সেটাকে বুঝতে হবে। নারীকে বাদ দিয়ে কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না। কেউ যদি পারেন বলে বলতে চায় সেটা হচ্ছে নারীদের প্রতি তার চরম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। হতে পারে সেটা তার চরম বোকামি। যে বোকামি তার জীবনকে বিপর্যস্ত করবে এবং তার পারিবারিক-সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত করবে।

আজকে সমাজ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ এবং নারীকে অধিকার দেওয়া অপরিহার্য। নারীর অধিকারকে বাদ দেয়া যায় না। নারীকে বাদ দিয়ে কোনকিছু করা যায় না। সুতরাং আজকের এই সম্মেলন এই বিষয়টাকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এটাকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাই। আজকের এই সম্মেলনকে মহিলা কার্বারীদের সম্মেলন বলা যেতে পারে, যেখানে অনেক হেডম্যান যোগ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, চাকমা সার্কেলে মহিলা কার্বারী ২৫২ জন, মং সার্কেলে ১০৯ জন আর বোমাং সার্কেলে মাত্র ০১ জন। বলা যায়, একেকজন কার্বারী একেকটা সমাজের নেতৃত্বে রয়েছেন। তারা শুধু নারীদের নেতৃত্বে নয়, পুরুষসহ গোটা সমাজের নেতৃত্বের অংশীদারিত্বে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এখানে এই যে সমাজের বাস্তবতা, যেখানে চাকমা সার্কেলে মহিলা কার্বারী ২৫২ জন, মং সার্কেলে ১০৯ জন আর বোমাং সার্কেলে মাত্র ০১ জন। কেন বোমাং সার্কেলে একজন নারী? সেখানে কি কার্বারী হওয়ার মত যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলা নেই? আসলে সেটা নয়। বাস্তবতা হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা। এটাই প্রমাণ করে যে, বোমাং সার্কেলের সমাজ ব্যবস্থা চাকমা-মং সার্কেলের চেয়ে আরো বেশি পিছিয়ে আছে। চাকমা-মং সার্কেলের চেয়ে আরো আরো বেশি অগণতান্ত্রিক। আজকে চাকমা সার্কেলের সমাজ জীবন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে যতটুকু বেরিয়ে আসতে পেরেছে সেই তুলনায় মং সার্কেল কিছুটা কম এবং তার চেয়ে আরো কম বেরিয়ে আসতে পেরেছে বোমাং সার্কেল। অন্যথায় বোমাং সার্কেলে কেন একজন মাত্র মহিলা কার্বারী হবে? কিন্তু সেটাই হলো বর্তমান বাস্তবতা।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যে বাস্তবতা সেটার প্রেক্ষিতে আমাদের মূল্যায়ণে এটা বুঝতে হবে যে, আমাদের সমাজব্যবস্থা এখনো যথেষ্ট পরিমাণে সামন্ততান্ত্রিক। সামন্তবাদী সমাজের যে চিন্তাধারা, তা হলো প্রগতি বিরোধী। তারা গণতন্ত্র বিরোধী, তারা রক্ষণশীল, তারা অত্যন্ত স্বার্থপর, তারা প্রতিহিংসা পরায়ণ, তারা পরনিন্দুক, তারা পরচর্চা করে, তারা ক্ষমতালোভী ইত্যাদি

এককথায় তারা প্রগতি বিরোধী, তারা গণতন্ত্র বিরোধী। তারা যেখানে আছে সেখানে থাকতে চায়। এজন্য সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কোন অবস্থাতেই আজকের দিনে গ্রহণ করা যেতে পারে না। তার গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না। কিন্তু বাস্তবে বিশ্বের আনাচে-কানাচে, আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের মতো যেসব ভূখন্ডে আছে এবং যারা আমাদের মতো সমাজব্যবস্থা নিয়ে জীবন কাটায়, তারাও এমনতর সমাজের মধ্যে থেকেই লড়াই করছে। একদিকে নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে সেখানে সমঅধিকার, সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই-সংগ্রাম চলছে। দাম্পত্য জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে সেই লড়াই চলছে। আজকে বিশ্বের কোথাও সেই লড়াইয়ের অনুপস্থিতি নেই, তবে তার মাত্রা-পরিধি হয়তো ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

পার্বত্য অঞ্চলে আমরা দেখেছি যে, যখন ১৯১৫ সালে যুব সমিতি গঠন করা হলো, নেতারা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তারা সামন্ত পরিবারের শিক্ষিত ছেলে ছিলেন। তারা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে বিমুক্ত হয়ে প্রগতির দিকে যেতে চাচ্ছিলেন। তারা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন। এজন্য আমি মনে করি, ১৯১৫ সালে যে যুবক সমিতি গঠিত হয় সেখানে দুটো মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল- একটা হচ্ছে শিক্ষা বিস্তার করা, আরেকটা হচ্ছে ধর্মীয় নৈতিকতার ভিত্তিতে সমাজ জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা। সেই যে যাত্রা শুরু করেছে এই পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ, তারা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে, রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বৃটিশ বিরোধী সেই আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে সে আন্দোলন সম্পর্কিত ছিল। সে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আমরা দেখেছি, ১৯৪০ দশকে ঘনশ্যাম দেওয়ান, স্নেহ কুমার চাকমাসহ আরো অনেকের নেতৃত্বে এখানে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটা লড়াই সংগ্রাম সংগঠিত করেছিল।

পরবর্তীতে পাকিস্তানের জন্মলাভ হলো। ১৯৬০ সালে যখন কাপ্তাই বাঁধ দেয়া হলো তখন কাপ্তাই বাঁধের বিরুদ্ধে একমাত্র যিনি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি হলেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব তখন প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি। কেন করেনি সেটা হলো তাদের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা। তারা ছিলেন আপোষকামী, প্রগতি বিরোধী। তারা সাহসী ভূমিকা রাখতে পারেন না। এজন্য ১৯৬০ সালের কাপ্তাই বাঁধ আমাদের মরণ ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল সেই কাপ্তাই বাঁধ।

আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে বর্তমানে যে অভাব-অভিযোগ, সেই বাস্তবতা কেন? সেটা হচ্ছে, আমাদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যয় ঘটেয়েছিল পাকিস্তান সরকার, ষড়যন্ত্র করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় এটা আমাদের উপর প্রথম আঘাত ছিল না। আমাদের উপর প্রথম আঘাত ছিল ১৯৫৫ সালে ভারত থেকে আসা শরণার্থীদের একটা অংশ পার্বত্য অঞ্চলের আইনকে লঙ্ঘন করে এখানে বসতি দেওয়া। পঞ্চাশ দশকের শুরুতে জোর করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে পরিণত করার যে ষড়যন্ত্র পাকিস্তান আমলে শুরু হয়েছিল সেটা এখনো চলমান রয়েছে।

দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় আঘাত হচ্ছে আমাদের কাপ্তাই বাঁধের বিপর্যয়। আমি দেখেছি, কাপ্তাই বাঁধের আগে আমাদের পার্বত্যবাসীর জীবনধারা কত হাসি ও আনন্দে ভরপুর ছিল, প্রকৃতিও ছিল উদার। প্রকৃতি সমসময় সজীব সতেজ ছিল, প্রকৃতি ও মানুষ মিলেমিশে একাকার ছিল। কিন্তু কাপ্তাই বাঁধের ফলে সমস্ত কিছুর বিপর্যয় ঘটে। ধীরে ধীরে এখানে অনুপ্রবেশ বাড়তে থাকে। আজকে পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম জনগণ ক্রমাগত সংখ্যালঘু হতে চলেছে। এখন জুম্ম জনগণ ৫০ ভাগ এবং বহিরাগতরা ৫০ ভাগ। দেশ ভাগের সময় ১৯৪৭ সালে যেখানে ১.৫ বা ২.৫ ভাগ ছিল অজুম্ম, আজকে সেই বহিরাগত বাঙালি হয়ে গেছে ৫০ ভাগ। এই বাস্তবতা নারীর জীবনে, সমাজ জীবনে, নারী অধিকারের উপর বিরাট প্রভাব পড়ে।

ফলে জুম্ম জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের উপর যে বিপর্যয় সেই অবস্থা উত্তরণের জন্য লড়াই-সংগ্রামে সামিল হতে হয়েছে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তির পর ঊনিশটি বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু এই চুক্তি বাস্তবায়িত হচ্ছে না। হবে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারি না, যদি না শাসকগোষ্ঠীর উপর একটা চাপ সৃষ্টি করা হয়। অন্যথায় এটা সম্ভব হবে না। আজকে বাস্তবতা হচ্ছে, জুম্ম জনগণকে নিশ্চিহ্নকরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে শাসকশ্রেণি। ঘুনেধরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে শাসকগোষ্ঠী এই ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে।

এখানে মহিলা কার্বারী যারা আছেন, তাদেরকে একটা কথা বলতে চাই, সমাজব্যবস্থা ও চিন্তাধারা যদি প্রগতিশীল না হয়, গণতান্ত্রিক না হয়, তাহলে সেই কার্বারী-হেডম্যান কি কাজ করবে, কি করতে পারবে? আজকে পুরুষ হোক নারী হোক, হেডম্যান-কার্বারীকে তাদের প্রগতিশীল হতে হবে, গণতান্ত্রিক হতে হবে। তাকে রক্ষণশীল মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাকে সংগ্রামী হতে হবে, প্রতিবাদী হতে হবে। তাহলেই তিনি তার দায়িত্ব প্রতিপালন করতে পারবেন, অন্যথায় সম্ভব নয়। নারীর প্রতিনিধিত্ব আমরা চাই এবং সেই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আমরা খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটিতে যেভাবে নারী প্রতিনিধিত্ব প্রত্যক্ষ করি, সেভাবে বান্দরবানে গড়ে উঠেনি। এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা থাকবে এবং যারা হেডম্যান-কার্বারী, জনপ্রতিনিধি আছেন তাদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া দরকার, যাতে বোমাং সার্কেলের নারী সমাজ কার্বারী এবং হেডম্যানের দায়িত্বের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে একটা বিশাল ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে আগামীকাল এই সম্মেলনে আরো আলোচনা হবে। বিশেষ করে আগামীকাল এখানে দুটো বিষয় আছে যেখানে নারীকে কিভাবে আরো অধিকতর দায়িত্ব দেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হবে।

আমি যে কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে যাচ্ছি, তা হলো

নারীকে অবশ্যই দায়িত্ব দিতে হবে। তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিস্তৃত করতে হবে। কিন্তু যে প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে যোগ্যতার প্রশ্ন। নারী যদি তার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারেন তাহলে তাকে কার্বারী-হেডম্যান করে বরঞ্চ আরো সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। তার মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে, নারীর প্রতিনিধিত্বের অধিকার থেমে থাকবে। আমি যোগ্যতার প্রশ্নে বলতে চাচ্ছি যে, যারা নারী কার্বারী আছেন, যারা নারী হেডম্যান আছেন তাদেরকে অবশ্যই রাজনৈতিকগতভাবে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তাদের পড়াশুনা করতে হবে, তাদের প্রশিক্ষণে যেতে হবে, তাদের মতবিনিময় করতে হবে, তাদের বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য দিতে হবে, তাদের নানাভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং অবশ্যই আপোষকামী মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের সংগ্রামী হতে হবে, সাহসী হতে হবে। যোগ্যতার প্রশ্নে নারীকে আরো এগিয়ে আসতে হবে। যেহেতু সমাজব্যবস্থা পুরুষের হাতে ছিল ও আছে, সেহেতু পুরুষরাই এগিয়ে থাকবে। কিন্তু আজকের বাস্তবতায় নারীকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই ভাবাই যায় না। কেউ যদি ভাবে সেটা ঠিক নয়, কোন অবস্থাতেই ঠিক নয়।

আমাদের সমাজে এমন লোক যথেষ্ট আছে, তারা মনে করে যে নারীকে দায়িত্ব দিলে আরো অনেক অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে। বস্তুতঃ সেটা সঠিক নয়, বাস্তবতা সেটা বলে না। বাস্তবতা বলে যে, নারীকে সমাজের নেতৃত্বে অধিকতরভাবে অধিষ্ঠিত করা গেলে সমাজ আরো শক্তিশালী হবে, সমাজ আরো এগিয়ে যেতে পারবে। এজন্য আমি মনে করি, নারীদের আরো অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবে যোগ্যতা এমনিতেই অর্জন হয় না। যোগ্যতা অর্জন করতে গেলে তাকে আদর্শগতভাবে জীবনের পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের অবশ্যই প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে উন্নত হতে হবে। তাহলেই তিনি সমাজকে আরো অধিকতর এগিয়ে নিতে পারবেন, সমাজে তিনি অবদান রাখতে পারবেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় একজন গ্রাজুয়েট বা উচ্চ শিক্ষিত হতে পারেন, কিন্তু তার মধ্যে যদি সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা থাকে তাহলে তাকে কার্বারী পদেও দায়িত্ব দেয়া যায় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি চাকরী করতে পারেন, কিন্তু তার চিন্তাধারা গণতান্ত্রিক হতে পারে না। তার চিন্তাধারা আত্মমুখী হবে। তিনি শুধু নিজের স্বার্থটাই দেখবেন। এজন্য শুধু বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে শিক্ষিত হলেই হবে না, তাকে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক হতেই হবে। যে পুরুষ প্রগতিশীল, সাম্যবাদী আদর্শের অধিকারী না হয় সে পুরুষও স্বার্থবাদী হবে, সে পুরুষও শুধু নিজের জীবনটাই দেখবে। আজকে আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে তিন শতাধিক বিসিএস পাস করা কর্মকর্তা আছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা কর্মরত আছেন। অথচ তাদের মধ্যে কতজন পার্বত্য অঞ্চলে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে সচেতন, পার্বত্য চুক্তি সমর্থন বা পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছেন? তিন বিসিএস কর্মকর্তার মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী কর্মকর্তা আছেন। গতকাল পত্রিকায় দেখলাম সাধনা ত্রিপুরা যিনি খাগড়াছড়ি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে গরীব পরিবারের সন্তান হয়েও কঠোর পরিশ্রম করে, সংগ্রাম করে বিসিএস এডমিনিস্ট্রেশন ক্যাডারে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। তার এই লড়াই-সংগ্রাম নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই, আমি একজন উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা হয়ে গেলাম কিন্তু আমার মধ্যে যদি স্বার্থপরতা থাকে, আমার মধ্যে যদি আত্মমুখীনতা থাকে, আমার মধ্যে যদি শুধু নিজের দিকটাই নিয়ে ভাবি, তাহলে তো হয় না। আমি বা তিনি সেরকম হলে তো হয় না।

এজন্য যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সেজন্যই এখানে দরকার নীতি-আদর্শের বিষয়টা। নারী যদি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, সাম্যবাদী, গণতান্ত্রিক নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে তাহলে সমাজকে তিনি আরো অধিকতর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, তবেই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে নারী-পুরুষের যে সম্মিলিত সমাজব্যবস্থা, আমি আশা করি গ্রামাঞ্চলে নারী কার্বারীরা তাদের ভূমিকা পালনে, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে তারা আরো অধিকতর সচেতন হবেন। সমাজ জীবনে নারীর প্রতিনিধিত্বের অপরিহার্যতা তারা প্রমাণ করবেন, সমাজ বিকাশে ও সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখবেন এটাই প্রত্যাশা রাখি।

সবশেষে আমি যে কথাগুলো বলে শেষ করতে চাই তা হলো, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষকেও এগিয়ে আসতে হবে, নারীকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা দিতে হবে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায়, সমাজে নারীর দায়িত্ব পালনে পুরুষকে সহযোগিতা দিতে হবে। দাম্পত্য জীবনে তার স্বামীকে, পারিবারিকভাবে তার ভাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক নেতৃত্বকে এগিয়ে আসতে হবে। পুরুষ যে পরিমাণে সচেতন হবে সে পরিমাণে নারী আরো বেশি এগিতে যেতে পারবে। নারী কার্বারীদের সম্পর্কে পুরুষ কার্বারীদের যে তাচ্ছিল্য মনোভাব তা পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নয়। এটা প্রগতি বিরোধী, এটা গণতন্ত্র বিরোধী, এটা অধিকার পরিপন্থী। সমাজ বিকাশে নারীর অপরিহার্যতা মেনে চলতে হবে, নারীকে তার দায়িত্ব পালনে সুযোগ দিতেই হবে– এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। কাজেই এই বিষয়টা নারী-পুরুষ সবাইকে সমভাবে বুঝতে হবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

সমাপনী অধিবেশনঃ

১২ জুন ২০১৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম হেডম্যান-কার্বারী সম্মেলনের সমাপরী অধিবেনে (দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে) 'ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানে নারী ক্ষমতায়নে সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নারী হেডম্যান-কার্বারী নেটওয়ার্কের সভাপতি জয়া ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অধিবেশনে মূল আলোচক উপস্থিত ছিলেন চাকমা সার্কেলের রাণী য়েন য়েন এবং সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরূপা দেওয়ান, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক জোনাকি চাকমা, নারী হেডম্যান-কার্বারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সান্তনা খীসা, নারী হেডম্যান-

কার্বারী নেটওয়ার্কের সদস্য সমাপ্তি চাকমা প্রমুখ। উক্ত অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা যে বক্তব্য দিয়েছেন সেই বক্তব্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা: ইতিমধ্যে অনেকেই অনেক দিক নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। আজকে এই সমাপ্তি অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানে নারী ক্ষমতায়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা। এখানে ক্ষমতায়ন বলতে কি বুঝানো হয়েছে সেটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। সেটা উদ্যোক্তাদের কাছে আমি প্রশ্নটা রাখলাম। আমরা জানি ব্রিটিশ যখন এখানে পার্বত্যাঞ্চলের শাসনভার হাতে নিয়েছিল, ঐ সময় থেকে ব্রিটিশ তার সুবিধার্থে এখানে হেডম্যান প্রথা চালু করে। তার পাশাপাশি গ্রাম পর্যায়ে কার্বারী নামে একটা দায়িত্ব চালু হয়। গ্রাম পর্যায়ে কার্বারী, মৌজা পর্যায়ে হেডম্যান এবং সার্কেল পর্যায়ে সার্কেল চীফ এই তিনে গঠিত আমাদের ঐতিহ্যগত বা প্রথাগত যে নেতৃত্ব, এই নেতৃত্বের মধ্যে কার্বারীদের অবস্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

কার্বারীরা গ্রামে থাকেন এবং গ্রামের মানুষের জীবনধারার সাথে তারা তুলনামূলকভাবে প্রত্যক্ষভাবে ও অধিকতর পরিমাণে জড়িত থাকেন। একারণে এখানে কার্বারীদের অবস্থান সম্পর্কে গভীরভাবে নজর দিতে হবে। আমি এখানে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষভাবে বলতে চাই যে, পার্বত্যাঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় আছে জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, ধর্মভেদ, লিঙ্গভেদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বর্ণগত বৈষম্য। পার্বত্যাঞ্চলের সার্বিক জীবনধারায় এসব বৈষম্য আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই বৈষম্যযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা যেখানে শ্রেণিগত অবস্থান আছে, সেই সমাজ ব্যবস্থা আরো জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে বিরাজমান রয়েছে। সেখানে একজন নারী, যে নারী তার সমগ্র জীবনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রতি পদে পদে তাকে নানা ধরনের সমস্যার মুখোমুখী হয়ে তার দায়িত্ব পালন করে যেতে হয়।

আমি যেটা বলতে চাই, এখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হচ্ছে বহুবিধ এবং সেই সমস্যার সমাধানে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেই চুক্তির উপর ভর করে চারটি আইন হয়েছে– তিনটি জেলায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন এবং সমগ্র পার্বত্যাঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন। এই আইনসমূহে ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতিসমূহের প্রথা, রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে দায়িত্ব অর্পিত আছে। কিন্তু সেই দায়িত্ব কিভাবে প্রতিপালিত হবে, না হবে তা কিন্তু এখনো আইনগতভাবে নির্ধারিত হতে পারে না। কারণ হচ্ছে পার্বত্যাঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক যে বাস্তবতা বিরাজ করছে, তাতে দেখা যায় পার্বত্য চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা এখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নাই। এই কারণে অদ্যবধি কার্বারী বলুন, হেডম্যান বলুন, সার্কেল চীফ বলুন, তিনি তার দায়িত্ব কিভাবে প্রতিপালিত করবেন এবং সেই দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে যারা যুক্ত থাকবেন, সে সম্পর্কে এখনো ন্যূনতম লিখিত আইনে বর্ণিত হয়নি। সেটা আদো হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের উপর।

আজকে ব্রিটিশের দেয়া ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুযায়ী সার্কেল চীফ, মৌজার হেডম্যান এবং গ্রামের কার্বারী তার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কিন্তু দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে বহু সমস্যা জন্ম নিয়েছে। ১৯০০ সালের শাসনবিধির মাধ্যমে ব্রিটিশের দেয়া ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা পার্বত্যাঞ্চলের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। সেটা অবশ্যই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ছিল। সেই ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় বর্তমান পর্যায়ে সার্কেল চীফ, মৌজা হেডম্যান এবং গ্রামের কার্বারীর সামনে যে সমস্যাগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো সমাধানে বারে বারে বাধাগ্রস্ত হতে হচ্ছে। এই বাস্তবতা আমরা অনুভব করি, যারা কার্বারী-হেডম্যান এবং চীফ আছেন তারা আমাদের চেয়ে আরো বেশি গভীরভাবে এই সমস্যাগুলো অনুভব করতে পারেন। ঐতিহ্যগত বা প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে নারীর ক্ষমতায়নে নারীকে নানা ক্ষেত্রে আরো সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে।

আমি মনে করি এখানে নারী সমাজকে যেমনি এগিয়ে থাকতে হবে, অন্যদিকে সমাজের যারা সচেতন তাদেরকেও নারী সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অধিকতরভাবে ভূমিকা রাখতে হতে পারে। নারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদমিত, পদদলিত, নিষ্পেষিত, শাসিত হচ্ছে। নারী একটা সীমাবদ্ধ জীবন নিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে যুগের পর যুগ ধরে। সমাজ একটা জায়গায় অচল থাকতে পারে না তথা জগৎ ও জীবনধারা কোন স্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। জগতের সবকিছু পরিবর্তনের একটা অব্যাহত বাস্তবতার মধ্যে চলছে। পার্বত্য সমাজে নারীদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে? নিঃসন্দেহে এটা আমি মনে করি এগিয়ে যেতে থাকবে এবং অধিকতরভাবে উজ্জ্বলতর দিকে যেতে থাকবে। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা!

ব্রিটিশ আমলে পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম নারীরা যেভাবে তাদের জীবনকে দেখেছেন ও জীবনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, আজকে বাংলাদেশে শাসনামলে এসে তাদের সেই জীবনধারার অনেক অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আজকে অগণিত নারী তারা নিজেদের জীবন নিয়ে ভাবছে, তাদের মৌলিক অধিকার নিয়ে ভাবছে ও চিন্তা করছে। এখানে প্রত্যেকটি মানুষের সে পুরুষ হোক বা নারী হোক তার মৌলিক অধিকার, তার কর্মের অধিকার, তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সাংস্কৃতিক অধিকার সেটা একজন পুরুষের যেমনি ভোগ করে, তেমনি একজন নারীরও সেই অধিকারগুলো পেতে হবে, পাওয়া দরকার। কিন্তু সমাজ তো সেগুলো দিচ্ছে না। সমাজ একদিকে হচ্ছে শ্রেণিবিভক্ত, বৈষম্যযুক্ত, ধনী-নির্ধনের বৈষম্য, অর্থনৈতিক বিভেদ, লিঙ্গগত বিভেদ, জাতিগত-ধর্মগত বিভেদ এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যযুক্ত, যেখানে নানাভাবে নানা দিক থেকে অহরহ নারী নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে। নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বক্তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়েও পুনরাবৃত্তি করেছেন। আজকে নারী তার চতুর্দিকে নির্যাতিত হচ্ছে, অবহেলিত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে এটাই তো বাস্তব।

গতকাল দুটো কাগজ দেওয়া হয়েছিল, এই দুটো কাগজের মধ্যে

একটাতে আদিবাসী নারীর অবস্থান, সমস্যা এবং তার নেতৃত্বের করণীয় সম্পর্কে বলা আছে। আজকে এখানে যারা সংগ্রামী কার্বারী-হেডম্যানরা এসেছেন, তাদেরকে নিশ্চয় এ কাগজ দেওয়া হয়েছে। আরেকটা কাগজে প্রথাগত শাসন ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্বের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বলা আছে। তাদের নেতৃত্বের বর্তমান অবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে নারী নেতৃত্বের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তাতে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় করণীয় কি হতে পারে? এই কাগজে উল্লেখ রয়েছে, একজন নারী তিনি সমাজে একজন মা হিসেবে, একজন বোন হিসেবে এবং একজন স্ত্রী হিসেবে তার যে অবস্থান সে সম্পর্কে নারীর চিন্তাভাবনা ও চিন্তাধারা কি? বৈষম্যযুক্ত ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নারীর যে জীবন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীনে থেকে তাকে সেই জীবনটাকে ভাবতে হয়। কি সেই জীবনের ভাবনাটা বা চিন্তাধারাটা?

এখানে অনেকগুলো ভাবনার মধ্যে সমাজ ব্যবস্থার আলোকে সমাজে ক্রমবিকাশের একটা পর্যায় গিয়ে সমাজে ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসের অবস্থান আমরা দেখেছি। মানুষ বিকাশের এক পর্যায়ে যখন সে বাঁচার জন্য, জীবন ধারণের জন্য সম্মিলিতভাবে উৎপাদনের সাথে যুক্ত হয়ে গেল, পাশাপাশি ভাষার বিকাশ হতে থাকলো, তখন দেখা যায় মানব সমাজে ধর্ম স্থান করে ফেলেছে। আজকে আমাদের সমাজে যে ধর্মের অবস্থান ও বাস্তবতা সেটা যদি আমরা প্রত্যক্ষ করি তাহলে দেখা যায় যে, এখানে পারিবারিকভাবে প্রত্যেক নর-নারীকে তার শিশু অবস্থা থেকে ধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত করে রাখা হয়েছে। জুম্মদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের চিন্তাধারা ও বাস্তবতা এবং তার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তাধারা পার্বত্য জুম্ম নারী সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সেই চিন্তা ভাবনার মধ্যে যেগুলো আমাদের নারী সমাজের উন্নয়নে ও নারীর জীবনধারা বিকাশে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাস।

এখানে আপনারা যারা উপস্থিত আছেন, যারা কার্বারী-হেডম্যান আছেন, আমি জানি না দুয়েকজন ব্যতীত বাকীদের সাথে আমার তেমন সরাসরি পরিচয় নেই। তারা আমাদের সমাজে সত্যি সত্যি ধর্ম ও ধর্ম বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা নিয়ে ভেবেছেন কিনা। এখানে একটা বিষয় দেখতে হবে তা হলো, ধর্ম মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে। আজকে যদি আমাদের সমাজে ধর্ম নামক এই বস্তু বা বিশ্বাস যদি না থাকতো তাহলে কি হতো? আজকে আমাদের দেশে যে ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেদেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ধর্মের নানা নামে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়। শুধু আমাদের বাংলাদেশে নয়, বিভিন্ন দেশে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ কি আমরা দেখি না? আমি যদি ধর্মকে বিশ্বাস করি, তাহলে সেখানে আমিও সাম্প্রদায়িক হয়ে গেলাম। আমি যদি একটা নির্দিষ্ট ধর্মকে বিশ্বাস করি এবং আমার মতে আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অন্যান্য কোন ধর্মই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। এখানে ধর্মের মহাত্মা যদি সমাজ জীবনে থেকে থাকে, সেই ধর্মের যারা শাসনকর্তা ও নীতি নির্ধারক, তারাই সেই ধর্মকে ব্যবহার করে তাদেরই নিজেদের স্বার্থে, শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে।

আজকে এখানে যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আছেন, তারা বিশ্বাস করবেন যে, অকুশল কর্মের কারণে একজন নারীর জন্ম। এই যে একটা অবাস্তব চিন্তা রয়েছে, কিন্তু এই চিন্তাকে নারীরা বিশ্বাস করে। তারা বলেন যে, ধর্ম চর্চা করে তারা এই জীবন থেকে মুক্ত হতে চায়, মুক্তি পেতে চায়। নারীর জীবন দু:যহ জীবন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন না যে, সেটা ধর্মের কারণে নয়। সেটা হলো সমাজ ব্যবস্থার কারণে। সমাজ ব্যবস্থা যেহেতু শ্রেণি বিভক্ত, সমাজ ব্যবস্থায় যেহেতু নানা বৈষম্য আছে, সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন না হওয়ার কারণে নারীর এই বাস্তবতা।

পার্বত্যাঞ্চলের জুম্ম নারী সমাজ শুধু নয়, আমরা জুম্ম জনগণ যেখানে আমাদের উপর উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ চেপে বসেছে, আমাদের অস্তিত্বকে যেখানে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা মোকাবেলায় আমি কি ধর্মের ভাবনা নিয়ে থাকবো? আজকে সমাজে জাতিভেদ, জাতিগত ভেদাভেদ থাকলে নির্যাতন নিপীড়ন হবেই। ধর্মভেদ, সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেই সেটা রয়ে গেছে। আজকে অর্থনৈতিক ভেদাভেদ থেকে গরীবেরা নিষ্পেষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হয়, এটাই বাস্তবতা। আজকে লিঙ্গভেদ থাকলে এখানে দুর্বলতর লিঙ্গের উপর শোষণ-নিপীড়ন থাকবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা পুরুষের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়েই থাকবে।

এই বাস্তবতাগুলো থেকে কিভাবে আমি মুক্ত হবো? আমি কোন চিন্তাধারা দিয়ে মুক্ত হওয়ার চিন্তা করবো? কি ধর্মকে নিয়ে আমি এগুলো বিচার বিশ্লেষণে যাব? নাকি সমাজ ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে আমি মূল্যায়ন করতে যাবো? আপনারা কার্বারী হয়েছেন ভাল কথা, হেডম্যান হয়েছেন ভাল কথা কিন্তু আপনি যে কার্বারী-হেড-ম্যান তা কোন সমাজে হয়েছেন? পুরুষ শাসিত সমাজে নারী যতই ক্ষমতার অধিকারী হোন না কেন, যতই দায়িত্বের অধিকারী হোন না কেন তিনি নারীই থাকবেন। কারণ সমাজ ব্যবস্থা সেভাবে দেখে থাকে। সেজন্য সমাজের ব্যবস্থাপনা যতদিন না পরিবর্তিত হচ্ছে, ততদিন সমমর্যাদা সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না এটাই বাস্তব। তার জন্য অবশ্যই লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। কারণটা হচ্ছে সমাজে যে বৈষম্য তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে।

এখানে নারী অধিকারের প্রশ্নে, মান-সম্মানের প্রশ্নে এবং অন্যান্য জীবনধারা সবক্ষেত্রে একটা বাস্তবতা আছে। আজকে এখানে কার্বারী যারা আছেন, নারীদের মধ্যে হেডম্যান আছেন, তাদের কাছে আমি শুধু প্রশ্ন রাখছি, আবেদন রাখছি যে, আপনি যে সমাজে নারী হিসেবে জন্ম নিয়েছেন সেই সমাজে আপনার জীবনকে নিয়ে ভেবে দেখুন। এই জীবন নিশ্চয় আপনি কামনা করেন না। আপনি প্রগতিশীল সাম্যবাদী হবেন সেটা কোন পুরুষই কামনা করে দেয় না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আপনার অবস্থান দুর্বল পর্যায়ে থাকবে, এটাই বাস্তবতা। আপনি কার্বারী হিসেবে কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা অন্য সমস্যাকে সমাধানের জন্য যখন পুরুষ হেডম্যানের পাশাপাশি দায়িত্ব পালন করতে যাবেন তখন আপনি নিশ্চয় অনেক অহেতুক বা বিপরীত ও অসহনীয় অবস্থার মুখোমুখী হবেন। আমি কয়েকজন কার্বারী বা হেডম্যানকে জানি তারা কিভাবে এগুলোর মুখোমুখী হন।

সমাজে যেহেতু নারীর অবস্থান সকল ক্ষেত্রে দুর্বলতর, তাই শোষণ

ও বঞ্চনার মধ্যে তার অবস্থানটা থাকে। তবে আমি বলবো, আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে, আপনার চিন্তাধারা ও চিন্তাভাবনায় আপনাকে প্রগতিশীল, জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী চিন্তাভাবনায় গড়ে উঠতে হবে। আর সেটা যদি না হয় আপনি নারীই থেকে যাবেন। আপনি আপনার জীবনকে খুঁজে পেলেও কিছুই হবে না, আপনি সাহসী হবেন না, আপনার মধ্যে যে সামন্ত চিন্তাধারা তার ফলে আপনি প্রগতি বিশ্বাস করবেন না, ফলে আপনি সংগ্রামী হবেন না, আপনি রক্ষণশীল থাকবেন, আপনি শাসকগোষ্ঠীকে ভয় করবেন, আপনি নির্যাতিত, নিপীড়িত হলেও আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না, সেটা প্রতিবিধানের জন্য আপনি এগিয়ে যাবেন না। আপনারা সেই চিন্তাধারার মধ্যে পড়ে থাকবেন সেটা আমি কামনা করি না। আমরা যদি একটা নারী-পুরুষের সম্মিলিত সমাজ গড়তে চাই, যে সমাজ সবক্ষেত্রে সমঅধিকার, সমমর্যাদা থাকবে, তাহলে সেভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

ব্রিটিশদের দেয়া শাসন ব্যবস্থায় আমরা বলতে পারি না যে, এই জমি আমার। সরকার বলছে, সেটা তার জমি। আমি বলছি, এটা আমার জমি। এখানেই রয়েছে জুম্ম জনগণের সাথে বাংলাদেশ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত। ১৯০০ সালের শাসনবিধি অনুযায়ী এখানে ভূমির মালিকানা হলো সমষ্টিগত। মৌজা জমির মালিকানা হচ্ছে আমাদের, আমরা মৌজা বাসিন্দারা। কিন্তু সরকারি অনুযায়ী সেটা খাস জমি, সেই জমি সরকারের। যাদের জমি রেজিস্ট্রি করা আছে, সেগুলোরও কোন স্থায়ীত্ব নেই। এটা অস্থায়ী বন্দোবস্তী। সরকার যেকোন সময় জমি নিতে পারে। কবুলিয়তে এটা লেখা আছে একেবারে স্পর্শভাবে। সুতরাং সে সমাজে সম্পত্তির উপর নারীর উত্তরাধিকার কেমন হবে?

আমরা দাবি করি যে, নারীকে ও কন্যা সন্তানকেও তার উত্তাধিকারী দিতে হবে। যেখানে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রটা নেই সেখানে শুধু এটা নিয়ে টানাটানি করা কতটুকু বাস্তব সম্মত। আমি দেখেছি, অনেক এনজিও কাজ করেন, যারা নারী অধিকার নিয়ে কথা বলেন, একপেশিভাবে শুধু নারী বিষয়ে কথা বলেন। কিন্তু সমাজের বাস্তবতাকে অনুধাবন করে বক্তব্য রাখতে পারে না। কারণ ওনাদের চিন্তাধারাটা একপেশে। সামন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তাধারা নিয়ে এটার নির্ভুল মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। এখানে তাকে অবশ্যই আরো প্রগতিশীল হতে হবে, তাকে সাম্যবাদী চিন্তাধারায় সমাজ ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করে নারীর অবস্থানটা দেখতে হবে। সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের জন্য আমরা লড়াই সংগ্রাম করে যাবো, তার পাশাপাশি নারীর উত্তরাধিকারের বিষয়টাও দেখবো।

এখানে প্রশাসনিকভাবে আইনের প্রয়োজনীয়তা আছে। পার্বত্যাঞ্চলের ভূমির মালিকানা নির্দিষ্ট রূপ থাকতে হবে, সেটা এখানে এখনো নেই। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যদি বাস্তবায়িত হতে পারতো তাহলে এধরনের আইন যথাযথভাবে করা সম্ভব হতো। কিন্তু যেহেতু পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন কার্যকর হচ্ছে না, আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর হচ্ছে না, সরকার চুক্তি বিরোধীতা করে যাচ্ছে, সরকার এই চুক্তি যাতে বাস্তবায়িত হতে না পারে সেই ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, সেজন্য এখানে এক ধরনের বিপরীত বাস্তবতা বিরাজ করছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। অবশ্যই নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে বা উত্তরাধিকারের বিষয়ে নিশ্চিতভাবে সোচ্চার থাকতে হবে। তার পাশাপাশি সরকার ভূমির ব্যাপারে আমাদের যে অধিকার দিচ্ছে না আইনগতভাবে সেটার জন্য আমাদের লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে কার্বারী-হেডম্যান যারা আছেন পুরুষ হোক মহিলা হোক এ বিষয়টি বাস্তবায়নে তাদেরকে বুঝতে হবে।

আজকে আমি দেখেছি, কার্বারী-হেডম্যানদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন তারা সরকারের লোক। অনেক কার্বারীও সেটাই ভাবেন। বাস্তবে না গ্রামের কার্বারী, না মৌজার হেডম্যান তারা সরকারি লোক নয়। তারা তো একজন জনপ্রতিনিধি, যার হাতে অনেক ক্ষমতা। সেটা একটা প্রতিষ্ঠান, যেটা এক সময়ে অনেক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল। সেভাবে পার্বত্যাঞ্চলের জনজীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। আজকে হয়তো সেটা নেই। আমি মনে করি, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে ধর্মীয় প্রভাব এবং তার যে প্রতিক্রিয়া সেটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নারী কার্বারীদের, হেডম্যানদের এগিয়ে আসতে হবে। এই ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আরো গভীরে গিয়ে তাদের পড়াশুনা করা দরকার। আমি শুধু প্রতিদিন ধর্ম করতে গেলাম, গির্জায় গেলাম, পাস্তরের কথা শুনলাম, আমি বিহারে গেলাম, ভান্তের কথা শুনে আসলাম সেটা তো হলো না। আমাকে বৌদ্ধ দর্শন, খ্রিস্টান দর্শন, ইসলামী দর্শন, জৈন দর্শন ইত্যাদি – যত প্রকার দর্শন আছে, সেই ধর্ম নিয়ে আমার পড়াশুনা করা দরকার। আমার ভান্তে যা বলবে, আমার মা বাবা (ধর্ম বিষয়ে) যা বলবে তাই মেনে নেবো সেটা হয় না। যারা শিক্ষিত মানুষ, যারা সচেতন তারা সে ধরনের হতে পারে না। তাকে বিষয়টি নিয়ে পড়া দরকার। মহিলা কার্বারীরা যদি ঠিকমত দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসতে চান, তাহলে তাদের সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

আজকে পার্বত্যাঞ্চলের বুকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের জন্য আমরা সাহসী হতে পারি না। আন্দোলনে আমরা যে দ্বিধাগ্রস্ত, তা কার্বারী-হেডম্যানদের মধ্যেও রয়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যে, বিশেষ করে পুরুষের মধ্যে যারা শাসকগোষ্ঠীর সাথে দালালী করে তারা দায়িত্ব প্রতিপালন করে না। সেটা তো হতে পারে না। আজকে যে দল আমার অধিকার স্বীকার করে না, আমাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয় না, আমার সংস্কৃতিকে অবদমিত করে, সেই দলে আমি কাজ করতে যাব কেন? আমি জানি এখানে অনেক কার্বারী আছেন, মহিলা হেডম্যান আছেন, পুরুষেরাও অনেকেই আছেন যারা ক্ষমতাসীন দলের সাথে যুক্ত থেকে তার দায়িত্ব প্রতিপালনের কথা বলে। কিন্তু সেটা হতে পারে না, হয় না। আজকে এই বাস্তবতা গভীরভাবে অনুভব করতে হবে।

আমি আর সময় নেবো না, আমি অনেক সময় নিলাম। শ্রেণি-বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা জানার জন্য আসুন আমরা পড়াশুনা করি। কার্বারীদের মধ্যে প্রায় সবাই শিক্ষিত। তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে হলেও এই সমাজ ব্যবস্থাকে জানার জন্য পড়াশুনা ও অনুশীলনে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করবো। আপনার হেডম্যান, কার্বারী হিসেবে প্রশাসনিক যে দায়িত্ব সেটা নিয়েও পড়াশুনা করতে হবে। আপনাদের রাজনৈতিকভাবে

সচেতন হতে হবে। সেটা যদি না হয় এই কার্বারীর কাজ করে সেটা কোন লাভ হবে না। আপনাকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে, এগিয়ে থাকতে হবে। আপনার রাজনৈতিক মান, আপনার চিন্তাধারা বা দর্শন, যে দর্শন পিছিয়ে আছে, সামন্ততান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির যে দর্শন ও চিন্তাধারা মানুষকে পেছনে টেনে নিয়ে যায়, সামনে এগুতে দেয় না, উন্নততর জীবনের দিকে ধাবিত হতে দেয় না, সেই চিন্তাধারা থেকে মুক্ত হতে হবে। শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, অবিচারে বিরুদ্ধে গিয়ে সংগ্রাম করা এই সামন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাধারা করতে পারে না। তাকে অবশ্যই আরো বেশি পরিমাণে জাতীয়তাবাদী চেতনায়, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং সাম্যবাদী চিন্তাধারায় তাদের জীবনধারাকে উজ্জীবিত করতে হবে বলে আমি মনে করি।

আপনি শুধু পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বারা অত্যাচারিত নয়, আপনি শাসকগোষ্ঠীর দ্বারাও অত্যাচারিত, আর সেটা নারীদের উপর বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। পার্বত্যাঞ্চলে যখন যেখানে শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা অত্যাচারিত হয়, আমাদের জুম্ম সমাজের শুধু পুরুষেরা নয়, নারীরাও হয়ে থাকে, নারীরা বেশি মাত্রায় অত্যাচারিত হয়। এই বাস্তবতা বুঝতে গেলে আপনার জীবন দর্শন এবং চিন্তাধারা আরো উন্নত করতে হবে। সেটা না হলে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন কিভাবে? প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করার পথ ও মত কোথা থেকে পাবেন? আমি মনে করি, পার্বত্যাঞ্চলের সমগ্র জীবনধারাকে উজ্জীবিত করার জন্য সমাজে নারীর ভূমিকা কত বড় অপরিহার্য সেটা ভাবা যায় না। নারী-পুরুষ নিয়ে সমাজ, নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষ এগিয়ে যেতে পারে না, সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না, সংগ্রাম সফল হতে পারে না।

পার্বত্য চুক্তির পূর্বে দীর্ঘ দুই দশক ধরে চলা সশস্ত্র সংগ্রামে নারীরা যদি অংশগ্রহণ না করতো, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হতো না তথা শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হত না এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে। আজকে আমাদের জীবনধারার বাস্তবতা কি? আমাদের পায়ের তলায় মাটি নেই, আমাদের মাথার উপরে আকাশ নেই, আলো-বাতাস নেই। শ্বাসরুদ্ধকর জীবনে আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে। সেখানে নারী কার্বারীরা, নারী হেডম্যানরা শুধু এই কার্বারী-হেডম্যানের ধাণ্ডা নিয়ে থাকলে হবে না। তাকে ভাবতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র জীবনকে নিয়ে। আসুন আপনারা একটু সক্রিয় হয়ে অধিক সময় এদিকে ব্যয় করুন। আপনারা আরো মতবিনিময় করুন, আলোচনায় আসুন, আপনারা পড়াশুনা করুন, পাশাপাশি অনুশীলন করুন।

আপনারা চতুর্দিকে দেখুন, আমরা কিভাবে বেষ্টিত হয়ে আছি। আমরা এখানে ভূমির স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার কথা বলছি, কিন্তু পার্বত্যাঞ্চলের ১৯৪৭ সালে যেখানে বহিরাগদের সংখ্যা ছিল দেড় ভাগ কি আড়াই ভাগ, আজকে সেখানে হয়ে গেছে ৫০ ভাগের অধিক। তাহলে কি বাস্তবতা দাঁড়ালো আজকে? আজকে আমরা আমাদের ভূমি থেকে বিতারিত হচ্ছি। নিজের দেশে আমি আজকে পরবাসী হয়ে আছি। আজকে এই বাস্তবতা কার্বারী-হেড-ম্যানদেরকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে। শুধু এখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পর্কে সাধারণতভাবে উপলব্ধি করলে হবে না। শাসকগোষ্ঠীর সাথে লড়াই সংগ্রাম করবেন, তার পাশাপাশি শ্রেণি-বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা, যেখানে বৈষম্যযুক্ত সেটাকে পরিবর্তনের জন্য, শ্রেণিমুক্ত ও বৈষম্যমুক্ত একটা সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই সংগ্রামে নারী কার্বারী, নারী হেডম্যানসহ সমগ্র নারী সমাজকে সামিল হতে হবে। আমি আহবান রাখি, আপনারা কার্বারী-হেডম্যানরা অবশ্যই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে যুক্ত আছেন, অধিকতরভাবে যুক্ত থেকে আরো সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

আজকে এখানে অনেক অনেক কথা বলা হয়েছে, সব কথা বলা সম্ভব নয়। আমি শুধু একটি কথায় বলবো, আজকে আমরা উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদ, উগ্র ইসলামী সাম্প্রদায়িকতার করালগ্রাসে বিলিন হয়ে যাচ্ছি, বিলুপ্ত হতে চলেছি। এখান থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে চাই, তাহলে নারী পুরুষ, হেডম্যান, কার্বারী, মেম্বার, চেয়ারম্যান সবারই মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। কোন অবস্থাতে শাসকগোষ্ঠীর সাথে দালালী করে, ক্ষমতাসীন দলের সাথে কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য সেই দলে যুক্ত থেকে নিজের জীবনকে ভাবা উচিত হবে না। আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বিপরীতে নিজেকে দেয়াল হিসেবে দাঁড়ানো যায় না, সেটা হতে পারে না। পরিশেষে স্মরণ করে দিতে চাই, আজকে আঞ্চলিক পরিষদ আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে না, সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করতে চায় না। একারণে আঞ্চলিক পরিষদ আইন অকার্যকর অবস্থায় রাখা হয়েছে। তবু আমি বলবো, যেহেতু আঞ্চলিক পরিষদ এখনো আছে, তাই কার্বারীদের তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে, তাদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদ সব সময় অগ্রণী ভূমিকায় থাকবে। সবাইকে ধন্যবাদ।

৬৬ পৃষ্ঠার পর

লামায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য কর্তৃক একজন জুম্ম নারী ইউপি সদস্যকে মারধর

ফাসিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদের ১, ২ এবং ৩নং ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য মাহাই মারমা একই ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের সদস্য মোঃ কুতুবউদ্দীন দ্বারা মারধরের শিকার হন। এতে মহিলাটি গুরুতরভাবে আহত হন। চিকিৎসার জন্য তকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেয়া হয়। গত ৮ মে ২০১৭ আনুমানিক সকাল ১০ ঘটিকায় কর্ণফুলি ঝিরি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

মারধরের শিকার মহিলাটি এবং অন্যান্যরা জানায় যে, ঘটনার দিন হতদরিদ্রের কর্মসংস্থান কর্মসূচীর কাজ কুরুকপাতা ঝিরি রোডে শুরু হয়েছিল। সকাল ১০ ঘটিকায় অভিযুক্ত ব্যাক্তি কর্মসূচী স্থানে আসে এবং কাজ করতে মহিলা সদস্যকে বাধা প্রদান করে। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হলে এক পর্যায়ে কুতুবউদ্দীন তার পায়ের স্যান্ডেল খুলে এলোপাতাড়িভাবে মাহাই মারমাকে মারধর করে। মহিলাটির চুল ধরে সবার সামনে লাথি ও চড় মারে। আহত অবস্থায় মাহাই মারমাকে লামা হসপিতালে ভর্তি করা হয়।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

কাউখালীতে এক মারমা কিশোরী নিখোঁজ

গত ৯ মার্চ ২০১৭ রাত আনুমানিক ৭:০০ টার দিকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের মঘাছড়ি এলাকার বাসিন্দা এনুচিং মারমা (১৭) পীং-চিংসামং মারমা পার্শ্ববর্তী এলাকা কচুখালী হেডম্যান পাড়ার চাইন্দ্যামনি বৌদ্ধ বিহারের প্রয়াত এক ভিক্ষুর অন্তোষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় যাত্রানুষ্ঠানে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু এরপর আর তিনি ফিরে আসেননি। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নেয়ার পর কোথাও খোঁজ না পেলে ঘটনার প্রায় ৮/৯ দিন পর গত ১৮ মার্চ ২০১৭ নিখোঁজ কিশোরীর বাবা কাউখালী থানায় একটি জিডি করেন। জিডি নং-৭৪৩, ১৮/৩/২০১৭।

রাঙ্গামাটিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক চাকমা ছাত্রী যৌনহয়রানি শিকার

গত ৫ মার্চ ২০১৭ রাঙ্গামাটিতে নানিয়াচর উপজেলার বেতছড়ি ইউনিয়নের একজন আদিবাসী চাকমা ছাত্রী দীপা চাকমা (১৮) সেটেলার বাঙালি কর্তৃক যৌনহয়রানির শিকার হয়। জানা যায় যে, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাসে অর্ধেক ভাড়া নেয়া হয় কিন্তু ঘটনার দিন ছাত্রীটি যখন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে আসছিল তখন বাস কন্ডাক্টর তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাড়া দাবি করে। এ সময় দিঘীনালা জীবতলী নিবাসী মোঃ আলম (২০) নামের কন্ডাকটর ছাত্রীটিকে যৌন হয়রানি করে। যখন ছাত্রীটি এই ঘটনা সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের জানায় তখন তারা বাস এবং বাস কন্ডাকটরকে আটক করে।

রাঙ্গুনিয়ার ইসলামপুরে একজন চাকমা তরুণীকে ধর্ষনের অভিযোগ

গত ৯ মার্চ ২০১৭ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নে কিছু দুর্বৃত্ত দ্বারা এক আদিবাসী চাকমা তরুণীকে অপহরণ ও ধর্ষনের অভিযোগ পাওয়া যায়। জানা যায় যে, কিশোরীটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য ঘাগড়ায় টেক্সি জন্য অপেক্ষো করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করে অভিযুক্ত মোঃ আলম মিঞা ও কামাল মিঞা তার সামনে এসে গাড়িটি থামায় এবং তাকে জোরপূর্বক গাড়ি তুলে চট্টগ্রামে ইসলামপুরে একটি বাড়িতে নিয়ে যায়। কিশোরীটিকে দু'মাস ধরে পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়। পুলিশ সার্চ অপারেশনের মাধ্যমে গত ৪ মে ২০১৭ কিশোরীটিকে উদ্ধার করে। ১০ মে ২০১৭ ধর্ষণের শিকার মেয়েটির বাবা রাঙ্গামাটি কতোয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার হয়নি।

খাগড়াছড়িতে এক ত্রিপুরা ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার

গত ১৮ই মার্চ ২০১৭ খাগড়াছড়ি মানিকছড়িতে দুজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক একজন আদিবাসী ত্রিপুরা ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়। জানা যায় যে, মেয়েটি যখন স্কুলে যাচ্ছিল তখন পার্শ্ববর্তী মসজিদ পাড়া গ্রামের হাসান ও ইসমাইল নামের দুজন সেটেলার মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। পরে মেয়েটির চিৎকার শুনে তার মা এগিয়ে গেলে দোষীরা পালিয়ে যায়। পরে মেয়েটি সামাজিক অপবাদের ভয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। আহত অবস্থায় তাকে মানিকছড়ি হসপিটালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পরে মেয়েটির বাবা মানিকছড়ি থানায় দুজন দোষীদের বিরুদ্ধে মামালা করে। ধর্ষনের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বলে জানা গেছে।

রাঙ্গামাটি বরকলে একজন চাকমা নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৭ মার্চ ২০১৭ রাঙ্গামাটি বরকল উপজেলার কুকিছড়া গ্রামে একজন বাঙালি শিক্ষক কর্তৃক একজন চাকমা নারী ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়। জানা যায় যে, অভিযুক্ত মিজানুর রহমান কুকিছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করার পর ৩ বছর ধরে উদ্দীপন চাকমার বাড়িতে বসবাস করে আসছিল। উদ্দীপন চাকমা জুম চাষের জন্য জুম খামারে যাওয়া পূর্বে মিজানুর রহমানকে অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য ধর্ষণের চেষ্টার শিকার মহিলাটির বাসায় থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। ঘটনার দিন মধ্যরাতে ঐ শিক্ষক মহিলাটিকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। এমন সময় মহিলাটি চিৎকার করলে প্রতিবেশী সুজবন চাকমা এবং ক্যইছা মারমা মহিলাটিকে উদ্ধার করেন। তার পরদিন ২৮ মার্চ ২০১৭ শান্ত চাকমা নারী ও শিশু দমন প্রতিরোধ ধারায় বরকল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

মাটিরাঙ্গায় সেটেলার বাঙালির হামলায় একজন ত্রিপুরা নারী এবং দুজন ব্যক্তি আহত

গত ১ এপ্রিল ২০১৭ খাগড়াছড়ি মাটিরাঙ্গায় মুনিছিপালিটির ডালিয়া খাল এলাকার সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর একজন নারী হামলার শিকার হন। হামলার শিকার মহিলাটি হেমন্দ্র ত্রিপুরার (৩০) স্ত্রী এবং খাগড়াছড়ি জেলার ৩নং মাটিরাঙ্গা মুনিচিপালি ওয়ার্ডের নবচন্দ্র কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা। আহত মহিলাটিকে মাটিরাঙ্গা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা যায় যে, ঘটনার দিন আনুমানিক ২:৩০ ঘটিকায় যখন হামলার শিকার নারী গোসল করার জন্য ডালিয়া খালে গেলে তখন হাসপাতাল এলাকার মো: মাসুম-এর নেতৃত্বে ৪ জন সেটেলার বাঙালি তাকে উত্যক্ত করে। এসময় মহিলাটি প্রতিবাদ করলে সেটেলাররা তাকে হামলা করে। এতে মহিলাটি তার মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। হামলার শিকার মহিলাটি চিৎকার করলে তার স্বামী হেমন্দ্র ত্রিপুরা এবং অলি চাকমা (১৮) তার চিৎকার শুনে সামনে এগিয়ে যান। এ সময় সেটেলাররা তাদের উপর হামলা করে। যখন খবরটি দ্রুততার সাথে ছড়িয়ে পড়লে তখন স্থানীয়রা সেখানে পৌঁছায় এবং অভিযুক্ত মাসুমকে আটক করে।

বাকী অংশ ৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

রুমা গ্যারিসনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু উচ্ছেদের আতঙ্কে জুম্ম গ্রামবাসী

গত ২ মার্চ ২০১৭ বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রুমা উপজেলার ৩৬৬নং সেগুম মৌজার ময়ুরপাড়া ও নামে পাড়ার ৬১ জন অধিবাসী রুমা সেনানিবাসের জন্য ৯৯৭ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া স্থগিত করার দাবি জানিয়ে রুমা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে বান্দরবান জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট একটি দরখাস্ত পেশ করেন। উক্ত দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, রুমা সেনানিবাস/গ্যারিসন সম্প্রসারণের নামে ৯,৫৬০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করার জন্য সেনাবাহিনী ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১১ সালে চেষ্টা করে। এর প্রতিবাদে ৩ মে ২০১১ তারিখে শান্তিপূর্ণভাবে হাজার হাজার জুম্ম গ্রামবাসী রুমা উপজেলা সদর হতে বান্দরবান সদর পর্যন্ত লং মার্চ আয়োজন করে। স্থানীয় জনগণের আন্দোলনের মুখে ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন রুমা জোনের কমান্ডারের নেতৃত্বে সেগুম, পান্তলা ও গ্যালেংগ্যা মৌজার অধিবাসীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। জোন কমান্ডার উপস্থিত সকলের সামনে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, সেনাবাহিনী ৯৬৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করবে না। গ্যারিসনের বাউন্ডারি ভিতরে মাত্র ৯৯৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে, যার চৌহদ্দি উত্তরে গ্যারিসনের পাহাড়/কাইন্দালা ও আম্রাইক্রি ঝিরি, দক্ষিণে নাইক্যকম্রং ঝিরি হয়ে জাদিবা ম্রং হিলিপ্যাড নিচে মরা ঝিরি, পূর্বে ব্যাটালিয়ন আনসার অফিসার মেস নিচে মরা ঝিরি ও লুক আউট (বর্তমান রবি টাওয়ার), পশ্চিমে সদরঘাট ব্রীজ মেইন রোড ও রয়েল পাড়া। এতে এলাকার কোন মানুষের ক্ষতি হবে না মর্মে জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে বলা হয় এবং এই আশ্বাস ভিত্তিতে এলাকাবাসী তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন।

কিন্তু সম্প্রতি আর্মিন ও সার্ভেয়ারের মাধ্যমে জমি পরিমাপ বা জরিপে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে এলাকাবাসীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাবিত জমির চৌহদ্দি চেয়ে অনেক বেশি জমি বেদখল করা পাঁয়তারা চলছে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক কর্তৃক পাঠানো সার্ভেয়ারদের জরিপে ৯২২ একর এবং সেনাবাহিনীর জরিপে ৮৮৮ একর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখনো আরো ৭৫ একর জমি কম রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। পরিমাপ বা জরিপ অনুসারে জমি অধিগ্রহণ করা হলে উক্ত গ্রামবাসীর আবাদী জমির ৭০% জমি সেনা গ্যারিসনের ভেতরে চলে যাবে। আর বাকী ৭৫ একর জমিসহ যদি নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে উক্ত গ্রামবাসীর আর কোন আবাদী জমি থাকবে না। তারা সকলেই নিজ ভুমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

নাইক্ষ্যংছড়ির ১০০ একরের বাতিলকৃত লীজ ডিসি কর্তৃক অবৈধভাবে পুনর্বহাল

সম্প্রতি বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরে বাতিল হয়ে যাওয়া লীজ গোপন প্রক্রিয়ায় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক পুনর্বহাল করে আবার নতুন করে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের ঘনিষ্ট আত্মীয় হিসেবে পরিচিত ৪ ব্যক্তিকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তারই সূত্র ধরে বহিরাগত ঐ চার ব্যক্তি গত ১১ মার্চ ২০১৭ কক্সবাজার জেলার উখিয়া থেকে বিশাল দলবল নিয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ২৬৮নং রেজু মৌজা ও ২৬৯নং সোনাইছড়ি মৌজার স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙালিদের ভোগদখলকৃত ও চাষাবাদের জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করতে আসে। এক পর্যায়ে তারা ৫.০০ একর পরিমাণ জায়গা পরিষ্কার করে দখল করে। এতে স্থানীয় পাহাড়ী ও বাঙালিরা বাধা দিলে গত ১২ মার্চ ২০১৭ ভূমিদস্যু সুরত আলম স্থানীয় ১৪ জন পাহাড়ী-বাঙালির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও ভূমি দখলের মিথ্যা মামলা দায়ের করে। উল্লেখ্য যে, এই অবৈধ ও পুনরায় লীজ অনুমোদনের ফলে অনুমোদনপ্রাপ্ত বহিরাগত ব্যক্তিদের দখলের প্রক্রিয়ার কারণে প্রায় শতাধিক পাহাড়ী-বাঙালি পরিবার নিজেদের বাস্তুভিটা ও জায়গাজমি থেকে উচ্ছেদের আতঙ্কে রয়েছে বলে জানা গেছে। ঐ লীজ অনুমোদিত জমির মধ্যে জুম্মদের জুমভূমি, মৌজা ভূমি ও চাষাবাদের জমি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে জানা গেছে।

মামলার শিকার স্থানীয় ব্যক্তিরা হলেন- ১। আব্দুল আলম (৪০) পিতা- মৃত মনছুর আলী, ২। বশির আহামদ (৩২) পিতা- মৃত এজাহার মিয়া, ৩। মোহামদ ইসহাক (৩২) পিতা- মৃত নুর আহামদ ৪। আবু তাহের (৩০) পিতা- মৃত মনছুর আলী, ৫। আবুল কাশেম (২৮) পিতা- মৃত মনছুর আলী, সাং- কুমিরা পাড়া রেজু সোনাইছড়ি, থানা নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা। ৬। জাকের আলম (৩০) পিতা মৃত ঠান্ডা মিয়া, সাং-বৈদ্য পাড়া, রেজু থানা নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবান পার্বত্য জেলা। ৭। নাজির হোসেন (৩৫) পিতা- মৃত মনছুর আলী, ৮। দিদার মিয়া পিতা (২৮) পিতা- মৃত নাজির আহমদ ৯। আলী হোসেন (৩২) পিতা- মৃত মনছুর আলী, ১০। মোহামদ জাহাঙ্গির(৩২) পিতা মৃত নজির আহমদ, ১১। জাফর আলম (৩০) পিতা-মৃত নজির আহমদ, ১২। জাহাঙ্গীর (৩১) পিতা-মৃত নুর আহমদ,১৩। জাচা মিয়া, পিতা-মৃত আহমদ নবী, সর্ব সাং- কুমিরা পাড়া রেজু সোনাইছড়ি নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা। ১৪। কেছং তংচংঙ্গ্যা পিতা- মৃত গুরাচরন তংচংঙ্গ্যা, সাং-হেডম্যান পাড়া, রেজু নাইক্ষ্যংছড়ি বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

জানা গেছে, কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়নের রুমখা মাতব্বর পাড়ার বাসিন্দা ১। সুরুত আলম, ২। রাবেয়া বেগম, ৩। ফরিদুল আলম, ৪। জুহুর আলম, সর্বপিতা-মৃত ছৈয়দ হোছেন মাষ্টার, মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব শফিউল আলমের ভাই-বোন হিসেবে পরিচয় দিয়ে সচিবের প্রভাব খাটিয়ে ইতোমধ্যে বাতিল হয়ে যাওয়া ১৯৮১-৮২ সালের রাবার ও হর্টিকালচারের পুরনো লীজের স্থলে নিজেরাই আবার প্রায় ১০০ একরের ভূমি রাবার ও হর্টিকালচারের জন্য গোপন প্রক্রিয়ায় ২০১৪-১৫ সালের দিকে বান্দরবান ডেপুটি কমিশনারের লীজ অনুমোদন লাভ করেন। যা সম্পূর্ণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আইন বিরোধী। জানা গেছে, সুরুত আলম ২৫.০০ একর, যার হোল্ডি নং রাবার ২৮, ১০ মার্চ ২০১৫ তারিখ, রাবেয়া বেগম ২৫.০০ একর, যার হোল্ডিং নং রাবার ৩০, ১ জুলাই ২০১৭

তারিখ, জুহুর আলম ২৫.০০ একর, যার হোল্ডিং নং রাবার ২৯, ১ জুলাই ২০১৪ তারিখ, ফরিদুল আলম ২৫.০০ একর, যার হোল্ডিং নং হর্টিকালচার ২৭, ১ জুলাই ২০১৭ তারিখ, প্রত্যেকে ৪০ বছর মেয়াদের জন্য মোট ১০০.০০ একর জায়গা লীজ অনুমোদন বান্দরবান জেলা প্রশাসনের অনুমোদন লাভ করেন।

পাবলিক হেলথ এলাকা সংলগ্ন জুম্ম বসতিতে সাম্প্রদায়িক হামলা, লুটপাট

গত ১৫ মার্চ ২০১৭ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা শহরের সেনা ও পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগায় পাবলিক হেলথ এলাকা ও সেনাবাহিনীর ব্রিগেড সিগন্যাল কোম্পানীর জলযান ঘাটের পার্শ্ববর্তী জলেভাসা ভূমিতে অবৈধভাবে বসতকারী সেটেলার বাঙালিরা ভূমি বেদখলের উদ্দেশ্যে পাবলিক হেলথ এলাকা সংলগ্ন জুম্ম বসতি রাণী তাতু রায় আদাম এলাকায় দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়। হামলায় রূপা চাকমা (৩৭) স্বামী-রিনেল চাকমা নামে এক নারী আহত হন। হামলাকারীরা জুম্মদের বসতবাড়ির বা নির্মাণাধীন বাড়ির প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মূল্যবান সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং নগদ টাকাসহ অন্তত ২ লক্ষাধিক টাকার চেয়ে বেশী মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার চুরি করে নিয়ে যায়। হামলাকারী সেটেলাররা হামলার প্রতিবাদকারী কয়েকজন জুম্মকে মেরে ফেলারও হুমকি দেয়। হামলার পর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ৪ জনকে আটক করলেও পরে তাদেরকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, অবৈধ বসতকারী সেটেলাররা বেশ কিছু দিন ধরে কোন রাস্তা না থাকা সত্ত্বেও বা রাস্তা করার মত অবস্থা না থাকা সত্ত্বেও অনেকটা উস্কানিমূলকভাবে জুম্ম বসতির ভিতর দিয়ে যাতায়াত করা বা যাতায়াতের রাস্তা তৈরী করার অবাস্তব দাবি করে আসছিল। এমনিতে স্থানটি বছরের অধিকাংশ সময় পানিতে ডুবে থাকে এবং বিভিন্ন পরিবার সেগুলো ইতোমধ্যে ব্যবহার করছে। এঅবস্থায় সেখানে যাতায়াতের রাস্তা তৈরী করলে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। জুম্মরা রাজি নয় বলে সেটেলাররা বিভিন্ন সময় উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে আসছে। এছাড়া তারা প্রায়ই জুম্ম বসতির নিকটবর্তী স্থানে এসে গাঁজা খায় এবং জুম্ম নারীদেরও উত্যক্ত করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা যায়, সেদিন আনুমানিক ১০:৩০ টার দিকে মো: বাবুল মিয়া (ভান্ডারী) (৪৫) ও মো: সাগর (৩২) এর নেতৃত্বে প্রায় ৫০/৬০ জনের মত সেটেলার বাঙালি দা, কিরিচ, খন্তাসহ ধারালো অস্ত্র ও ইটপাটকেল নিয়ে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিয়ে জুম্ম বসতিতে হামলা শুরু করে। সেটেলাররা প্রথমে রতন আলো খীসা, তরা খীসা ও কাহিনী খীসার বাড়ির বাঁশ ও টিনের সীমানা বেড়া ভেঙে ফেলে এবং তারপর বাড়ির জানালার থাই গ্লাস ভেঙে ফেলে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭০ হাজার টাকা। সাথে সাথে সেটেলাররা তরা খীসার আনুমানিক ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের নির্মাণাধীন বাড়ির ৯টি আরসিসি পিলার ভেঙে দেয় এবং ২৫ হাজার টাকা মূল্যের নির্মাণ সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। পাশাপাশি কাহিনী খীসার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র ভাঙচুর করে এবং ওয়ারড্রবের ভেতরে থাকা আনুমানিক ১ ভরি ওজনের স্বর্ণের চেইন, ২ ভরি স্বর্ণের বালা, চার আনা ওজনের এক জোড়া কানের দুল, ১২ আনা ওজনের দুটি আংটিসহ মোট ৪ ভরি ওজনের স্বর্ণ, যার আনুমানিক মূল্য ২ লক্ষ টাকা এবং নগদ ১২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

প্রায় আধা ঘন্টাব্যাপী এই হামলা চলে। হামলার মাঝামাঝি সময়েই এসপি ও ওসির নেতৃত্বে একদল পুলিশ এবং জনৈক সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য সেখানে উপস্থিত হয়। এরপর পুলিশ ও সেনাসদস্যরা ৪ জন হামলাকারী-কে গ্রেফতার করে, কিন্তু হামলার মূল হোতাদের গ্রেফতার করা হয়নি বলে ভুক্তভোগী জুম্মদের অভিযোগ। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- কবির হোসেন, রসুল মিয়া, মোক্তার হোসেন ও ইদ্রিস। জানা গেছে, ঐ দিনই রাণী তাতু রায় আদামের বাসিন্দা হামলার শিকার রতন আলো খীসা বাদী হয়ে ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ৩০/৪০ জনকে অভিযুক্ত করে কোতয়ালী থানায় এজাহার দায়ের করেন। আটককৃত ৪ জনসহ অভিযুক্ত আসামীদের সবাইকে গত ১৯ মার্চ ২০১৭ জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৭ আগস্ট ২০১১ রাতের দিকে উক্ত জলেভাসা ভূমিতে কিছু অপরিচিত বহিরাগত বাঙালি হঠাৎ সেখানে আনাগো-না করতে দেখা যায় এবং ঐ রাতেই তারা সেখানে গাছ, বাঁশ ও টিন দিয়ে ৫টি বাড়ি তৈরী করে। পরদিন ২৮ আগস্ট ২০১১ এরই অত্যন্ত নিকটবর্তী রাণী তাতু রায় আদামের জুম্ম বাসিন্দারা উক্ত বহিরাগত বাঙালিদের বাড়ি তুলতে মানা করে এবং উক্ত বাড়িগুলো ভেঙে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু বহিরাগত বাঙালিরা তারা সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বাড়ি তোলার অনুমতি পেয়েছে বলে জানায়। উল্লেখ্য, পূর্বে নিকটবর্তী কয়েকজন জুম্ম সেখানে বাড়ি তুলতে চাইলে সেই সময় সেনাবাহিনী জায়গাটি পাবলিক হেলথ স্থাপনা এবং সেনা ব্রিগেড ও ব্রিগেড সিগন্যাল কোম্পানীর জলযান ঘাটের অত্যন্ত সন্নিকটে অবস্থিত বলে বাড়ি তুলতে নিষেধ করেন। বিষয়টি জুম্মদের পক্ষ থেকে ব্রিগেডে জানানো হলে তারা সেব্যাপারে এক প্রকার নীরবতা অবলম্বন করে উক্ত অবৈধ বসতির পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেন।

জুম্মদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ফেসবুকে লেখার কারণে

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইমতিয়াজ মাহমুদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে খাগড়াছড়িতে মামলা

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ফেসবুকে উস্কানিমূলক মন্তব্য দেয়ার মিথ্যা অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইমতিয়াজ মাহমুদের বিরুদ্ধে শফিকুল ইসলাম নামে জনৈক সেটেলার বাঙালি গত ২১ জুলাই ২০১৭ তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারায় খাগড়াছড়ি সদর থানায় একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করেছে। উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি কাচালং ডিগ্রী কলেজ শাখার ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ তাসকিন তার ফেসবুক আইডিতে সাম্প্রদায়িক স্ট্যাটাস পোষ্ট করে যা অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল (আজ থেকে চাকমা নিধন শুরু... আর কাচালং ডিগ্রী কলেজে চাকমাদের অতি বাড়াবাড়ি মেনে নিবো না। ...ছাত্রলীগের ভাইরা, দা রামদা যা

আছে তা নিয়ে কলেজে যাবে একটা একটা চাকমা ধরবো আর কাটবো...)। খোরশেদ তাসকিনের স্টাটাসের পর সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ইমতিয়াজ মাহমুদ ফেসবুকে তার ছাত্রজীবনের বন্ধু রাঙ্গামাটির সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ফিরোজা বেগম চিনুকে উদ্দেশ্য করে ছাত্রলীগ কর্মীর এ ধরনের সাম্প্রদায়িক বক্তব্য সম্পর্কে একটি খোলা চিঠি লিখেন। তার প্রেক্ষিতে শফিকুল ইসলাম নামে উক্ত সেটেলার আইনজীবী ইমতিয়াজ মাহমুদের বিরুদ্ধে খাগড়াছড়ি থানায় উক্ত হয়রানিমূলক মামলা করে।

এ মামলায় গত ২৫ জুলাই ২০১৭ বিচারপতি ওবায়েদুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের হাইকোর্ট বেঞ্চ পুলিশ প্রতিবেদন না দেওয়া পর্যন্ত ইমতিয়াজ মাহমুদকে আগাম জামিন দিয়েছেন। আইনজীবী ইমতিয়াজ মাহমুদ সাম্প্রতিক সময়ে লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, রামগড়ে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের গ্রামে হামলার চেষ্টার প্রতিবাদ জানিয়ে ফেসবুকে লিখে আসছিলেন।

গুইমারায় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম শিক্ষার্থীদের উপর হামলার চেষ্টা

গত ৩১ জুলাই ২০১৭ সকাল ৮:৩০ ঘটিকার সময় একতুচ্ছ ঘটনার জের ধরে খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি আনন্দ চন্দ্র সোম ও গুইমারা ইউপি কার্যালয়ের কর্মচারী মো: নুর হোসেন নেতৃত্বে ৮/৯ জন সেটেলার বাঙালি লাঠিসোটা নিয়ে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলার চেষ্টা করে। এ সময়ে জুম্ম ছাত্ররা এগিয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা পালিয়ে যায়। পরে জুম্ম ছাত্ররা স্কুলের মূল ফটক বন্ধ করে দেয়।

জানা যায়, গত ৩০ জুলাই ২০১৭ দুপুর ১১:০০ ঘটিকায় গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরা গুইমারা উপজেলার ডাক্তারটিলা গ্রামের ৯ম শ্রেণির এক মারমা ছাত্রীর সাথে সেটেলার ভিডিপি মো: ফজল পিসি'র ছেলে ৯ম শ্রেণির ছাত্র মুন্নার আপত্তিকর আচরণের প্রতিবাদ করলে মুন্না জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে জুম্ম ছাত্রদের সাথে মুন্নার ধাক্কাধাক্কি হয়। এ ঘটনার জের ধরে গত ৩১ জুলাই ২০১৭ সকাল ৮:৩০ ঘটিকার সময়ে গুইমারা উপজেলা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি আনন্দ চন্দ্র সোম ও গুইমারা ইউপি কার্যালয়ের কর্মচারী মো: নুর হোসেন নেতৃত্বে ৮/৯ জন সেটেলার বাঙালি লাঠিসোটা নিয়ে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলার চেষ্টা করে।

৭৫ পৃষ্ঠার পর

রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে খেলা....

মেকিং ট্রেড, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; (২) আরিফুল, ১০ম শ্রেণি, রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র; (৩) জসিম উদ্দিন, ৯ম শ্রেণি, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; (৪) ইকবাল, ১০ম শ্রেণি, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; (৫) কামরুল হাসান, ১০ম শ্রেণি, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; (৬) সাইফুল, ৯ম শ্রেণি, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট; (৭) মাহফুজুল হক (ছোটন), ১০ম শ্রেণি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট। এছাড়া আরও ৭/৮ জন লোক ছিল। আহত ছাত্রদের আহত উদ্ধার করতে খেলার দর্শনার্থী অতুল বরণ চাকমাকে এগিয়ে গেলে তাকেও পুলিশ এবং হামলাকারীরা লাঠি নিয়ে তাড়া করে। এ সময় পুলিশ সদস্যরা হামলাকারীদের ধরার কোন চেষ্টা করেনি। হাসপাতালে আহতদের ভর্তি করার পর পুলিশের উপস্থিতির সময় হামলাকারী বাঙালি ছাত্ররা আবারও হামলা করতে যায়। তখনও হামলাকারী ছাত্রদের গ্রেফতার না করে পুলিশ সদস্যরা তাড়িয়ে দেয় বলে জানা গেছে। জানা যায়, হামলাকারী বাঙালি ছাত্ররা সবাই ছাত্রলীগ ও বাঙালি ছাত্র পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

এই ঘটনায় রিম্পু চাকমার পিতা কুনেন্দু চাকমা বাদী হয়ে কোতোয়ালী থানায় একটি মামলা করেন। তবে থানায় মামলা করতে গেলে ইনসার্চ অফিসার প্রথমে মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং দোষীদের পক্ষে পক্ষপাতমূলক কথা বলেন। এমনকি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকের রিপোর্ট না পেলে মামলা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

৮৭ পৃষ্ঠার পর

লংগদুতে অগ্নিসংযোগ ঘটনা...

এর আগে মানিকজোড়ছড়ায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উষাতন তালুকদার এমপি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন লংগদু বিপর্যয় ত্রাণ সহায়তা সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির সভাপতি গৌতম দেওয়ান, কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য নিরূপা দেওয়ান। উক্ত সভায় উষাতন তালুকদার এমপি বলেন, লংগদুতে জুম্মদের ঘরবাড়ি লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা একটি অমানবিক ঘটনা। তিনটি গ্রামে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক যে অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে সেটি পরিকল্পনা ছিল। কেননা পরিকল্পিত যদি না হতো তাহলে তেল, পেট্রোল দিয়ে বাড়িতে আগুন দেওয়া হত না। মোটরসাইকেল চালক নুরুল ইসলাম নয়নকে খাগড়াছড়িতে হত্যা করা হয়। কিন্তু লংগদুতে পাহাড়ীদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ দেওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসীদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। ক্ষতিগ্রস্তরা একা নন, তাদের পাশে দেশে ও বিদেশে অনেক মানবতাবাদী ব্যক্তি, সংগঠন ও সরকার রয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়া তিনি নয়ন হত্যাকারীদের সুষ্ঠ তদন্ত করে ও লংগদুতে অগ্নিসংযোগ ঘটনাটি সরকারের কাছে তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের শাস্তির দাবী জানান। তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জানিয়েছে এবং পয়েন্ট অব অর্ডারে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছেন। তারই অংশ হিসেবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের নেতৃত্বে ১৪ দলের একটি প্রতিনিধিদল লংগদু ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে এসেছেন বলে জানান। তিনি সংসদীয় তদন্ত টীম পাঠানোর জন্য সংসদে প্রস্তাব তুলে ধরেছেন বলে জানান।

প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

বান্দরবানে সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতি ও যুব সমিতির দু'জন সদস্যকে গ্রেফতার

গত ১৮ মার্চ ২০১৭ সকাল আনুমানিক ৬:৩০ টার দিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন সদর উপজেলার সুয়ালক-আমতলি সেনাক্যাম্পের একদল সেনাসদস্য টংকাবতী ইউনিয়নের টংকাবতী চাকমা পুনর্বাসন পাড়ার বাসিন্দা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসিজেএসএস) এর টংকাবতী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য বিপ্লব চাকমা (৩৩) পীং-দীর্ঘধন চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির টংকাবতী ইউনিয়ন কমিটির সদস্য অমর চাকমা (৩২) পীং-বাঁশি আই চাকমাকে আটক করে নিয়ে গেছে। জানা গেছে, আটককৃত বিপ্লব চাকমা ও অমর চাকমা এ সময় বাড়ি থেকে বের হয়ে স্ব স্ব জমিতে কাজে যাচ্ছিল। উল্লেখ্য যে, আটককৃত বিপ্লব চাকমা ও অমর চাকমার নামে কোন মামলা ও কোন ওয়ারেন্ট নেই।

রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে জুম্মদের উপর সেনাবাহিনীর তল্লাশী, হয়রানি ও হুমকি

গত ২০ মার্চ ২০১৭ রাতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বিলাইছড়ি সদর উপজেলার বিলাইছড়ি ইউনিয়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৩ বেঙ্গল, দীঘলছড়ি সেনা জোনের সেনাসদস্যরা আহ্জাছড়া গ্রামে অভিযানের নামে অন্তত ৮টি জুম্ম বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে কাগজপত্র তছনছ ও নিয়ে যাওয়াসহ বাড়ির লোকদের হয়রানি ও হুমকি প্রদান করেছে।

জানা গেছে, ঐদিন রাত আনুমানিক ১১:৩০ টার দিকে দীঘলছড়ি সেনা জোনের সেনাসদস্যরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আহ্জাছড়া গ্রামে এই অভিযান চালায়। জনৈক লেফটেন্যান্ট এর নেতৃত্বে একটি দল প্রথমে ধনময় চাকমা (৩৫) পীং-নব কুমার চাকমা-এর বাড়ি ঘেরাও করে বাড়িতে প্রবেশ করে তল্লাশী চালায়। ধনময় চাকমা একাধারে জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি ইউনিয়ন কমিটির সহ-সভাপতি এবং একটি স্থানীয় বেসরকারী সংস্থার প্রকল্প 'ভিসিএফ' এর গ্রাম কমিটির সভাপতি। সেনাসদস্যরা ধনময় চাকমার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় এবং 'ভিসিএফ' এর গ্রাম কমিটির রশিদ বই ও কাগজপত্রসহ গঠনতন্ত্র ধনময় চাকমার পিপি সাইজের ছবি নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় সেনাসদস্যরা ধনময় চাকমাকে নির্দেশ দিয়ে যায় যে, তিনি যেন পরদিন সকালে ১০:০০ টায় দীঘলছড়ি সেনা জোনে গিয়ে দেখা করে। যদি দেখা না করে, তাহলে আবার বাড়ি ঘেরাও করে তাকে আটক করলে আর ছেড়ে দেওয়া হবে না।

অপরদিকে, প্রায় একই সময়ে জনৈক সুবেদারের নেতৃত্বে অপর একটি দল একই গ্রামের আরও ৭টি জুম্ম বাড়িতে তল্লাশী অভিযান চালায়। যাদের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় তারা হলেন- হেমন্ত চাকমা (৪২) পীং-বিপিন চন্দ্র চাকমা, হীরাধন চাকমা (৪৪) পীং-মৃত জ্বলন্ত চাকমা, নবকুমার চাকমা (৭২) পীং-মৃত নিত্যলাল চাকমা, মতিলাল চাকমা (৫৮) পীং-মৃত সুন্দরমনি চাকমা, জীবন চাকমা (৩৪) পীং-হৃদয় মোহন চাকমা, অরুণ বিকাশ চাকমা (৫৭) পীং-মৃত পাথর চাকমা ও হেমন্ত চাকমা (৪৭) পীং-বিপিন চন্দ্র চাকমা। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে হেমন্ত চাকমাকে বেঁধে বেদম মারধর করে সেনাসদস্যরা। এসময় সেনাসদস্যরা হেমন্তকে বলে যে, তার বাড়ির দিকে বন্দুকের আওয়াজ হয়েছে। হেমন্ত নিজে এ জাতীয় কোন আওয়াজ শোনেননি বলে জানালেও সেনাসদস্যরা তাকে মারধর করে। অপরদিকে সেনাসদস্যরা হীরাধন চাকমাকে কানে ধরে উঠবস করতে বাধ্য করে। এছাড়া সেনাসদস্যরা বাড়ির লোকদের বন্দুকধারী কাউকে দেখেছে কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে নাজেহাল করার চেষ্টা করে এবং কেউ জেএসএস-এ কাজ করতে পারবে না বলে ধমকের সুরে জানিয়ে দেয়।

লামায় এক ম্রো হেডম্যানকে সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে নির্যাতন ও পুলিশে সোপর্দ

গত ২১ মার্চ ২০১৭ আনুমানিক বিকাল ৩.০০ ঘন্টিকার সময় বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা উপজেলায় আলীকদম জোন আওয়াধীন লামা চম্পাতলী সেনা ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী গাড়ী যোগে এসে ৩০২ নং লুলাইন মৌজার প্রধান শিংপাত ম্রো হেডম্যানকে নিজ বাড়ির থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তার পরদিন মৌজার প্রজাগণসহ তাঁর আত্মীয়স্বজনরা আলীকদম জোনে গিয়ে খোঁজ নিলে জোন কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে। পরে তাকে বান্দরবান জেলা কারাগারে অন্তরীণ আছে বলে খবর পেয়েছেন তার স্বজনরা। শিংপাত ম্রো এ্যাডভোকেট মকবুল আহম্মেদ কর্তৃ জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বলে তাকে সেনা সদস্যরা তুলে নিয়েছে এবং নির্যাতনের পর পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, সরই ইউনিয়নের অধিবাসী ভূমিদখলদার শেফালী রাণী নাথ স্বামী খোকন কান্তি নাথ কর্তৃক দায়েরকৃত হত্যা মামলা (জিআর- ৬৩/১৬, তারিখ ১৫-০৭-২০১৬) এবং ভূমিদস্যু মকবুল আহম্মেদ কর্তৃক দায়েরকৃত এক চাঁদাবাজি মামলায় (জিআর-৩৪/১৭, তারিখ ১৫-০৫-২০১৭) গ্রেফতার হিসেবে দেখানো হয়।

ক্যবামং মারমাকে রোয়াংছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

গত ২২ মার্চ ২০১৭ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্যবামং মারমাকে রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণ করার ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের (উপজেলা-২ শাখা) সিনিয়র সহকারী সচিব লুৎফর নাহারের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনের (নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.১০৪. ১০৪.২০১৬-২৮৯ তারিখ ২২ মার্চ ২০১৭ মূলে) মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা

পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(ক) ও ১৩(১)(গ) ধারায় অসদাচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ক্যবামং মারমাকে অপসারণ করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বস্তুত ক্যবামং মারমার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ সাজানো ও ষড়যন্ত্রমূলক। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমাকে রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের হীনউদ্দেশ্যে সরকারের একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ক্যবামং মারমার বিরুদ্ধে অপহরণ, চাঁদাবাজি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগ এনে একের পর এক সাজানো মামলা দায়ের করা হয়। একটি মামলায় জামিন লাভের পর আরেকটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে ক্যবামং মারমাকে তাঁর রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করা হয়। ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতাসীনদের একটি বিশেষ মহল কর্তৃক জনগণের ভোটে নির্বাচিত ক্যবামং মারমাকে রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে এভাবে অপসারণ করা সরকারের অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী নীতিরই বহি:প্রকাশ বৈ কিছু নয়। ক্ষমতার জোরে ও অগণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যানকে সরকারী আদেশের মাধ্যমে অপসারণ করার ঘটনা দেশের গণতন্ত্র ও জনগণের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের সামিল বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে।

অতএব, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক উপায়ে ও ফ্যাসীবাদী কায়দায় ক্যবামং মারমাকে রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণের আদেশ দেশের গণতন্ত্র, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও রোয়াংছড়ি উপজেলাবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অচিরেই বাতিল করত: ক্যবামং মারমাকে রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে পুনর্বহাল এবং সেই সাথে ক্যবামং মারমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সাজানো ও ষড়যন্ত্রমূলক সকল মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

কাপ্তাইয়ে বিস্ফোরক গুঁজে দিয়ে জেএসএস ও পিসিপির দুই সদস্যকে গ্রেফতার

গত ৩১ মার্চ ২০১৭ ভোরে জনসংহতি সমিতির রাইখালী ইউনিয়ন কমিটির সভাপতি ও রাইখালী ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার থোয়াই শৈনু মারমা (৪৭) এবং পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কাপ্তাই থানা কমিটির সভাপতি ক্যচিংহ্লা মারমাকে (২৩) রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন ১৯ ব্যাটেলিয়নের ওয়াগ্গা বিজিবি জোনের সদস্য কর্তৃক গ্রেফতার করা হয়।

জানা যায় যে, সেদিন আনুমানিক রাত ১:০০ ঘটিকায় বিজিবি সদস্যরা কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের নারানগিরি মুখ গ্রামের থোয়াই শৈনু ও তার ছেলে ক্যচিংহ্লা মারমার বাড়ি ঘেরাও করে। এরপর তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে বিস্ফোরক দ্রব্য গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার করা হয় বলে জানা যায়। গ্রেফতারের পর প্রথমে ওয়াগ্গা বিজিবি জোনে, এরপরে ডংছড়ি বিজিবি ক্যাম্পে নিয়ে যায়। বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে মধ্যযুগীয় কায়দায় অমানবিকভাবে মারধর করে আহত করে। সর্বশেষ রাত ১০:০০ টার দিকে চন্দ্রঘোনা থানায় গুরুতর আহত অবস্থায় তাদেরকে সোপর্দ করে বলে জানা যায়। ক্যচিংহ্লা মারমা রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের বিএ (অনার্স) শেষ বর্ষের ছাত্র ও পরীক্ষার্থী।

এছাড়া সেদিন আনুমানিক দুপুর ১:০০ টার দিকে বিজিবি সদস্যরা কাপ্তাই উপজেলাধীন ভালুক্যা পাড়ায় জনসংহতি সমিতির রাইখালী ইউনিয়ন কমিটির ভূমি ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক এবং রাইখালী ইউনিয়ন পরিষদের ৭নং ওয়ার্ডের মেম্বার রঞ্জিত তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি ঘেরাও করে। বাড়িতে ঢুকে বিজিবি সদস্যরা সিন্দুকের তালা ভেঙ্গে তল্লাসী চালায় ও বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে। এছাড়া জনসংহতি সমিতির কাপ্তাই থানা কমিটির সদস্য সমীরণ তঞ্চঙ্গ্যার বাড়িও ঘেরাও করে বলে জানা গেছে।

সেনাবাহিনীর নির্যাতনে নান্যাচরে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

গত ৫ এপ্রিল ২০১৭রাঙ্গামাটির নান্যাচর উপজেলার নান্যাচর কলেজের এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক করা হয় এবংসেনা প্রহরায় ১৯ এপিল ২০১৭ চট্টগ্রাম মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় বলে জানা যায়।

জানা যায়, নান্যাচর কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্র রমেল চাকমা (১৯) পিতা- বিনয় কান্তি চাকমা, মাতা-আলোদেবী চাকমা, গ্রাম-পূর্ব হাতিমারা, বুড়িঘাট ইউনিয়ন, নান্যাচরকে ৫ এপ্রিল নান্যাচর উপজেলা এলাকা থেকে নান্যাচর আর্মী জোনের সেনা সদস্যরা আটক করে। সেদিন পরীক্ষা না থাকায় রয়েল চাকমা নান্যাচর বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে ফেরার পথে তাকে আটক করা হয়। আটক করার পর তাকে অমানবিকভাবে সেনা সদস্যরা মারধর করে। ফলে সেদিন সেনা সদস্যরা তাকে নান্যাচর থানায় সোপর্দ করতে চাইলে তার অবস্থা বেগতিক দেখে থানা কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে সেনা সদস্যরা তাদের হেফাজতে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৯ এপ্রিল ২০১৭ চট্টগ্রাম মেডিকেলে মারা যান বলে জানা যায়।

রমেল চাকমার মৃত্যুর খরব ছড়িয়ে পড়ার পর রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় জুম্ম ছাত্র-জনতা প্রতিবাদে গর্জে উঠে। সেনাবাহিনী জুম্ম ছাত্র-জনতার এই ক্ষোভের আগুনে আবার ঘি ঢেলে দেয়, রমেল চাকমার লাশ তার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের

নিকট হস্তান্তর করার পর তাদের কাছ থেকে লাশটি বুড়িঘাট ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা কেড়ে নিয়ে। তারপর দিন রমেল চাকমার মা-বাবা ও নিকট আত্মীয় ছাড়া এবং পেট্রোল ও কেরোসিন ঢেলে দিয়ে যথাযথ ধর্মীয় আচার ব্যতীত সেনা, পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃক রমেল চাকমার লাশ দাহ করলে জনমনে আরো জোরালো ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

লীজ বাতিলের দরখাস্ত প্রত্যাহার করতে ম্রোদেরকে আলিকদম সেনা জোনের নির্দেশ

গত ২৮ এপ্রিল ২০১৭ আলিকদম সেনা জোনের (১৮ বেঙ্গল) জোন কম্যান্ডার লে: ক: মো: সারোয়ার বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের ম্রো গ্রামবাসীদেরকে সরই ইউপি অফিসে ডেকে ভূমি ইজারা ও রাবার প্লান্টেশন বাতিল করার আবেদন জানিয়ে ম্রো গ্রামবাসী কর্তৃক ইতিমধ্যে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত স্মারকলিপি প্রত্যাহার করতে নির্দেশ করেন এবং তার সম্মতি স্বরূপ ম্রো গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কাগজে দস্তখত নিয়েছেন বলে জানা যায়।

আরো জানা যায় যে, এ সময় জোন কম্যান্ডার কোন সন্ত্রাসীকে চাঁদা না দিতে জানিয়ে দেন এবং সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পূর্বের মতো ম্রো বাহিনী গঠন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময় অন্যান্যের এলাকা হেডম্যান, কার্বারী ও মুরুব্বীরা উপস্থিত ছিলেন। এ নিয়ে ম্রো গ্রামবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

উল্লেখ্য যে, সরই ইউনিয়নের ডলুছড়ি মৌজার নতুন পাড়া, ঢেঁকিছড়া পাড়া ও নোয়া পাড়ায় লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্তৃক ইজারার নামে আদিবাসী ম্রো অধিবাসীদের কমপক্ষে ১,৬০০ একর জায়গা দখল করা হয়েছে। লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লি: এর ৬৪টি প্লট বাতিল করা না হলে শত শত পরিবার ম্রো উচ্ছেদ হবে। কারণ এলাকার সকলের অবলম্বন হচ্ছে একমাত্র জুম চাষ। এলাকার জুম চাষী ম্রো অধিবাসীরা লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ লি: এর নামে বিভিন্ন জনের নামে ৬৪টি প্লট বাতিলসহ আশু প্রতিকারের দাবি জানিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে।

বরকলের ভালুভিটায় বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে বিজিবি বাধা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বরকল উপজেলাধীন বরকল উপজেলা সদর সন্নিকটস্থ কর্ণফুলি নদীর বুকে অবস্থিত ভালুভিটায় ১৯ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন একটি বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে বরকল বিজিবি জোন (২২ ব্যাটেলিয়ন) কর্তৃপক্ষ গত ১ মে ২০১৭ তারিখ বাধা দিয়েছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতি ব্যতীত বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করতে বারন করেছে বিজিবি।

জানা যায় যে, বরকল কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহারের অধীনে ১৯৪০ সাল থেকে উক্ত ভালুভিটায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পূজা-অর্চনা করে আসছে। ইতিমধ্যে এলাকাবাসী সেখানে ঘ্যাং স্থাপন করেছে। উক্ত স্থানে ১৯ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন একটি বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের পরিকল্পনা করে বরকল কেন্দ্রীয় বৌদ্ধ বিহার পরিচালনা কমিটি। ১ মে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন করার দিনক্ষণ ঠিক করা হয়। তার আগে ৩০ এপ্রিল উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান না করার জন্য পরিচালনা কমিটির সভাপতি মংহ্লা সিং মারমাকে বরকল বিজিবি জোনের জোন কম্যান্ডার লে. ক. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল মামুন নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গত ১ মে এলাকাবাসী উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এবং বুদ্ধমূর্তি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। তবে কয়েকজন পুলিশ সমেত একদল বিজিবি সদস্য সেখানে গিয়ে বরকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতি ব্যতীত উক্ত বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করতে বারন করে এসেছে বলে জানা গেছে। তাৎক্ষণিকভাবে কমিটির লোকজন বরকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে দেখা করে বিষয়টি অবহিত করেন। গত ২ এপ্রিল পরিচালনা কমিটির লোকজন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে দেখা করতে যান। কাগজপত্রসহ একটি দরখাস্ত জমা দেয়ার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জমা দিতে পরিচালনা কমিটির সদস্যদেরকে পরামর্শ প্রদান করেন।

লামায় ভূমি বেদখল তদন্তে আসা নাগরিক প্রতিনিধিদলকে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধা প্রদান

গত ৬ মে ২০১৭ তারিখ মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, সংবাদ কর্মী সমন্বয়ে গঠিত ঢাকার একটি নাগরিক প্রতিনিধিদল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় বহিরাগত প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পাহাড়ীদের ভূমি বেদখল ও আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদের অভিযোগ বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত এবং তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে স্থানীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক লামায় প্রবেশে বাধা দানের শিকার হয়েছেন। ফলে সরেজমিন তদন্ত করতে না পেরে ও বান্দরবান জেলা প্রশাসনের সাথে সাক্ষাৎ করতে না পেরে নাগরিক প্রতিনিধিদল ঐ দিনই ঢাকায় ফিরে আসতে বাধ্য হন। ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে নাগরিক প্রতিনিধিদলের মধ্যে অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেন- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, মানবাধিকার কর্মী নুমান আহম্মদ খান, রওশন মাসুদা, আইনজীবী ও লেখক এ্যাডভোকেট প্রকাশ বিশ্বাস, নিউ এইজ-এর বিশেষ প্রতিবেদক জুয়েল আলমগীর, দৈনিক সমকালের চট্টগ্রাম ব্যুরোর স্টাফ রিপোর্টার আবদুল্লাহ আল মামুন, দৈনিক ভোরের কাগজ-এর প্রতিনিধি আজিজুর রহমান, দৈনিক প্রথম আলোর বান্দরবান প্রতিনিধি বুদ্ধজ্যোতি চাকমা, ডেইলী স্টার-এর বান্দরবান প্রতিনিধি সঞ্জয় বড়ুয়া, মানবাধিকার কর্মী টিসেল চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা প্রমুখ।

জানা গেছে, ঐ দিন সকাল ৯:০০ টার দিকে ঢাকা থেকে আগত নাগরিক প্রতিনিধিদল লামায় প্রবেশ করতে চাইলে তাদেরকে লামার ইয়াংছা বাজারে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বাধা দেয়া হয় এবং নাগরিক প্রতিনিধিদলকে সেখানে প্রায় একঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, ঐদিন একটি স্বার্থান্বেষী বিশেষ মহলের মদদে কিছু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী সেটেলার বাঙালি বস্তুত কোন ইস্যু ছাড়াই সফরকারী প্রতিনিধিদলকে সফরে বাধা দানের হীন উদ্দেশ্যে

তাৎক্ষণিক সড়ক অবরোধের ডাক দেয়। অপরদিকে কিছু সংখ্যক ম্রো জনগোষ্ঠীর মানুষকে অনেকটা বাধ্য করে এনে অবরোধে অন্যতম ব্যানার হিসেবে দাঁড় করানো হয়।

ঢাকায় আহুত সংবাদ সম্মেলনে পঠিত নাগরিক প্রতিনিধিদলের প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'লামায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার পর বান্দরবান জেলা প্রশাসনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বান্দরবান জেলা সদরে যাওয়ার পথে দুপুর ১২ টার দিকে নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে নাগরিক প্রতিনিধিদলকে বান্দরবানের রেইছা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা আবার বাধা প্রদান করে। বিশেষ বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে লামা ও বান্দরবান সদরে প্রবেশে বাধা প্রদান করা হয়েছে বলে যথাক্রমে ইয়াংছা বাজার ও রেইছা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা জানালে তাৎক্ষণিকভাবে জেলা প্রশাসনের সাথে নাগরিক প্রতিনিধিদল যোগাযোগ করেন। লামা ও বান্দরবান সদরে প্রবেশে প্রতিনিধিদলের উপর কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছিল না বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদলকে জানানো হয়েছে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন অসহায় বলেও প্রতিনিধিদলের কাছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফলে সরেজমিন তদন্ত করতে না পেরে ও বান্দরবান জেলা প্রশাসনের সাথে সাক্ষাৎ করতে না পেরে নাগরিক প্রতিনিধিদল গতকাল ঢাকায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।'

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ রয়েছে এবং জাতীয় দৈনিকেও একাধিকবার এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যে, লামা উপজেলার তিনটি এলাকায় আদিবাসী জুম্মরা বহিরাগতদের কর্তৃক ভূমি বেদখলের শিকার হয়েছেন এবং অনেকেই তারা স্বভূমি থেকে উচ্ছেদের মুখে রয়েছেন। যেমন- (এক) সরই ইউনিয়নের ডলুছড়ি মৌজায় লামা রাবার ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্তৃক ম্রো ও ত্রিপুরা গ্রামবাসীর কমপক্ষে ১,৬০০ একর ভূমি বেদখল করা হয়েছে যেখানে কমপক্ষে শতাধিক পরিবার ম্রো গ্রামবাসী উচ্ছেদের মুখে রয়েছে; (দুই) ডলুছড়ি মৌজায় কোয়ান্টাম নামে একটি এনজিও কর্তৃক প্রায় ২,০০০ একর ভূমি বেদখল করেছে এবং কোয়ান্টামে পাহাড়ী ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষায় কথা বলার সুযোগের অভাবের কারণে তাদের মাতৃভাষা ভুলে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে; (তিন) ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের ত্রিশঢেবায় লাদেন গ্রুপ কর্তৃক মারমা, ত্রিপুরা ও ম্রোদের রেকর্ডীয় ও ভোগদখলীয় প্রায় ৫০০ একর ভূমি বেদখল ও আদিবাসী বাচিং পাড়া উচ্ছেদের অভিযোগ।

রাঙ্গামাটি জেলায় সেনাবাহিনীর ধর্মীয় পরিহানি

গত ১৭ মে ২০১৭ লংগদু থেকে আসা একদল সেনা লংগদু ও নানিয়ারচর সীমান্তে অবস্থিত থলচাপ তপোবন অরণ্য ভাবনা কুটির ভাঙচুর করে। এ সময় কুটিরে কোন ভিক্ষু বা শ্রামণ ছিল না। সেনা সদস্যরা কুটিরের দরজা ভেঙে জুতা পায়ে অস্ত্রসহ ভেতরে প্রবেশ করে এবং বুদ্ধ আসন ভেঙে দিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে। নানিয়ারচরের রত্নাঙ্কুর বনবিহারের অধ্যক্ষ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষুর উদ্যোগে ২০০৫ সালে উক্ত ভাবনা কুটির স্থাপন করা হয় বলে জানা যায়। উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ২২ মে সকালে জুম্মরা বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচি আয়োজন করলে তাতে সেনাবাহিনী প্রথমে বাধা প্রদান করে ও পরে এলোপাতাড়ি লাঠিপেটা করে। এতে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ ৩৭ জন আহত হয়। তাদের মধ্যে সাধনা চাকমা ও কালেনজয় চাকমা নামে দুজন গুরুতরভাবে আহত হন। তাদেরকে প্রথমে নানিয়ারচর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাদেরকে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া এঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেবলে জানা গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, শান্তিপূর্ণভাবে র‍্যালি সহকারে স্মারকলিপি দিতে যাবার সময় প্রথমে টিএন্ডটি পার্শ্বস্থ নান্যাচর জোনের সেনা চেক পোস্টে বাধা দেয়া হয়। জনতার স্রোত সে বাধা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যায়। মিছিলটি যখন জোন ক্যান্টিনের সামনে পৌঁছে তখন পরিকল্পিতভাবে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালানো হয়। হামলার পর কেউ পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আর কেউ দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। এতে কারোর ভাঙে হাত, আবার কারোর ফাটে মাথা। কেউ আঘাত পায় হাতে, কেউবা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে।

গত ১০ মে ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলার রাজস্থলী উপজেলা সদরে বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় র‍্যালি চলাকালে রাজস্থলী সেনা জোনের সেনারা র‍্যালির সামনে ও পেছনে ঘিরে থাকে। যদিও সেনা সদস্যরা ধর্মীয় র‍্যালীতে কোন ধরনের বাধা প্রদান করেনি, তবে সেনা সদস্যদের উপস্থিতি র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারী জুম্মদের মধ্যে একধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

গত ১৪ মে ২০১৭ আনুমানিক সকাল ১০.৩০ টার দিকে নান্যাচর জোন থেকে মেজর জাকিরের নেতৃত্বে একদল সেনা রাঙ্গামাটি সদরের কুদুকছড়ি আবাসিক এলাকায় জনৈক গ্রামবাসীর ধর্মীয় অনুষ্ঠান (সংঘদান ও অষ্টপরিস্কার দান) ভন্ডুল করে দেয়ার চেষ্টা করে বলে জানা যায়। সেনা সদস্যরা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজকের বাড়ির পার্শ্ববর্তী বর্তমান কুতুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান কানন চাকমার বাড়িসহ আশেপাশের কয়েকটি বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং প্রায় ঘন্টা দেড়েক বাড়িগুলোর চতুর্পাশে অবস্থান নিয়ে অনুষ্ঠানে সমবেত ব্যক্তিগণসহ সকলের নাম ও ঠিকানা লিখে নিয়ে যায়।

রাইখালীতে বিজিবি কর্তৃক জেএসএস সভাপতির বাড়ি তল্লাসী, তছনছ, মারধর

গত ১ জুন ২০১৭ ভোর রাতে ওয়াগ্গা বিজিবি জোন ও ডংছড়ি বিজিবি ক্যাম্প থেকে ১৯ ব্যাটেলিয়নের একদল বিজিবি সদস্য রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী ইউনিয়নের নারানগিরি মুখের একনম্বর পাড়ায় অবস্থিত জনসংহতি সমিতির রাইখালী ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আরেইসে মারমার (৫৫) বাড়ি তল্লাসী চালায়। এ সময় বিজিবি সদস্যরা আরেইসে মারমার স্ত্রী মাথুইচিং মারমাকে হাতকড়া পরিয়ে বেঁধে রাখে এবং তাঁর মেয়ে উনুসিং মারমাকে চড়-থাপ্পড় মারে বলে জানা যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, সেদিন রাত ১:৩০ টায় বিজিবি সদস্যরা আরেইসে মারমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং আরেইসে মারমার পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে তুলে বাড়ি তল্লাসী শুরু

করে। ভোর ৪:০০ টা পর্যন্ত বিজিবির এ তল্লাসী চলে। এ সময় বিজিবি সদস্যরা আরেইসে মারমাকে খুঁজতে থাকে। উল্লেখ্য যে, আরেইসে মারমা এ সময় বাড়িতে ছিলেন না। বিজিবি সদস্যরা তাদের সঙ্গে নেয়া ব্যাগে ঢুকানো বিস্ফোরক দ্রব্য আরেইসে মারমার বাড়িতে লুকিয়ে রাখার সময় আরেইসে মারমা মেয়ে উনুসিং মারমা দেখতে পান এবং সাথে সাথে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন যে, "এগুলো আপনারা সঙ্গে এনেছেন। এগুলো আমাদের বাড়িতে ছিল না।" বিস্ফোরক দ্রব্য পুঁতে রাখতে ব্যর্থ হয়ে এ সময় এক বিজিবি সদস্য উনুসিং মারমাকে সজোরে চড় মারে।

তল্লাসীর একপর্যায়ে বিজিবি সদস্যরা আরেইসে মারমার স্ত্রী মাথুইচিং মারমাকে হাতকড়া পরিয়ে বেঁধে রাখে। আরেইসে মারমার ছেলে ও পুত্রবধুর রুমে ঢুকে বিজিবি সদস্যরা তল্লাসী চালায়। বাড়ির কাপড়-চোপড় ও বাড়ির জিনিষপত্র তছনছ করে দেয়। বিজিবি সদস্যরা তাদের মোবাইল কেড়ে নেয়। এ সময় 'অস্ত্র কোথায় আছে' তা জিজ্ঞাসা করে এবং তা বের করে দিতে পরিবারের সদস্যদের উপর বিজিবি সদস্যরা চাপ দিতে থাকে। দেখিয়ে না দিলে তাদেরকে আটক করে চালান দেয়া হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হবে বলে হুমকি দিতে থাকে। পরিবারের সদস্যদের ঘরের বাইরে রেখে বিজিবি সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানি করে। ভোর ৪:০০ টায় চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ঘরে ঢুকতে এবং ঘুমাতে দেয়নি। পরে 'বিজিবি সদস্যরা কিছুই করেনি' লিখে উনুসিং মারমা থেকে সাদা কাগজে দস্তখত নিয়ে বিজিবি সদস্যরা চলে যায়।

বিলাইছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক তিন গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি তল্লাসী ও হয়রানি

গত ৩০ জুন ২০১৭, বিকাল আনুমানিক ৫:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার দীঘলছড়ি সেনা জোন, ১৩ বেঙ্গল এর টুআইসি মেজর মারুফের নেতৃত্বে জোন ও পার্শ্ববর্তী গাছকাবা ছড়া সেনাক্যাম্পের ৩১ জনের একদল সেনাসদস্য উপজেলার কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের ঢেবাছড়ি গ্রামে জনসংহতি সমিতির এক সদস্যসহ ৩ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে হয়রানিমূলকভাবে তল্লাশী চালায়, জিনিসপত্র তছনছ করে এবং বাড়ির লোকদের মেরে ফেলার হুমকী প্রদান করে।

জানা গেছে, সেনাসদস্যরা প্রথমে গ্রামবাসী ইন্দ্রজিত চাকমার (৩৬) বাড়ি ঘেরাও করে বাড়িতে তল্লাশী চালায় এবং আসবাবপত্র ও কাপড়চোপড় তছনছ করে দেয়। ইন্দ্রজিত চাকমা এসময় বাড়িতে ছিলেন না। সেনাসদস্যরা এসময় ইন্দ্রজিতের বার বছরের মেয়েকে ধমক দিয়ে গতকাল কে কে ভাত খেয়েছে বলে জিজ্ঞেস করে এবং ইন্দ্রজিতের স্ত্রীকে একটি দা দেখিয়ে কেটে মেরে ফেলবে বলে হুমকী প্রদান করে। প্রায় এক ঘন্টা তল্লাশীর পর সেনাসদস্যরা ইন্দ্রজিতের স্ত্রীর কাছ থেকে জোরপূর্বক সাদা কাগজে দস্তখত আদায় করে। এরপর সেনাসদস্যরা পরপর জনসংহতি সমিতির কেংড়াছড়ি ইউনিয়ন কমিটির সদস্য ও গ্রামের কার্বারী অমরজিত চাকমা (৪০) ও হরিলাল চাকমা (৩৯) পীং-কালাবো চাকমা এর বাড়িতে তল্লাশী চালায় এবং বাড়ির জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। বলাবাহুল্য নিরীহ জুম্মদেরকে হয়রানি করা, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সন্ত্রাসী হিসেবে ফাঁসানো এবং এলাকার সাধারণ জুম্মদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক এধরনের অযৌক্তিক তল্লাশী চালানো হয়েছে, যা মানবাধিকার লংঘনের সামিল।

রোয়াংছড়িতে গোয়েন্দা বাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির দু'জন সদস্যকে গ্রেফতার

গত ৩ জুলাই ২০১৭, দুপুর আনুমানিক ১২:০০ টার দিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়ন কমিটি'র সাংগঠনিক সম্পাদক রাঙ্গোলাল তঞ্চঙ্গ্যা (৪৭) পীং-ললিত মোহন তঞ্চঙ্গ্যা বান্দরবান জেলা সদরস্থ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন একটি সাজানো মামলায় হাজিরা দিতে আসেন। যথারীতি আদালতে হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় দুপুর আনুমানিক ১২:৩০ টার দিকে বান্দরবান ডিসি অফিসের পশ্চিম দিক থেকে সাদা পোশাক পরিহিত গোয়েন্দা বিভাগের তিন জন লোক রাঙ্গোলাল তঞ্চঙ্গ্যাকে জোরপূর্বক আটক করে মোটর সাইকেলে তুলে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে গেছে তা এখনও জানা যায়নি। রাঙ্গোলাল তঞ্চঙ্গ্যার বাড়ি রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের তাইম্রংছড়া পাড়া গ্রামে। অন্যদিকে রিপন তঞ্চঙ্গ্যাকে (৩৫) কুহালং এলাকা থেকে গ্রেফতার করে।

রুমায় সেনাবাহিনী কর্তৃক জনসংহতি সমিতির দু'জন সদস্যকে গ্রেফতার

গত ১৪ জুলাই ২০১৭ দিবাগত রাত আনুমানিক ৩:৩০ টার দিকে বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন রুমা উপজেলা সদরে অবস্থিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২৯ বেঙ্গলের রুমা সেনা গ্যারিসনের কম্যান্ডার লে: কর্ণেল আতিকুর রহমান ও মেজর মেহেদির নেতৃত্বে সেনা ও পুলিশের একটি দল জনসংহতি সমিতির রুমা থানা কমিটির সদস্য ও রুমা সদর ইউনিয়ন পরিষদের ৩য় বার নির্বাচিত সদস্য শৈহ্লাপ্রু মারমা (৫০) পীং-মুই থুই মারমা, বর্তমান ঠিকানা-ইডেনপাড়া রোড, রুমা বাজার এর বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে শৈহ্লাপ্রু মারমাকে গ্রেফতার করে। শৈহ্লাপ্রু মারমা'র বাড়িতে কোন অস্ত্র না থাকা সত্বেও সেনা-পুলিশ সদস্যরা তল্লাশীকালে তার বাড়ি থেকে দুটি পিস্তল উদ্ধার করেছে বলে উল্লেখ করে এবং এই অজুহাতে শৈহ্লাপ্রু মারমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

অপরদিকে একই দিন উক্ত সেনা ও পুলিশ সদস্যরা গ্রেফতারকৃত শৈহ্লাপ্রু মারমা'র বাড়ির পার্শ্ববর্তী গ্রাম লুংঝিড়ি গ্রামের বাসিন্দা জনসংহতি সমিতির রুমা থানা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ও পাইন্দু ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ক্যসাপ্রু মারমা (৪৮) পীং-মৃত মংচিং মারমা এর বাড়িতেও রাত ২:৩০ টা নাগাদ তল্লাশী চালায় ও জিনিসপত্র তছনছ করে দেয়। তল্লাশীর সময় মেজর মেহেদি নিজে বাড়িতে প্রবেশ করে।

টিটিসিতে ছাত্রী উত্যক্তকারীর পক্ষ নিয়ে ছাত্রলীগের অপতৎপরতা
পিসিপিসহ সাধারণ ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের, প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা বর্জন

গত ১৭ জুলাই ২০১৭ রাঙ্গামাটি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) পাহাড়ী এক ছাত্র কর্তৃক পাহাড়ী এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করার ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা উত্যক্তকারীকে কিছু উত্তমমধ্যম প্রদান করে। বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে টিটিসির প্রিন্সিপালের উদ্যোগে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া থাকলেও বহিরাগত একদল ছাত্রলীগ কর্মী টিটিসিতে অনুপ্রবেশ করে উত্যক্তকারী ছাত্র ছাত্রলীগের সদস্য দাবি করে উত্যক্তকারীর পক্ষ অবলম্বন করে এবং এক পর্যায়ে বিষয়টি রাজনীতিকরণের চেষ্টা করে উল্টো পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-র নেতৃস্থানীয় কর্মীসহ সাধারণ ছাত্রদের জড়িত করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন টিটিসিতে চলমান পরীক্ষার পরীক্ষার্থীও রয়েছে। বহিরাগত এক ছাত্রলীগ কর্মী কর্তৃক এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দায়েরের প্রতিবাদে এবং মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীরা চলমান পরীক্ষা ও শ্রেণি কার্যক্রম বর্জনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। অপরদিকে প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি ও স্বার্থের বিষয়টি বিবেচনা পূর্বক মামলা প্রত্যাহার করে ঘটনার সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা না করে উল্টো ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের নানাভাবে চাপ, হুমকি দিয়ে জোরজবরদস্তি করার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, পিসিপির পক্ষ থেকে মধ্যস্থতার ফলে উত্যক্তকারীর অভিভাবকগণ বিষয়টির মীমাংসা করতে সম্মত হলেও ছাত্রলীগ কর্মীরা তা বিরোধীতা করছে এবং উত্যক্তকারী ছাত্রকে তাদের হেফাজতে নজরবন্দি থাকতে বাধ্য করছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সেদিন সকাল আনুমানিক ১১:৩০ টার দিকে টিটিসি'র ওয়েল্ডিং ট্রেডের ১০ম শ্রেণির ছাত্রী জুলি চাকমা (১৬) দ্বিতীয় তলার পরীক্ষা কক্ষ থেকে পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে আসার পথে অটোমোবাইল ট্রেডের ৯ম শ্রেণির ছাত্র ঝন্টু চাকমা (১৭) জুলি চাকমাকে অশালীন মন্তব্য করে এবং এমনকি গায়ে হাত দিয়ে উত্যক্ত করে। একসময় দুজনেই একই শ্রেণিতে পড়ত এবং তখন থেকে ঝন্টু জুলিকে অত্যক্ত করত বলে জানা যায়। বিব্রত ও বিরক্ত জুলি দ্বিতীয় তলা থেকে নীচে নেমে আসলে অন্যান্য শ্রেণি বন্ধুদের জানায় বিষয়টি। ক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা উত্যক্তকারী ঝন্টু পরীক্ষা হল থেকে বের হলে তাকে নিয়ে প্রিন্সিপালের কাছে যেতে চাইলে ঝন্টু রাজি না হলে উভয়পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কি ও হাতাহাতি হয়। কয়েকজন উত্তেজিত ছাত্র ঝন্টুকে কিছু উত্তম-মধ্যম দেয়।

কিন্তু ঐ দিনই রাতে জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার সাথে জড়িত না হওয়া সত্বেও টিটিসি ক্যাম্পাসের ফটকের পাশে থাকা জুরাছড়ি উপজেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি পরিচয়ধারী জ্ঞানমিত্র চাকমা বাদী হয়ে টিটিসির পরীক্ষার্থী ছাত্র ও পিসিপির নেতৃস্থানীয় সদস্য ৭ জনসহ আরও অজ্ঞাতনামা ১৪ জনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়। এমতাবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্য হয়ে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিগত ১২ জুলাই থেকে শুরু হওয়া চলমান পরীক্ষা ও নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম বর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা করে। বর্জনের কর্মসূচিতে সাড়া দিয়ে প্রথম দিনেই ৯ম শ্রেণির ৩১৯ জন ও ১০ম শ্রেণির ২২৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩ জন পাহাড়ীসহ মাত্র ৪৮ জন ছাত্র বাদে প্রায় সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে টিটিসিতে আসা থেকে বিরত থাকে।

এমনিতর অবস্থায় উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য গত ২৪ জুলাই টিটিসির প্রিন্সিপালের উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি ও ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও এতে অন্যান্যের মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ছাত্রলীগ মামলা প্রত্যাহারে রাজী হলে বর্জন কর্মসূচি প্রত্যাহার পূর্বক শ্রেণি কার্যক্রম ও আসন্ন ফরম-ফিল আপে অংশগ্রহণের জন্য সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলতে রাজী হন পিসিপি নেতৃবৃন্দ।

১৮টি জুম্ম পরিবার উচ্ছেদ করে সাজেকে বিজিবি জোন হেডকোয়ার্টার নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে হাজাছড়ায় (বাঘাইহাট) ১৮টি জুম্ম পরিবারের মোট ৫৪ একর জায়গা হতে উচ্ছেদ করে বিজিবি জোন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। ১৮টি পরিবার সকলেই জুমচাষী ও ফরেস্ট ভিলেজার। এর আগে তারা প্লান্টেশনে জুমচাষ করত। প্লান্টেশন বন্ধ হয়ে গেলে উক্ত জায়গায় জুমচাষ ও বাগান-বাগিচা করে বর্তমানে জীবিকা নির্বাহ করছে। ৫৪ একর জায়গার উপর দীর্ঘ বৎসর যাবৎ বসত বাড়িসহ বিভিন্ন প্রকার বাগান-বাগিচা সৃজন করে স্ব স্ব দখলে আছে। জুলাই ২০১৭ এর প্রথম দিকে ক্যাম্পের বিজিবি কমান্ডার আজাছড়া গ্রামে উপস্থিত হয়ে ১৮টি পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ঘরবাড়ি ভেঙ্গে নিয়ে অন্যত্র চলে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। স্বেচ্ছায় চলে না গেলে জোর করে উচ্ছেদ করা হবে মর্মে তিনি শাসিয়ে চলে যান। উল্লেখ্য যে, ৪-৫ মাস আগে উক্ত ৫৪ একর জায়গার পার্শ্ববর্তী খালি জায়গায় বিজিবি টাম্বুল টাঙিয়ে অস্থায়ীভাবে একটি কাঁচা বাড়ি নির্মাণ করে অবস্থান করছে।

রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে খেলা দেখার সময় দু'জন জুম্ম ছাত্রের উপর সেটেলার বাঙালি ছাত্রদের হামলা

গত ২৮ জুলাই ২০১৭ আনুমানিক সকাল ১১:০০ ঘটিকার রাঙ্গামাটি মারি স্টেডিয়ামে ইন্টার স্কুল ফুটবল খেলা চলাকালে হঠাৎ করে ১৫-২০ বাঙালি ছেলে ভোকেশনালের ১০ম শ্রেণির ছাত্র রিম্পু চাকমা এবং লিটন চাকমার উপর লাঠি, ছুরি, হকিষ্টিক নিয়ে হামলা করে। এতে রিম্পু চাকমা মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং মাথার দুই জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়। এতে তিনি গ্যালারিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আর লিটন চাকমা হাতের বুড়ো আঙ্গুল এবং তর্জনীর মাঝখানে কেটে যায়। তাদের উদ্ধার করে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাটালে ভর্তি করা হয়।

জানা যায় যে, হামলাকারী ভোকেশনাল এবং রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা হচ্ছে- (১) মিজানুর রহমান, ৯ম শ্রেণি, ড্রেস

বাকী অংশ ৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

সংগঠন সংবাদ

খাগড়াছড়ি কলেজ ছাত্রী ইতি চাকমার খুনীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

গত ১ মার্চ ২০১৭ সকাল ১০:০০ টায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার উদ্যোগে কলেজের মূল ফটকের সামনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি আশিকা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা। এতে আরো বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন রাঙ্গামাটি জেলার ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক মিশু দে, পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সদস্য নান্টু চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ইতি চাকমা খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের একজন মেধাবী ছাত্রী। সুদূর দীঘিনালা উপজেলার শনহলা গ্রাম থেকে খাগড়াছড়ি সদরে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের আশায় চলে এসেছিলেন। কিন্তু মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীরা তাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তার বেঁচে থাকার স্বপ্নকে চুরমার করে দিলেন। এভাবে দেখা যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের স্কুল, কলেজ ও ঘরে-বাইরে কোন জায়গা আজ তাদের জন্য নিরাপদ নয়।

মানুষের শিক্ষার অধিকার একটি মৌলিক অধিকার। সেই শিক্ষা অর্জনের জন্য আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের অনিশ্চিত, অনিরাপদ জীবন নিয়ে বসবাস করতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে এসব ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে চলেছে। তাই অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়। অবিলম্বে খাগড়াছড়ি কলেজের মেধাবী ছাত্রী ইতি চাকমার হত্যাকারীদের যথাযথ তদন্তপূর্বক গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান বক্তারা।

চট্টগ্রামে পিসিপির উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ মার্চ ২০১৭ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল শাখার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি শীর্ষক আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি প্যারামেডিকেল শাখার সাধারণ সম্পাদক শুভ্র চাকমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি জুনি চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি বাবলু চাকমা (মণি), সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপম চাকমা, অর্থ সম্পাদক অমৃত লাল চাকমাসহ মহানগর, পলিটেকনিক ও প্যারামেডিকেল শাখার বিভিন্ন দপ্তরের নেতৃবৃন্দ। বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে শাসকগোষ্ঠী জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। পূর্বের মতন জুম্মদের নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে বাস্তুহারা করা হচ্ছে। অপহরণ, লুটপাট, ধর্ষণ, হত্যা ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে তারা সাম্প্রতিক ইতি হত্যা, রাঙ্গামাটির পাবলিক হেলথ এলাকায় দিন দুপুরে ধারালো অস্ত্র নিয়ে জুম্মদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলাসহ রাঙ্গামাটির ভোকেশনালে জুম্ম ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করার ঘটনা তুলে ধরেন। এছাড়াও শিক্ষার নামে, উন্নয়নের নামে, পর্যটনের নামে, নিরাপত্তার নাম দিয়ে প্রতিনিয়ত জুম্মদের ভূমি দখল করা হচ্ছে।

আজকে এই ছাত্র-যুব সমাজকে বুঝতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামে কারা অশান্তি সৃষ্টি করছে এবং কাদের ছত্র ছায়ায় তারা এসব করার সাহস পাচ্ছে। দীর্ঘ ১৯ বছর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন পাইনি। এটার জন্যে মূলত কারা সবচেয়ে বেশি বাধা প্রধান করছে সেটা ও এই ছাত্র-যুব সমাজকে বুঝতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করার জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে দীর্ঘ ২২ বছরের অধিক সশস্ত্র লড়াই সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু সরকার এই চুক্তি বাস্তবায়নের কথা মুখে স্বীকার করলেও বস্তুতপক্ষে আমরা এর উল্টো দেখতে পাই। তাই এখন জুম্ম ছাত্র-যুব সমাজকে বিকল্প পথের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রধান আলোচকের বক্তব্যে বাবলু চাকমা বলেন, আজকের এই ছাত্র সমাজকে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলে চলবে না, তাদেরকে চর্তুমূখী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। মানবতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি ও সমাজের কল্যাণে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অধিকার আদায়ে যুগে যুগে ছাত্র-যুব সমাজ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে এসেছে, সে ভূমিকাও জুম্ম জাতির ক্রান্তিকালে আজকের এই ছাত্র-যুব সমাজকে পালন করতে হবে। তিনি আরো বলেন পূর্বের ন্যায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও লড়াই সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসও তুলে ধরেন।

পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি টিটিসি শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ১৮ মার্চ ২০১৭ সকাল ১০:০০ টায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ টিটিসি শাখার ১৮তম কাউন্সিল ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন টিটিসি শাখার ৬ষ্ঠ কাউন্সিল টিটিসি অডিটোরিয়াম হল কক্ষে সম্পন্ন হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক অন্তিক চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক বাবুধন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার সভাপতি আশিকা চাকমা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি পলাশ চাকমা প্রমূখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ টিটিসি বিদায়ী কমিটির সভাপতি হৃদয় চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরৎ জ্যোতি চাকমা বলেন, আগে জুম্ম সমাজে শিক্ষার তেমন গুরুত্ব ছিল না। এম এন লারমা জুম্ম সমাজকে সচেতন করেন এবং সামন্ত সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে সকল জুম্মদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ভুলে গেলে তা অকৃতজ্ঞতার সমতুল্য হবে। কারিগরি শিক্ষাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পর কেউ দেশবিরোধী, নিজের জাতি বিরোধী কাজে লিপ্ত হবেন না । আমাদের পাহাড়ী উচ্চ শিক্ষিত অনেকে জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থি কাজ করে চলেছে। মৌলবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

পরে মিনা চাকমাকে সভাপতি, জুলি চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, ইতি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশন টিটিসি শাখা গঠন করা হয়। নব গঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সদস্য রুমী চাকমা।

দীপায়ন চাকমাকে সভাপতি, ইন্দ্র বিকাশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, সুমন্ত মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ টিটিসি শাখা ঘোষণা করা হয়। নব গঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি রিন্টু চাকমা।

জেএসএসকে জড়িত করে 'পাহাড়টুয়েন্টিফোর'-এ প্রকাশিত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ

গত ১৮ মার্চ ২০১৭ রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত অনলাইন দৈনিক 'পাহাড়টুয়েন্টিফোর' (Pahar24)-এ প্রকাশিত 'যৌথবাহিনীর অভিযানে শহরে তিন চাঁদাবাজ আটক' শিরোনামের সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। সংবাদটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'রাঙামাটি শহরের রাঙাপানি এলাকা থেকে শনিবার বিকাল সাড়ে চারটার দিকে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তিন চাঁদাবাজকে আটক করেছে,.'। এতে আরও উল্লেখ করা হয়, 'আটককৃতরা হলেন জেএসএস'র সহকারী পরিচালক (কালেক্টর) রোনেল চাকমা ওরফে তরু (৩২), সহকারী কালেক্টর জিকন তঞ্চঙ্গ্যা (২৮), সশস্ত্র গ্রুপের প্রশাসনিক সহকারী কালো বরুণ চাকমা ওরফে কালাইয়া (৩৮)।'

উক্ত সংবাদে উল্লিখিত ঘটনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, হীন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংবাদে উল্লিখিত আটককৃত ব্যক্তিগণ কেউ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য নয়। তাছাড়া জনসংহতি সমিতি বা জেএসএস এর'সহকারী পরিচালক (কালেক্টর)' বা 'সহকারী কালেক্টর' হিসেবে কোন সাংগঠনিক পদ বা দায়িত্ব যেমনি নেই, তেমনি 'সশস্ত্র গ্রুপের প্রশাসনিক সহকারী' হিসেবে কোন পদের অস্তিত্বও নেই।

জেএসএসকে জড়িত করে স্থানীয় অনলাইন নিউজ পোর্টালে প্রকাশিত ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ

গত ১৯ মার্চ ২০১৭ রাঙ্গামাটির অনলাইন দৈনিক chtnews24.com I chttoday.com-এ প্রকাশিত যথাক্রমে 'জেএসএস সামরিক শাখার থার্ড ইন কমান্ড ধন বিকাশ চাকমা ১২ লাখ টাকাসহ গ্রেফতার' ও 'চট্টগ্রামে র‍্যাবের অভিযান, জেএসএস সামরিক শাখার থার্ড কমান্ডার ১২ লাখ টাকাসহ আটক' শিরোনামের সংবাদ দুটির প্রতিবাদ জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

উভয় সংবাদেই উল্লেখ করা হয়েছে, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির (জেএসএস) সামরিক শাখার থার্ড ইন কমান্ড ধন বিকাশ চাকমা (৬০) ওরফে উমংকে তার দুই সহযোগীসহ আটক করেছে র‍্যাব।' এছাড়া উভয় সংবাদে র‍্যাবের বরাত দিয়ে প্রায় একই ভাষায় 'গ্রেফতারকৃতরা নিজেদের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখার সদস্য বলে স্বীকার করে এবং আটককৃত টাকা বান্দরবান থেকে জনসংহতি সমিতির নামে খুন, অপহরণ, গুমের ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজির মাধ্যমে আয় করা বলে স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদে উল্লিখিত ঘটনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ষড়যন্ত্রমূলক। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ধন বিকাশ চাকমাসহ গ্রেফতারকৃতরা কেউ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য নয়। এছাড়া গ্রেফতারকৃতদের পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখার সদস্য বলে উল্লেখ করা এবং খুন, অপহরণ, গুম ও চাঁদাবাজির সাথে জনসংহতি সমিতিকে জড়িত করার বিষয়টি সর্বৈব মিথ্যা ও বানোয়াট।

অপরদিকে, স্থানীয় গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে উভয় সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখার প্রধানের নাম লক্ষী প্রসাদ ওরফে রাজা, দ্বিতীয়

জনের নাম অসীম বাবু, তৃতীয় জনের নাম ধনবিকাশ চাকমা এবং চতুর্থ শীর্ষ নেতার নাম সত্যবীর দেওয়ান, তিনি জেএসএস'র বিচারক হিসাবে পরিচিত। কার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে জেএসএসে তিনি তা নির্ধারণ করেন। ইতোপুর্বে অস্ত্র মামলায় তার ১৭ বছরের জেল হয়েছিল। কিন্তু ২ বছর জেল খাটার পর বেরিয়ে ভারতে পালিয়ে যান।'

এখানে উল্লেখ্য যে, সত্যবীর দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার কোন প্রশ্নই উঠে না। অপরদিকে জরুরী অবস্থার সময় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হলেও জরুরী অবস্থার অব্যবহিত পরেই তিনি জামিনে মুক্তি পান। এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত তিনি তাঁর বাড়ি রাঙ্গামাটিতে অবস্থান করে জনসংহতি সমিতির পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যক্রমে তাঁর ভূমিকা পালন করে চলেছেন। অথচ সংবাদে ও গোয়েন্দা সূত্রে 'সত্যবীর দেওয়ান' '..জেল খাটার পর বেরিয়ে ভারতে পালিয়ে যান' এবং '..ভারতের ত্রিপুরায় অবস্থান করে বাংলাদেশে অপারেশন পরিচালনা করে।' বলে যে মিথ্যা, সাজানো ও কল্পনাপ্রসূত বক্তব্য দেওয়া হয়েছে তা একেবারে হাস্যকর ও দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ঘটনার সাথে জনসংহতি সমিতি ও এর সদস্যদেরকে জড়িত করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক এবং হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

শিজক কলেজের এইচএসএসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা
পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা গণমুখী ও বাস্তবমুখী হতে পারেনি-সন্তু লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থা গণমুখী ও বাস্তবমুখী হতে পারছে না। যার কারণে পাহাড়ের অসহায় মেহনতি মানুষের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। গত ২০ মার্চ ২০১৭ শিজক কলেজ মাঠে কলেজের এইচএসএসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।.

শিজক কলেজ অধ্যক্ষ সুভাষ দত্ত চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এইচএসএসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাঘাইছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বড়ঋষি চাকমা, শিজক কলেজের শিক্ষক মিজানুর রহমান, শিজকমুখ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জ্ঞানময় চাকমা, সার্বোয়াতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তুষার কান্তি চাকমা ও কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী অন্তর চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা আরো বলেন, শিজক কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে অত্রাঞ্চলের মানুষের শুধু উদ্যোগ নয়, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এটা খুবই প্রশংসনীয় মনে করি এই কলেজে যারা শিক্ষার্থী সমাজ রয়েছেন, শিজক কলেজ পরিচালনা দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক সমাজ এবং এখানকার অভিবাবক সমাজ সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষার অনুকুল পরিবেশকে অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে এই কলেজ থেকে চলে যাচ্ছেন আপনাদের মধ্যে থেকে অনেকেই পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর উচ্চ শিক্ষার আশায় আরো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবেন। আজকে আমাদের দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা আছে সেটা নি:সন্দেহে আমাদেরকে উৎসাহিত করতে পারে না। আমাদের দেশে শিক্ষাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা। বস্তুত: আমাদের জুম্ম ছাত্র সমাজকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করার দরকার যে শিক্ষা আমাদের দেশে এখনো গড়ে উঠতে পারেনি।আমাদের দেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা নিযুক্ত আছেন, যারা নীতি নির্ধারণ করেন তাদের সম্পর্কে যদি এই শিক্ষা ঘিরে বলা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে যথাযথ নীতি আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। আজকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বছরকে বছর ধরে পরীক্ষামূলক একটা ব্যবস্থা চলছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা হতে হবে গণমুখী ও বাস্তবমুখী। আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা হয় সেখানে শিক্ষার অর্জনের প্রক্রিয়াটা অপূর্ণতা থেকে যায়। যে শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে বা বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে সেই শিক্ষা যথাযথ হতে পারে না।

তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা জর্জরিত। শতশত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাজারো শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। এই অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। যারা শিক্ষক নিয়োগ করেন সেই কর্তৃপক্ষ দুর্নীতি মধ্য দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে না পারলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবস্থা ও মুখ থুবরে পড়ে থাকবে। এই অব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষা এগিয়ে যেতে পারে না। এখানে শিক্ষকের অভাব-শিক্ষাক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি ও নানাবিধ সমস্যা রয়েছে সেগুলো দুর করতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে কলেজের শিক্ষা কিভাবে ভাল হতে পারে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা যদি এভাবে থাকে তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে কয়জন অংশগ্রহণকরতে পারবে। আজকে রাজনৈতিক কারণে অথবা বিশেষ উন্নয়নের কারণে যদি এধরণের শিক্ষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকে তাহলে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারবো না, সেটাই নির্মম বাস্তবতা। আমাদের শিক্ষার্থী বন্ধুদের এসবগুলো অনুভব করতে হবে।

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাঙ্গামাটি মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে সরকারের কাছে আমরা দাবী করেছিলাম প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা এবং যে সমস্ত সরকারী কলেজ আছে সেগুলো যাতে আরো যথাযথভাবে পরিচালিত হতে পারে সেই ধরণের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের নিকট বারেবারে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু সরকার সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তারা রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার গণবিরোধী ভূমিকা নিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে শিক্ষাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। অন্যদিকে এই পার্বত্যাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে আমরা দাবী করেছিলাম একটা প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট। এসকল প্রাথমিক বিষয়গুলো আগে গুরুত্ব না দিয়ে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা যথাযথ নয় বলে জুম্ম জনগণ মনে করে। শাসকগোষ্ঠীর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন কার্যকর করছে না। আঞ্চলিক পরিষদ এখনো তার দায়িত্ব ক্ষমতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আঞ্চলিক পরিষদ কঠিন এক বাস্তবতার মুখোমুখী। পার্বত্যাঞ্চলে সামগ্রিক জীবনধারায় এই পরিষদ ভূমিকা রাখতে পারছে না। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নে সরকারকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সম্মেলন
সরকার গণতান্ত্রিক ও গণমুখী হলে বাঙালি হিন্দুরা ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতো না - সন্তু লারমা

সরকার গণতান্ত্রিক ও গণমুখী হলে আজকে বাঙালি হিন্দুরা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতো না। পটুয়াখালির রাখাইন আদিবাসীরা বার্মায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশ যদি বাঙালিদের হয় তাহলে বাঙালি হিন্দুরা কেন নির্যাতিত হয়। ১৯ বছরেও কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ধারা গুলো বাস্তবায়ন হয় না। আমরা সংবিধানকে প্রগতিশীল বলে দাবি করতে পারি না। সরকার নিজেকে গণতান্ত্রিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ দাবি করলেও রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। তাহালে আমাদের অবস্থান কোথায় গেল, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রামের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধন গিয়ে এসব কথা বলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা সন্তু লারমা।

গত ২৪ মার্চ ২০১৭ শুক্রবার,বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর ও দক্ষিণ জেলার ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সকালে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য প্রদান করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান সন্তু লারমা। এরপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি। উদ্বোধনের পর একটি বিশাল র‍্যালি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। বিকাল ৩ ঘটিকায় মুসলিম হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মানবাধিকারকর্মী এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত। সম্মেলনের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম চট্টগ্রামের সভাপতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রামের সমন্বয়কারী শরৎ জ্যোতি চাকমা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক সন্তু লারমা বলেন, ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হলে মুসলিমদের নিয়ে পাকিস্তান হয়েছে কিন্তু হিন্দুদের নিয়ে কি হিন্দুস্তান হয়েছে? এই দেশ থেকে বৃটিশরা কি এমনিতে চলে গেছে? সব ক্ষেত্রে দেখা যায় শুভংকরের ফাঁকি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বহুজাতি বহু ভাষাভাষী মানুষের দেশ। দেশ স্বাধীনের ৪৬ বছরে কি গণমুখী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? দেশে সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। জাতিগত শোষণ নিপীড়ন মেহনতি মানুষের উপর শোষণ নিপীড়ন করা হচ্ছে। ১৯৮৮ সালে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নামে একটি সংগঠনের জন্ম লাভ করেছে। সরকারের শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলবো আবার নিজেকে সরকারি দলে অন্তর্ভুক্ত রাখবো তাতে করে অধিকার আদায় করা যায় না। ক্ষমতাসীন দলে থাকবো, নির্যাতিত হবো, এবং প্রতিবাদ করবো না তা তো স্ববিরোধী। সন্তু লারমা বলেন, সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায় করতে হলে নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন। বর্তমান ১৪ দলীয় সরকার গণতান্ত্রিক হলে জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণ নেই কেন? নিজেদের অধিকার নিজেদেরই আদায় করে নিতে হবে। অন্যের দলে থেকে অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। মরহুম জননেতা মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাষানি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে দেওয়া পরামর্শ ঐক্য পরিষদের নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে সন্তু লারমা বলেন, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংক্যালঘুরা নিজেদের একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে না পারলে অন্য কেউ তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেনা। জীবিত অবস্থায় মৃত হিসেবে বেঁচে থাকা যায় না। গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদি দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধুমাত্র মিছিল মিটিং করে সংগ্রাম সফল হবেনা।

ঢাবি ও চবি'র জুম্ম শিক্ষার্থীদের মিলনমেলা: বিভিন্ন খেলাধুলা ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ মার্চ ২০১৭ সকাল ১০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে দিনব্যাপী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া আদিবাসী জুম্ম শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এক

মিলনমেলা ও গেট টুগেদার অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই মিলনমেলা ও গেট টুগেদার অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় ২০-টুয়েন্টি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের উদ্বোধন করেন পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি ও পিসিপি কেন্দ্রীয় নেতা ক্যারিংটন চাকমা। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন পিসিপি ঢাবি সভাপতি নিপন ত্রিপুরা, চবি শাখার সহ-সভাপতি রিময় চাকমা, সাধারণ সম্পাদক মনস্বী চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক ভূবন তঞ্চঙ্গ্যা প্রমূখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ছাত্রনেতারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন ন্যায্য আন্দোলনে সর্বদা অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম শিক্ষার্থীরা। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শত শত জুম্ম শিক্ষার্থী প্রতিবছর এই দুটি ক্যাম্পাসে আসে উচ্চ শিক্ষার জন্য। আজকে এই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত জুম্ম শিক্ষার্থীদের মধ্যকার মিলনমেলা ও গেট টুগেদার নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক একটি উদ্যোগ। অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম ক্রিকেট একাদশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম ক্রিকেট একাদশকে ৪ রানে পরাজিত করে।

পরে দুপুরবেলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব শান্তি প্যাগোডার ডাইনিং কক্ষে চলে এক প্রীতিভোজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জুম্ম শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন এমন খবরে কয়েকদিন ধরেই উৎসব উৎসব আমেজ ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম শিক্ষার্থীদের মধ্যে। ঢাবি শিক্ষার্থীদের আপ্যায়নের কোন ত্রুটিই তারা রাখেননি, উপরন্তু আপ্যায়নের জন্য প্রীতি ভোজে প্রচেষ্টা ছিল পাহাড়ের স্বতন্ত্র খাদ্যাভ্যাসের স্বাদ একটু হলেও ঢাবি শিক্ষার্থীদের মুখে তুলে দেওয়া। তাই চবি শিক্ষার্থীরা গত কয়েকদিন ধরেই তাদের ক্যাম্পাসের আশেপাশে বনে-বাদারে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করতে থাকে শামুক, তারা প্রভৃতি। তারা গুদেয়ে তরকারি, শামুক তরকারি এবং মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করা হয় ঢাবি জুম্ম শিক্ষার্থীদের। আন্তরিকতাপূর্ণ এই প্রীতিভোজ সম্পর্কে ঢাবি জুম্ম শিক্ষার্থী মহেন্দ্র ত্রিপুরা বলেন, "এককথায়- অনবদ্য। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রিয় চবি জুম্ম শিক্ষার্থীবৃন্দ" ।

দুপুর ৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হয় ঢাবি ও চবিতে বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের মধ্যে এক প্রীতি রশি টানাটানি খেলা। রশি টানাটানি খেলায়ও জয় লাভ করে চবি টিম।

পরে বিকেল ৪টায় অনুষ্ঠিত হয় লীজেন্ডারি ঢাবি জুম্ম একাদশ বনাম এভারগ্রীণ ইলেভেন অব চবি একাদশের মধ্যে এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আনন্দ বিকাশ চাকমা। পরে বিকেল ৫.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত জুম্ম শিক্ষার্থীদের পরিচিতি সভা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। গান করেন চবি শিক্ষার্থী রিময় চাকমা ও পূর্ণিমা চাকমা, ঢাবি শিক্ষার্থী জয়শ্রী চাকমা প্রমুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম শিক্ষার্থীদের যৌথ প্রয়াস এই মিলনমেলা। জুম্ম শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের সেতুবন্ধ রচনা ও সংহতি নির্মাণের এমন বড় উদ্যোগ এটিই প্রথম।

চবিতে কাউখালী কলমপতি গণহত্যা স্মরণে আলোচনা সভা

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কর্তৃক গত ২৫ মার্চ ২০১৭, বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় কাউখালীর কলমপতিতে সংঘটিত গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে পিসিপি চবি শাখার দপ্তর প্রাঙ্গণে এক স্মরণসভা এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক মনস্বী চাকমার সঞ্চালনায় উক্ত শোকস্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিসিপি চবি শাখার সহ-সভাপতি রিময় চাকমা। এতে শোকপ্রস্তাবসহ স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র চবি শাখার সদস্য সুপন চাকমা, বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র চবি সদস্য সুগত চাকমা, ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন পিসিপি চবি শাখার অর্থ সম্পাদক হিমেল চাকমা।

বক্তারা বলেন, স্বাধীনতার পর নজিরবিহীন উক্ত গণহত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী জুম্ম আদিবাসী জনগণকে নিশ্চিন্ন করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ কাউখালী উপজেলার কলমপতিতে ৩০০ অধিক আদিবাসী জুম্মকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। এই গণহত্যার বিচার হয়নি। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার বিচারের দাবি জানান এবং সরকারকে অবিলম্বে এসব গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান। মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শোকসভা সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

রাঙ্গামাটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে পিসিপি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কাউন্সিল সম্পন্ন

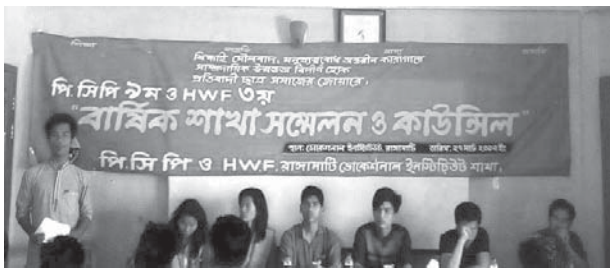

গত ২৭ মার্চ ২০১৭ সকাল ১০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ভোকেশনাল শাখার ৮তম কাউন্সিল এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৩য় কাউন্সিল সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য পুলক চাকমা, বক্তব্য রাখেন পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার অর্থ সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি চাকমা, রাঙ্গামাটি কলেজের সহ-সাধারণ সম্পাদক জগদীশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার সভানেত্রী আশিকা চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলক চাকমা বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজ মৌলবাদ প্রবেশ করেছে। ছাত্র ছাত্রীরা সঠিক সমাজ উন্নয়ন মূলক শিক্ষা পাচ্ছে না। শিক্ষাকে ভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা আজ পাওয়া যাচ্ছে না। পাঠ্য বইয়ে মৌলবাদ প্রবেশ করেছে। হেফাজতে ইসলামের দাবি মোতাবেক পাঠ্য বই ছাপানো হয়েছে। যা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সামিল। পাঠ্য বইয়ে আদিবাসীদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে যা আমাদের পরিচয়কে বিকৃত করেছে। তাই এসব অপকর্মকে ধ্বংস করার জন্য ছাত্র সমাজকে আন্দোলন করতে হবে।

পরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ভোকেশনাল শাখার নতুন কমিটি এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়।

পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ২৮ মার্চ ২০১৭, বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় "শেকড়ের টানে ঐক্যের সোপানে, মোরা এক হই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে" এ স্লোগানকে সামনে রেখে পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার ১৯তম সম্মেলন ও কাউন্সিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিস কনফারেন্স রুমে সম্পন্ন হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি অনন্ত বিকাশ ধামাই, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপম চাকমা, আদিবাসী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিভূতি ভূষণ মাহাতো, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এ এম শাকিল, আসারু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি প্রদীপ হেমব্রম প্রমুখ।

সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সদস্য মংক্যাওয়েন রাখাইন, সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন অর্থ সম্পাদক রাসেল চাকমা। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আসারু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি প্রদীপ হেমব্রম বলেন, বাংলাদেশের আদিবাসীরা নিপীড়িত, নির্যাতিত। কোন সরকারই আদিবাসীদের স্বীকৃতি প্রদান করেনি।

চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপম চাকমা বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এক লড়াই সংগ্রামের নাম। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মানে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়ানোর নাম। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি এ এম শাকিল বলেন, পাহাড়ের নির্যাতন নিপীড়নের ঘটনাগুলো দেশের সাধারণ মানুষকে জানতে দেওয়া হয় না। তাই সকল নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাহাড় এবং সমতলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিভূতি ভূষণ মাহাতো বলেন, বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আদিবাসীদের বিভক্ত করা হচ্ছে। তাই ছাত্রদের আরো রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হতে হবে। পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি অনন্ত বিকাশ ধামাই বলেন, যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ স্বশাসন বজায় রেখেছিল। কিন্তু, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামকে ইসলামীকরণের মধ্য দিয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্বকে চিরতরে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপনিবেশিক কায়দায় শাসন শোষণ চালাচ্ছে। বহিরাগত সেটেলার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, সেনা শাসন জারি রেখে, উন্নয়নের নামে, পর্যটনের নামে, নিরাপত্তার নামে ভূমি বেদখল করে জুম্মদের চিরায়ত ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সরকার পার্বত্য চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন না করে উল্টো চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কাজ বাস্তবায়ন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের এ করুণ বাস্তবতাকে অন্তরের গভীরে গিয়ে জুম্ম ছাত্রদের উপলব্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র গতানুগতিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জুম্ম ছাত্রদের জুম্ম জাতীয় লড়াই সংগ্রামের ইতিহাসকে জানতে হবে এবং সর্বোপরি বিশ্বজ্ঞানে দীক্ষিত হতে হবে।

পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপেন চাকমার সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মনি শংকর চাকমা।পরে দীপেন চাকমাকে সভাপতি, দীপন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, রাসেল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট রাজশাহী মহানগর শাখা কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব গঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি অনন্ত বিকাশ ধামাই।

পিসিপি ঢাবি শাখার ৩য় বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন, বাসাবো ও মিরপুর শাখা গঠন

"সময়ের আহ্বানে আদর্শিক শক্তিতে সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ করি সকল আগ্রাসন" এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে গত ৩০ মার্চ ২০১৭ বিকাল ৩ ঘটিকায় মুনীর চৌধুরী অডিটোরিয়ামে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও ৩য়তম কাউন্সিল সম্পন্ন হয়। এসময়ে পিসিপি বাসাবো থানা শাখা এবং পিসিপি মিরপুর শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক অমর শান্তি চাকমার সঞ্চালনায় এবং সভাপতি নিপন ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সভাপতি বাচ্চু চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংসদের সভাপতি তুহিন কান্তি দাশ, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি চন্দ্রা ত্রিপুরা প্রমুখ।

আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য সুজিক চাকমা, পিসিপি বাসাবো শাখার সভাপতি শুভদেব চাকমা। সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন পিসিপি ঢাবি শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক লিপেন চাকমা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শ্রীমতি চন্দ্রা ত্রিপুরা বলেন, লড়াই সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আজকে যারা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আছে তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিকড়ের টানে ফিরে যেতে হবে। জুম্ম জাতির ক্রান্তিলগ্নে এই ছাত্রদেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশপাশি আদর্শিক রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি সুমন মারমা বলেন, শাসকগোষ্ঠী জাতিগত নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এদেশ থেকে আদিবাসীদের অস্তিত্বকে চিরতরে ধ্বংস করার পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান ছাত্র সমাজকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সঠিক ইতিহাস জেনে তার আলোকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে শাসকগোষ্ঠীর সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অব্যাহত লড়াই সংগ্রাম জোরদার করতে হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি তুহিন কান্তি দাশ বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপট আদিবাসীদের অস্তিত্বকে হুমকিতে ফেলে দিচ্ছে। যে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল চেতনায় মহান মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সে চেতনা আজ ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি বাচ্চু চাকমা বলেন, আজকের এ সম্মেলন এমন সময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন সারাদেশে দুর্নীতি, অরাজকতা, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানো হচ্ছে। শিক্ষার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সব সময় অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আদর্শগত নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসা স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, পিসিপির সুদীর্ঘ পথচলায় নেতাকর্মীদের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সংগ্রাম করতে হয়েছে। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে এই পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ আজকে এগিয়ে যেতে পারছে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিপীড়িত শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুগে যুগে তরুণ ছাত্ররাই নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। তিনি ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, ছাত্রদের বৈপ্লবিক আদর্শে আদর্শিত হয়ে সাম্যবাদী দর্শনকে ধারণ করে জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যেতে হবে।

সম্মেলন শেষে অমর শান্তি চাকমাকে সভাপতি, অরুন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং রিবেং দেওয়ানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নব গঠিত কমিটি ঘোষণা করা হয়।

শুভদেব চাকমাকে সভাপতি, লক্ষ্মীরঞ্জন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, উমংহা মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বাসাবো শাখা এবং তুর্বাণ রায়কে সভাপতি, দিগন্ত চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক, রিপরিপ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ মিরপুর শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

পিসিপি ইউএসটিসি শাখার ১ম সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ১ এপ্রিল ২০১৭, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার অধীনস্থ পিসিপি ইউএসটিসি শাখার ১ম সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়। পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমার সঞ্চালনায় এবং সহ-সভাপতি মিহির চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপম চাকমা।এতে স্বাগত বক্তব্যে রাখেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শুভ চাকমা।

বক্তারা বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ন্যায়ের কথা বলে। অন্যায়ের বিরুদ্ধেপ্রতিবাদ করে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জন্ম লগ্ন থেকে নিপীড়ন, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আপোসহীনভাবে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। নব গঠিত ইউএসটিসিশাখাও আগামী দিনের লড়াই সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

পরে শুভ চাকমাকে সভাপতি, মংজয় মারমাকে সাধারণ সম্পাদক করে পিসিপি ইউএসটিসি শাখারনতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব গঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুমন মারমা।

রমেল হত্যার প্রতিবাদে ও সেনাশাসন প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাবিতে জুম্ম শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল

গত ২২ এপ্রিল ২০১৭, রাত ১০:০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল প্রকার অবৈধ সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারসহ অঘোষিত অবৈধ সেনাশাসন বন্ধ করা, পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল প্রকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের যথাযথ তদন্ত করত দোষীদের শাস্তি প্রদান এবং সম্প্রতি নানিয়ারচরে সেনা হেফাজতে এইচএসসি পরীক্ষার্থী রমেল চাকমা হত্যার প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে এক ঝটিকা বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

অরুন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় এবং নৈশিমং মারমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ধুদুক দেওয়ান, এডিট

দেওয়ান, নিপন ত্রিপুরা। এছাড়া পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সুলভ চাকমা। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণের নামে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অবৈধ অঘোষিত সেনাশাসন বন্ধসহ পার্বত্য চুক্তির আলোকে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবি জানান। এছাড়াও সম্প্রতি নানিয়ারচরে সেনাবাহিনীর নির্যাতনে মৃত্যু হওয়া এইচএসসি পরিক্ষার্থী রমেল চাকমার হত্যার সুষ্ঠু বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে জড়িত সেনাসদস্যদের শাস্তির দাবি জানান।

সুলভ চাকমা বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আমরা এখানে পড়ালেখা করতে আসছি, রাতের আধারে ঝটিকা জঙ্গী মিছিল করতে আসিনি। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক নিষ্ঠুর বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আমাদেরকে রাস্তাই নামতে হচ্ছে"। তিনি আরো বলেন, "আমরা সংখ্যায় কম বলে দুর্বল নই। আজ সারাদেশে আদিবাসীদের-সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালানো হচ্ছে। গাইবান্ধায় ঘর পুড়ে, গোবিন্দগঞ্জে ঘর পুড়ে। কাউকেই আমরা পাশে পাইনা। তারপরেও আমরা মাথা নত করব না। আমাদের ধমনিতে বহমান আছে এম এন লারমার রক্ত।"

ঢাবি জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের যেসব শিক্ষার্থী জগন্নাথ হলে অবস্থান করে সবাই হল এর সন্তোষ চন্দ্র ভবনের সামনে রাত ৯:০০ ঘটিকার সময় জড়ো হয়। ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে জুম্মদের প্রতিবাদী ধ্বনি "উজো উজো" স্লোগান নিয়ে শুরু হয় বিক্ষোভ মিছিল। মিছিলটি সন্তোষ চন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে পুরো হল প্রদক্ষিণ করে আবারো একই জায়গায় গিয়ে শেষ হয়।

রমেল চাকমা হত্যার প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্র জোটের বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ

এইচএসসি পরীক্ষার্থী রমেল চাকমাকে সেনাবাহিনী কর্তৃক পৈশাচিক নির্যাতন করে হত্যা ও এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সেনাসদস্যদের বিচার এবং পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবিতে গত ২৩ এপ্রিল ২০১৭, সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে প্রগতিশীল ছাত্র জোট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাবেশে ছাত্র জোটের সমন্বয়ক জিলানী শুভ'র সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সুলভ চাকমা। তিনি বলেন, "সেনাবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলে নির্যাতন হত্যা, গুম, ধর্ষণ একদিনের না। সেনাবাহিনী কর্তৃক গুম, খুন, ধর্ষণের বিচারহীনতার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় আজ রমেল চাকমা খুন হলো।"

সমাবেশে ছাত্র জোটের নেতা ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শ্যামল বর্মণ বলেন, "পার্বত্য চট্টগ্রাম যেহেতু বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন কোন এলাকা না এবং বাংলাদেশেও কোন সেনাশাসন চলছে না, তাহলে পার্বত্য অঞ্চলে কেন সেনাবাহিনী, কেন সেনাশাসন?" অবিলম্বে তিনি পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করার দাবি জানান। সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে জিলানী শুভ বলেন, "রমেল চাকমা হত্যায় জড়িত সেনাবাহিনীর মেজর তানভির ও অন্যান্য জড়িত সদস্যদেরকে অবিলম্বে চাকুরীচ্যুত করে বিচারের কাঠগড়ায় আনতে হবে।"

মানবজমিন ও পার্বত্যনিউজডটকম-এ বিদেশি সশস্ত্র গ্রুপের সঙ্গে জেএসএসের সমঝোতা শীর্ষক সংবাদের প্রতিবাদ ও নিন্দা

২৭ এপ্রিলের দৈনিক মানবজমিন-এর "বিদেশি সশস্ত্র গ্রুপের সঙ্গে জেএসএস ও ইউপিডিএফ-এর সমঝোতা" শীর্ষক সংবাদের প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির দৃষ্টি গোচর হয়েছে। উক্ত সংবাদে বলা হয়েছে যে, "তিন পার্বত্য জেলার দুর্গম পাহাড়ে তৎপরতা শুরু করেছে ৭ সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন। ....এসব সশস্ত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে জনসংহতি সমিতি ও ইউপিডিএফ'র সশস্ত্র গ্রুপের সদস্যরা। অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবসা নিয়ে এরইমধ্যে বিদেশি সশস্ত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করেছে ওই দুই সংগঠন।" উক্ত সংবাদ অনলাইন নিউজ পোর্টাল "parbattanews.com"-GI ২৭ এপ্রিল হুবহু প্রচার করা হয়েছে।

জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কল্পনাপ্রসূত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে দেশে-বিদেশে জনমতকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা এবং জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণকে অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপন করে ফ্যাসীবাদী কায়দায় দমন-পীড়ন ও জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের হীনউদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণির বিশেষ মহলের যোগসাজশে এ ধরনের ভিত্তিহীন প্রচারনা চালানো হচ্ছে বলে জনসংহতি সমিতি মনে করে।

দৈনিক মানবজমিন ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল "parbattanews.com"-এ এ ধরনের ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত সংবাদ প্রচার করায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং এ সংবাদ প্রত্যাহার ও এ ধরনের অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য দৈনিক মানবজমিন ও parbattanews.com-কে আহ্বান করছে।

পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখার ১৯তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

"চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থি সকল প্রতিক্রিয়াশীল

কার্যক্রম প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন সুদৃঢ় করুন" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ৩ মে ২০১৭, সকাল ১০:০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জুরাছড়ি থানা শাখার ১৯তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ত্রিজিনাদ চাকমা। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জুরাছড়ি থানা কমিটির সভাপতি মায়াচান চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জুয়েল চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি জুরাছড়ি থানা কমিটির সভাপতি আল্পনা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি জুরাছড়ি থানা কমিটির সভাপতি সুজিত চাকমা বারিজে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি আশিকা চাকমা প্রমূখ।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে গনতন্ত্রের নামে প্রকাশ্যে সামরিক শাসন চলছে। বাংলাদেশের সংবিধান মতে যে কেউ সংগঠন ও সমাবেশ করার অধিকার রাখে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ আজ সেনা শাসনের কারণে সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত। যার ফলশ্রুতিতে আমাদেরকে আজ সেনাবাহিনীর প্রহরায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জুরাছড়ি থানা শাখার কর্মসূচী পালন করতে হচ্ছে এবং আমরা লক্ষ্য করতে পারছি তাদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে একটি ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পাঁয়তারা চলছে যা গণবিরোধী এবং গণতন্ত্র পরিপন্থি।

বক্তারা আরো বলেন রমেল চাকমা একজন এইচএসসি পরিক্ষার্থী। তাকে বিনা কারনে সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে অমানবিক নির্যাতন করে মেরে ফেলে। মৃত্যুর পর তার লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর না করে সেনাবাহিনী পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় পার্বত্য চট্টগামের মানবাধিকার পরিস্থিতি কি পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া রমেলের এই অপমৃত্যু পৃথক কোন ঘটনা নয়। রমেলের মতো আরো অনেক রমেল পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে নির্যাতিত হচ্ছে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে এবং অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী বানানোর পাঁয়তারা চলছে।

পরে বিশ্বজিৎ চাকমাকে সভাপতি, সুরেশ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জুরাছড়ি থানা শাখা ঘোষণা করা হয় এবং মিনাক্ষী চাকমাকে আহ্বায়ক ও লিমা চাকমাকে সদস্য সচিব করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশন জুরাছড়ি থানা শাখার একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

লংগদু গণহত্যা স্মরণে চবিতে আলোচনা সভা

১৯৮৯ সালের ৪ মে লংগদুতে সংঘটিত গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও ২নং গেইট শাখার উদ্যাগে গত ৪ মে ২০১৭ বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এসআলম কটেজ দপ্তরে শোক সভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়।

উক্ত সভায় শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ২নং গেইট শাখার সহ- সভাপতি জনক তঞ্চঙ্গ্যা। চ.বি শাখার অর্থ সম্পাদক হিমেল চাকমার সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন চ.বি শাখার তথ্য প্রচার সম্পাদক নিজ্ঞ চাকমা। এছাড়া ২নং গেইট শাখার দপ্তর সম্পাদক সুপন চাকমা, সিনিয়র সদস্য প্রীতম রাভা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, ১৯৮৯ সালের ৪ মে লংগদুর গণহত্যাটি গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করে প্রকাশ্যে আনা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে আপনা আপনিই প্রকাশ পেয়েছে এই গণহত্যার নৃশংস ইতিহাস। তাই সত্যকে লুকিয়ে ধামাচাপা দেওয়া যায় না। শোক সভা শেষে মোমবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আওয়ামীলীগে যোগ দেয়ার ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ এমপি উষাতন তালুকদার

১৩ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের সাথে উষাতন তালুকদারও আওয়ামীলীগে যোগ দিয়েছেন বলে কালের কণ্ঠ, বিডিনিউজ২৪.কম, সিএইচটিটাইমস২৪.কম সহ বিভিন্ন অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও জাতীয় দৈনিকে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সর্বৈব মিথ্যা ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক বলে উষাতন তালুকদার জানিয়েছেন।

৪ মে ২০১৭ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানান, তাঁর রাজনৈতিক ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন করতে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব সম্পর্কে জনমতকে বিভ্রান্ত করতেই তাঁর সাথে কোনরূপ যোগাযোগ না করে এসব অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও জাতীয় দৈনিক কর্তৃক একতরফাভাবে এ ধরনের মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সংবাদ প্রকাশে তিনি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন এবং এই সংবাদ অচিরেই প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

লংগদু সাম্প্রদায়িক হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে আদিবাসী ছাত্র-জনতা ও নাগরিক সমাজের বিক্ষোভ

গত ২ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলা সদরের তিনটিলা এবং পার্শ্ববর্তী মানিকজোড়ছড়া ও বাত্যা পাড়ায় সেনা-পুলিশের ছত্রছায়ায় ক্ষমতাসীন স্থানীয় আওয়ামীলীগ-যুবলীগের নেতৃত্বে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটসহ সংঘবদ্ধ সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। লংগদুতে এই সাম্প্রদায়িক হামলায় লংগদু সদরের তিনটিলা এলাকায় ১১২টি ঘরাবাড়ি, মানিকজোড়ছড়ায় ৮১টি ঘরবাড়ি, বাত্যা পাড়ায় ২৪টি ঘরাবাড়ি এবং সোনাই গ্রামে ১টিসহ সর্বমোট ২১৮টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মিভূত এবং আরো ৮৮টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনটিলা এলাকায় গুণমালা চাকমা নামে ৭৫ বছরের এক অশীতিপর বৃদ্ধ পালিয়ে যেতে না পারার কারণে ঘরের

মধ্যে আগুনে পুড়ে মারা গেছে এবং হামলাকারীদের মারধরের শিকার হন তিন জুম্ম গ্রামবাসী। উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও দেশের নাগরিক সমাজ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকাঃ গত ২ জুন ২০১৭ লংগদু অগ্নিসংযোগ ও পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখা। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক অমরশান্তি চাকমার সঞ্চালনায় এবং জ্ঞানজ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অনন্যা চাকমা, রুনি চাকমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য জিনেট চাকমা, পিসিপি ঢাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক অরুন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, হলাচন্দ্র ত্রিপুরা, পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার দপ্তর সম্পাদক নিশৈ মং মারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সুলভ চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবাহিনীর প্রত্যক্ষ মদদে পাহাড়ীদের উপর পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এযাবৎকাল পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনের কোন ঘটনারই সুষ্ঠু বিচার না হওয়ায় আজো পাহাড়ীদের ঘরছাড়া হতে হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হতে হচ্ছে, ভূমি থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে। বক্তারা আরো বলেন, ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি যে, লংগদুতে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। অথচ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে ১৪৪ ধারা জারি থাকা অবস্থাতেই- তিনটিলা, বাত্যেপাড়া, মানিকজোড়ছড়া প্রভৃতি জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামসমূহে জুম্মদের ঘর-বাড়িতে লুঠপাঠ, হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বিক্ষোভ মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে পুরো ক্যাম্পাস এলাকা প্রদক্ষিণ করে শাহবাগে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানেই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৪ জুন ২০১৭ সকাল ১১ টায় দেশের সচেতন নাগরিক সমাজের উদ্যোগে ঢাকার শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে পাহাড়ী গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ এর প্রতিবাদে নাগরিক প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত নাগরিক প্রতিবাদ সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জোবাইদা নাসরিন কণার সঞ্চালনায় এবং বিশিষ্ট কলামিস্ট ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সদস্য উষাতন তালুকদার এমপি, সাবেক তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্য খুশী কবীর, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী, বিশিষ্ট নাট্যকার মামুনুর রশীদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবি মুহাম্মদ সামাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মেজবাহ কামাল, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রাণা দাশ গুপ্ত, মানবাধিকার কর্মী নুমান আহম্মদ খান, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদের প্রেসিডিয়াম সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন, যুবমৈত্রীর কেন্দ্রীয় সভাপতি সাব্বাহ আলী খান কলিন্স, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক দীপায়ন খীসা, নাগরিক উদ্যোগের প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন, জাস্টিস এন্ড পিস কমিশনের থিওফিল নকরেক, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জি এম জিলানী প্রমুখ। প্রতিবাদ সমাবেশে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য ও দাবীনামা পেশ করেন জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন। প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে টিএসসি গিয়ে শেষ হয়।

চট্টগ্রামঃ গত ৩ জুন ২০১৭ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় লংগদু হামলা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মিলন চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সদস্য অনুজ চাকমা, পিসিপি চট্টগ্রাম প্যারামেডিকেল শাখার সভাপতি জুনি চাকমা, পিসিপি ইউএসটিসি শাখার সাধারণ সম্পাদক মংজয় মারমা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মিটুল চাকমা (বিশাল), ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা সংসদের আহবায়ক সদস্য শাহরিয়ার রাফি, নারী নেত্রী বিজয় লক্ষী দেবী, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অনিল চাকমা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎজ্যোতি চাকমা, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগরের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম দক্ষিণ

জেলার সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড় এবং সভাপতিত্ব করেন পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি ছাত্রনেতা বাবলু চাকমা (মণি)।সমাবেশে বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস ভিন্ন ভাষাভাষি ১৪টি জুম্ম জনগোষ্ঠীর যারা নিজেদের স্বতন্ত্র স্বকীয়তা বজায় রেখে যুগ যুগ ধরে তাদের চিরায়ত ভূমিতে বসবাস করে আসছে। বৈচিত্র্যমন্ডিত সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অশান্তির বীজ সমতল থেকে বসতিপ্রদানকারী বাঙালি সম্প্রদায় এবং সেখানকার সেনাবাহিনী। প্রতিনিয়তই পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগোষ্ঠীর উপর সেটেলারের নগ্নথাবা আর সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের সাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে চলেছে। একের পর এক হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন আর অত্যাচারের জর্জরিত পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২ জুন লংগুদুতে পরিকল্পিতভাবে জুম্মদের গ্রামে হামলা চালানো হয়েছে। সমাবেশে বক্তারা অচিরেই সুষ্ঠ তদন্তের মধ্য দিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহীদ মিনার থেকে নন্দনকানন মোড় ঘুরে আবার শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ করা হয়।

এছাড়া ৮ জুন ২০১৭ বিকাল ৩ ঘটিকায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে রাঙ্গামাটির লংগদুতে সেনা-পুলিশের ছত্রছায়ায় আদিবাসী গ্রামে হামলা নির্যাতন হত্যা ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইঞ্জিনিয়ার পরিমল কান্তি চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানে বিভাগের অধ্যাপক ড. রাহমান নাসির উদ্দিন, এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের সহকারি অধ্যাপক ফারুক হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জুলন ধর, সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারি অধ্যাপক মহিউদ্দিন মাহিম ও বসুমিত্র চাকমা, ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক হিমু হামিদ, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের তপাস হোড়, বিজয় লক্ষী দেবী, শিক্ষানবীশ আইনজীবী লেলিন মারমা প্রমুখ।

সমাবেশের সঞ্চালনা করেন এ্যাড. প্রদীপ কুমার চৌধূরী। বক্তারা বলেন, পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়া লংগদুর মত বর্বরোচিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। পাহাড় থেকে সকল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করে সেনাশাসনের কবল থেকে পার্বত্য আদিবাসীদের মুক্ত করার আহবান জানান তারা।

বান্দরবান: গত ৪ জুন ২০১৭ সকাল ১০ ঘটিকায় বান্দরবান প্রেসক্লাবের সামনে লংগদুতে জুম্মদের বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার প্রতিবাদে সম্মিলিত আদিবাসী ছাত্র সমাজের উদ্যোগে এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বান্দরবান সদরের পুরাতন রাজবাড়ির মাঠ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে মানববন্ধনে মিলিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ম্রো স্টুডেন্ট ফোরামের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অংম্লাং ম্রো, ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামের সহ সভাপতি সুশীল ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের জেলা সভাপতি অনিক তঞ্চঙ্গ্যা, খুমি স্টুডেন্ট ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক রিউলং খুমি, মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিলের মহানগর সভাপতি লুমংপ্রু মারমা প্রমুখ।

এ সময়ে বক্তারা লংগদু উপজেলায় জুম্মদের বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সঠিক তালিকা প্রকাশ করে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান। বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে। তাই সরকারকে দ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।

জনসংহতি সমিতির স্মারকলিপি: গত ৭ জুন ২০১৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের অচিরেই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি দেয়া হয়। স্মারকলিপিতে লংগদুতে জুম্ম ঘরবাড়িতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত ব্যক্তি, নিরাপত্তা ও আইন-প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্যদের অচিরেই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা; অগ্নিসংযোগ ও সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ীদের জন্য বাড়ি নির্মাণ ও কমপক্ষে ৬ মাসের রেশনসহ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রদান করা এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উপজাতীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে লংগদু ঘটনার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ, দ্রুত ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বা রোডম্যাপ ঘোষণা করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক সকল অস্থায়ী ক্যাম্প ও অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার করা; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন প্রদান করা; এবং পার্বত্য

ভূমি কমিশনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, জনবল নিয়োগ, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় শাখা অফিস স্থাপন এবং কমিশনের কার্যপ্রণালী বিধিমালা চূড়ান্তকরণ পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন (২০১৬ সালে সংশোধনীসহ) মোতাবেক অচিরেই পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি দাবিনামা করা হয়।

অন্যান্য সংগঠনের প্রতিবাদ: গত ৪ জুন ২০১৭ জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উদ্যোগে রাজশাহী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ইত্যাদি জেলায় প্রতিবাদ জানানো হয়। ১৯টি সংগঠনের জোট 'মানবাধিকার ফোরাম বাংলাদেশ' এর উদ্যোগে গত ১৪ জুন ২০১৭ ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়। আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের উদ্যোগে ৮ জুন ২০১৭ জাতীয় সংসদের মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে। লংগদু ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গত ৩ জুন ২০১৭ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের বরাবর পাঠানো চিঠিতে এই ঘটনার সাথে জড়িতদের শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্থদের যথাযথ ক্ষতিপুরণের দাবি জানায়। গত ৭ জুলাই ২০১৭ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও কাপেং ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকার সেগুন বাগিচার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির গোল টেবিল মিলনায়তনে লংগদুতে পাহাড়ী গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ এর প্রতিবাদে ও ক্ষতিগ্রস্থদের দ্রুত পুনর্বাসনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ী শ্রমিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবস পালিত

গত ১২ জুন ২০১৭ বিকাল ৩ ঘটিকায় পাহাড়ী শ্রমিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদে এক মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ মহিলা ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সোনাবী চাকমার সভাপতিত্বে ও অনিল বিকাশ চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক নিতাই প্রসাদ ঘোষ, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুমন চাকমা, ঐক্য ন্যাপ চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক অজিত দাস, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মিটুল চাকমা বিশাল, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পূর্ণ বিকাশ চাকমা প্রমুখ। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার নেতৃবৃন্দসহ পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশে বক্তারা কল্পনা চাকমার অপহরণকারী লে: ফেরদৌসসহ তার সহযোগীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানান।

লংগদুতে অগ্নিসংযোগ ঘটনা পরিদর্শনে উষাতন তালুকদার এমপি

গত ১৪ জুন ২০১৭ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা পরিদর্শন করেছেন ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি উষাতন তালুকদার। পরিদর্শনকালে তিনি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত তিনটিলা, মানিকজোড়-ছড়া, বাত্যা পাড়া ও বড়াদম গ্রাম সরেজমিন পরিদর্শন এবং বাত্যা পাড়ায় নিহত মটর সাইকেল চালক নুরুল ইসলাম নয়নের পরিবারের সাথে দেখা করেন। তিনি লংগদু উপজেলা সম্মেলন কক্ষে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে এবং মানিকজোড়ছড়ায় সাম্প্রদায়িক হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত জুম্মদের সাথে পৃথক দু'টি মতবিনিময় সভায় মিলিত হন।

লংগদু উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পক্ষে সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো: তোহিদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় উপজেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে লংগদু উপজেলা সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ উষাতন তালুকদার এবং অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য জানে আলম ও লংগদু উপজেলা চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন।

উষাতন তালুকদার তাঁর বক্তব্যে তিনি মটর সাইকেল চালক নুরুল ইসলাম নয়নকে হত্যার ঘটনা যেমনি নিন্দনীয়, তেমনি নয়ন হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনাও অমানবিক ও ন্যাক্কারজনক। তিনি এ ঘটনার সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে নিরপেক্ষ তদন্ত পূর্বক পক্ষপাতিত্বহীনভাবে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসীরা পুলিশসহ প্রশাসনের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। তাদেরকে আস্থায় নিয়ে আসার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবসীদের জানমালের যথাযথ নিরাপত্তা প্রদানে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত জুম্ম গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ি নির্মাণসহ যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রদান এবং উক্ত পুনর্বাসনের কার্যক্রম টাস্কফোর্সের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার দাবি জানান।

বাকী অংশ ৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ক কলিকাতা সেমিনারে জেএসএস প্রতিনিধির যোগদান

গত ১-২ এপ্রিল ২০১৭ ভারতের কলিকাতা শহরে 'সেন্টার ফর রিসার্স ইন ইন্দো-বাংলা রিলেশন'-এর সহযোগিতায় 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বিরোধী প্রচারাভিযান' (ক্যাম্পেইন এগেইস্ট এট্রোসিটি অন মাইনরিটি ইন বাংলাদেশ) কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও সাংসদ উষাতন তালুকদার এবং সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি ফোরাম, বাংলাদেশ মাইনোরিটি রাইটস এলায়েন্স ইত্যাদি সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বাংলাদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন এবং এজন্য তারা বাংলাদেশ ও ভারত সরকার এবং মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করছেন এমন সংগঠনসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন।

১ এপ্রিল ২০১৭ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স অডিটরিয়ামের ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্ণর ড. তথাগত রায় এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দীলিপ ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নির্ধারিত বিষয়ে একাধিক অধিবেশনে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণ ও আদিবাসীদের নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হওয়ার নানা চিত্র ও বিবরণ তুলে ধরা হয়। সম্মেলনে ঊষাতন তালুকদার বলেন, বাংলাদেশে আদিবাসী জনগণ ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগণের অবস্থা মারাত্মকভাবে বিপন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ও সমতলের আদিবাসী জনগণ নানাভাবে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হওয়াসহ প্রতিনিয়ত উদ্বেগজনকভাবে ভূমি আগ্রাসনের শিকার হচ্ছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। পার্বত্য সমস্যা সমাধান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলে তিনি উল্লেখ করেন। অপরদিকে দেশে দিন দিন নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন এবং অর্পিত সম্পত্তি আইন কার্যকর হচ্ছে না বলে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের বরাবরে দ্রুত ও যথাযথভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ঘোষণাসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন।

সম্মেলনে ১৩ দফা সম্বলিত কলিকাতা ঘোষণা গ্রহণ করা হয়। ১৩ দফার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সকল ধারা যথাযথ বাস্তবায়ন এবং আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানানো হয়। এছাড়া ঘোষণায় সংখ্যালঘুদের জন্য মন্ত্রণালয় ও কমিশন স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট দাবি জানানো হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে– জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামে জেএসএস প্রতিনিধি

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৬তম অধিবেশনে 'বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা নির্যাতন বৃদ্ধি পেয়েছে' বলে মতামত ব্যক্ত করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি বিধায়ক চাকমা।

এজেন্ডা-৪ঃ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের [অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার] আলোকে স্থায়ী ফোরামের ৬টি এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে গত ২৭ এপ্রিল ২০১৭ প্রদত্ত বক্তব্যে বিধায়ক চাকমা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র বাস্তবায়িত না হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন জোরদার করা হয়েছে। অবৈধ গ্রেফতার ও আটক, অমানুষিক নির্যাতন, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণ, তল্লাসীর নামে জনসংহতি সমিতির অফিসসহ ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি বলেন, ২০১৬ সালে সাতজন জনপ্রতিনিধিসহ ১৫০ জন গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং একজন উপজেলা চেয়ারম্যান ও একজন ইউপি সদস্যসহ ৪০ জন গ্রামবাসী ও জনসংহতি সমিতির সদস্যকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া ৬৩ জন গ্রামবাসী ও সমিতির সদস্যকে সাময়িক আটক ও হয়রানি, ৯৯ জনকে শারীরিক নির্যাতন এবং ১৫০ জন জনসংহতি সমিতির সদস্যকে এলাকাছাড়া করা হয়েছে। ২০১৭ সালে এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ব্যাপক মাত্রায় অব্যাহত রয়েছে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো চলতি এপ্রিল মাসে নানিয়ারচরে রমেল চাকমা নামে একজন আংশিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে সেনা নির্যাতনে হত্যার ঘটনা, যা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠে। এছাড়া নারীর উপর সহিংসতা, রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাপক মাত্রায় ভূমি বেদখল, প্রায় ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা ইত্যাদি নৃশংস ঘটনা ঘটেছে।

জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি আরো বলেন, বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে অবাস্তবায়িত অবস্থায় রেখে দিয়েছে। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেবল প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা আট মাস আগে সংশোধন করলেও ভূমি কমিশনকে প্রয়োজনীয় তহবিল, জনবল ও অফিস বরাদ্দ প্রদান করেনি।

বিধায়ক চাকমা আরো বলেন, মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যেমন বাংলাদেশ বর্তমানে মানবাধিকার পরিষদের সদস্য, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের অন্যতম শান্তিরক্ষী সরবরাহকারী, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সফলতা ইত্যাদি অন্যতম। কিন্তু আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র সমর্থন প্রদানে বাংলাদেশ চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, যে ঘোষণাপত্রের বর্তমানে এক দশক পূর্তি পালন করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে এই ঘোষণাপত্র বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সম্পূর্ণ উপেক্ষার মধ্যে রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ২৪ এপ্রিল থেকে ৫ মে ২০১৭ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৬তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে কাপেং ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি বাবলু চাকমা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বিনতাময় ধামাই, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি নু ওয়ে প্রমুখ আদিবাসী নেতৃবৃন্দ উক্ত অধিবেশনে অংশগ্রহণ করছেন। এ অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব সুদত্ত চাকমার নেতৃত্বে একটি সরকারী প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করছে। গত ২৬ এপ্রিল প্রদত্ত বক্তব্যে "আদিবাসী ধারণাটি আইনগতভাবে এবং ঐতিহাসিকগতভাবে সমর্থনযোগ্য পদ্ধতিতে বাবহার করা উচিত" বলে সুদত্ত চাকমা সরকারের পূর্ববর্তী বক্তব্য চর্বিত চর্বন করেন।

আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়ে ডেনমার্কের উদ্বেগ

নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৬তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি নিয়ে ডেনমার্ক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এজেন্ডা-৪ এর উপর ডেনমার্কের বিবৃতিঃ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রের [অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার] আলোকে স্থায়ী ফোরামের ৬টি এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৭ প্রদত্ত বক্তব্যে জাতিসংঘে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা চলমান রয়েছে। আদিবাসীদের উপর আক্রমণের ঘটনা যেগুলির অধিকাংশেরই বিচার হয় না এরকম ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। এর ফলে এ অঞ্চলে অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। ডেনমার্ক তার উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রাখবে এবং আশাবাদ প্রকাশ করে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও নিরাপত্তার বাস্তবতা তৈরি হবে।'

আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র আদিবাসীদের মর্যাদা ও অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ও যুগান্তকারী অধ্যায়। এটি জাতিসংঘসহ পুরো বিশ্বে নতুন মাত্রায় কাজ করার ভিত রচনা করে দেয়। এ ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের জন্য এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রসমূহে নিয়মিত অনুক্রমণ করা (ফলো আপ), নিরীক্ষণ করা ও পর্যবেক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদন্ডের উন্নয়ন সত্ত্বেও আদিবাসীরা এখনও মানবাধিকার লংঘনের শিকার হচ্ছেন। অমীমাংসিত বিষয় সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগসমূহ এরকম ফোরামে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন ধরনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি যেখানে আদিবাসীদের অধিকারও হুমকির সম্মুখীন সেসমস্ত পরিস্থিতি নিরসনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ধারাবাহিক অনুক্রমণ করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ববোধ রয়েছে।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বার বার ভূমি বিরোধের ঘটনা ঘটে চলেছে। এতে মূলত আদিবাসীরা ঘটনার শিকার হন। সুতরাং এ ফোরামের পূর্বেকার অধিবেশনের মত, ডেনমার্ক তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করছে যে, কোনরকম বিলম্ব ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন যেন পুরোপুরি কাজ করতে পারে সেটা যেন বাংলাদেশ সরকার নিশ্চিত করে। ভূমি কমিশন বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিতে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে আমরা মনে করি, পর্যাপ্ত অফিস ও জনবল নিয়োগের বিষয়টি হচ্ছে কমিশনকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি। বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ফেব্রুয়ারি মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে এবং সকল স্টেকহোল্ডার ও আমাদের উন্নয়ন অংশীদার ইউএনডিপি'র সাথেও সাক্ষাত করে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ খুব নিদারুণভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রধানত সামাজিক সেবাসমূহ যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কখনোই উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

তবে এটা উৎসাহব্যঞ্জক যে, বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় [২০১৬-২০২১] স্বীকার করা হয়েছে যে- যদি সমন্বিতভাবে কাজ করা না হয় তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান আরো বাড়বে।

একারণে বিগত দু'দশক ধরে বাংলাদেশের আদিবাসীদের উন্নয়নে ডেনমার্ক সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ডেনমার্ক সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম হচ্ছে- কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা চালু যেখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা রয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম এমন একটি অঞ্চল যেখানে উচ্চ মানসম্পন্ন কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে বিশেষত নারী কৃষকেরা কৃষক মাঠ স্কুলে আসা-যাওয়া করছেন। এ উদ্যোগ নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর উপর ব্যাপক সহিংসতার মাত্রা যথেষ্ট উদ্বেগের। এজন্য আমরা এ অঞ্চলে নারীদের জন্য দুটি ক্রাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করেছি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এগুলোর সক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে কীভাবে আরো বেশি অবদান রাখা যায় সেব্যাপারে বাংলাদেশের সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনায় বসতে ডেনমার্ক সরকার সবসময় প্রস্তুত বলে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন।

উল্লেখ্য যে, গত ২৪ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত ২০১৭ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদরদপ্তরে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ১৬তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্কটল্যান্ডে ইউএনপিও'র ১৩তম সাধারণ সম্মেলনে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদের যোগদান

গত ২৬-২৮ জুন ২০১৭ যুক্তরাজ্যের স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গ শহরে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বহীন জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর সংগঠন (ইউএনপিও) এর ১৩তম সাধারণ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনের সাংসদ উষাতন তালুকদার এবং সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা যোগদান করেন। উক্ত সম্মেলনে ইউএনপিও'র অতীত ও ভবিষ্যত কার্যক্রম ও কর্মকৌশল বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া উক্ত সম্মেলনে ৮-সদস্যক প্রেসিডেন্সীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউএনপিও'র সাধারণত ১৮-২৪ মাস অন্তর একবার সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইউএনপিও'র ২৪টি সদস্য-সংগঠনের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ১৩তম সম্মেলনে পশ্চিম বেলুচিস্তানের মি. নাসের বোলাদাই'কে প্রেসিডেন্ট এবং আফ্রিকার ওগাডেন থেকে মি. আবদিরহমান মাহদি ও ওয়ার্ল্ড ওইগুর কংগ্রেসের মি. দোলকুন ইসাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করা হয়।

ইউএনপিও'র নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নাসের বালাদোই (ডানে) এবং মহাসচিব মারিনো বুসতাসিন (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) এর সাথে জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিদ্বয়কে দেখা যাচ্ছে

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে ইউএনপিও-এর উক্ত ১৩তম সাধারণ সম্মেলনে এক রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত রেজুলেশনে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইউএনপিও সাধারণ সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত গৃহীত রেজুলেশনে আরো বলা হয় যে, দীর্ঘ আড়াই দশক ধরে আন্দোলনের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ দুই দশক অতিক্রান্ত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর; পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ; 'অপারেশন উত্তরণ'সহ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জায়গা-জমি প্রত্যর্পণসহ পুনর্বাসন; পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরিতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ, চুক্তির সাথে সঙ্গতি বিধানকল্পে পুলিশ এ্যাক্ট, পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন সংশোধন; সেটেলার বাঙালিদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনক পুনর্বাসন ইত্যাদি চুক্তির মৌলিক বিষয়সমূহ এখনো অবাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। ইউএনপিও সাধারণ সম্মেলনে বলা হয় যে, ১৫ বছর ধরে দেনদরবারের পর অবশেষে গত ৬ অক্টোবর ২০১৬ জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৬ পাশ করা হয়। কিন্তু আইন সংশোধন করলেও ভূমি কমিশনের জন্য সরকার এখনো পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করেনি, প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় দু'টি শাখা অফিস স্থাপন করেনি, সর্বোপরি কমিশনের কার্যপ্রণালী বিধিমালা চূড়ান্ত করেনি। কার্যপ্রণালী বিধিমালা ব্যতীত কমিশনের ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ তথা বিচারিক কার্যক্রম শুরু করা কঠিন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

রেজুলেশনে আরো বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও আদিবাসী বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণাপত্র বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন জোরদার হয়েছে। অবৈধ গ্রেফতার ও আটক, অমানুষিক নির্যাতন, অস্ত্র গুঁজে দিয়ে গ্রেফতার, মিথ্যা মামলায় জড়িত করে জেলে প্রেরণ, তল্লাসীর নামে জনসংহতি সমিতির অফিসসহ ঘরবাড়ির জিনিসপত্র তছনছ ইত্যাদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইউএনপিও-এর উক্ত ১৩তম সাধারণ সম্মেলনে ১৪ দফার একটি জেনারেল রেজুলেশন গ্রহণ করা হয়। উক্ত জেনারেল রেজুলেশনের ১৪ দফার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিসহ সংখ্যালঘু বা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের সাথে রাষ্ট্রের মধ্যে গৃহীত চুক্তি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক বাস্তবায়িত না করায় নিন্দা জানানো হয়।

স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ শহরে ইউএনপিও'র ১৩তম সাধারণ সম্মেলনে বাম দিক থেকে জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ও ২৯৯ পার্বত্য রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসনের সাংসদ ঊষাতন তালুকদার, ইউএনপিও'র প্রেসিডেন্ট নাসের বালাদোই, মহাসচিব মারিনো বুসতাসিন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদি রহমান মাহাদি

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি থেকে ৩১ জুলাই ২০১৭ প্রকাশিত ও প্রচারিত।
টেলিফোন- +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮, ই-মেইল : pcjss.org@gmail.com, ওয়েবঃ www.pcjss-cht.org
শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা